KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর ওসমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m
Vol. & Number : ৬৫/৪	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৩ ।। Sep 2006
	Condition : Brittle Good ✓
Editor আবদুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৩

অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব মানবিক মূল্যবোধ বিবর্জিত হওয়া অভিপ্রেত নয়, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ রায়ের বিচার।

গণিতবিদের দৃষ্টিতে ফ্রয়েড দেড়শতবর্ষে মনঃসমীক্ষণের সাম্প্রতিকতা যাচাই করেছেন ড. দিলীপকুমার সিংহ

'আমার সময়ের কথা'-য় এবার সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অতুল গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রমুখের কথা

'ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়'-এ এবার সংখ্যা-তত্ত্ববিদ আল্লামা মাশরিকি, স্ট্যালিনের সময় সোভিয়েট রাশিয়ার বিদেশনীতির রূপকার ভিসিনিস্কির প্রসঙ্গ, গান্ধীজিকে নিয়ে নির্মলকুমার বসুর বই নিয়ে বিতর্ক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিস্মরণীয় দুই পিওনের কথা।

ইংরাজি ভাষায় প্রথম ভারতীয় আত্ম-জীবনীকার দীন মহম্মদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের তথ্যসমৃদ্ধ পর্যালোচনা

সৈয়দ মুজতবা আলীর দুটি অপ্রকাশিত কবিতা

শিক্ষকতার সেকাল নির্ভেজাল ভাল ছিল না—অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণসমৃদ্ধ সন্দর্ভ।

অমলেন্দু দাশগুপ্তর Themes and Variations গ্রন্থটির রিভিউ করেছেন প্রসাদরঞ্জন রায়।

আনিসুজ্জামান এবং চেখভ-কে নিয়ে দু'টি সংকলনগ্রন্থের আলোচনা।

প্রয়াত তাপস সেন স্মরণে কুমার রায়, মিজানুর রহমান স্মরণে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শামসুর রাহমান স্মরণে আবদুর রাউফের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

WITH BEST COMPLIMENTS :

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M OFFERS A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND DREDGING & DISILTING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION

D. T. M. CONSTRUCTION (INDIA) LIMITED

CIVIL/STRUCTURAL ENGINEERS and MASTER DREDGERS

Registered Office :

59B, CHOWRINGHEE ROAD, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 020
PHONE : 2283 2538
TELE FAX : 22832545

35 Years' Dedicated Service to the Nation

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৪
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১৩

প্রবন্ধ

- অর্থশাস্ত্র, তত্ত্ব ও মূল্যবোধ — হীরেন্দ্রনাথ রায় — ২১৯
- সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও সাম্প্রতিকতা — দিলীপকুমার সিংহ — ২২৬

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

- আমার সময়ের কথা — ননীমাধব চৌধুরী — ২৪১
- ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত — ২৬০

কবিতা ২৩৩-২৪০

- শম্ভু রক্ষিত ❖ আনন্দ ঘোষ হাজরা ❖ সুদেব বক্‌সী ❖ সতীনাথ বৈরাগ্য
- সুমন্ত মুখোপাধ্যায় ❖ সন্দীপন চক্রবর্তী ❖ শ্রীজাত ❖ জয়দেব বসু

গল্প

- প্রশ্নবাচী — কুমার রাণা — ২৫৩

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

- উপনিবেশের প্রতিপ্রবাহ : দীন মহম্মদ — সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত — ২৮০
- মুজতবা আলী, দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা এবং এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব — প্রসাদরঞ্জন রায় ও শিখা রায় — ২৮৭
- শিক্ষকতার সেকাল — চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল — ২৯০

গ্রন্থসমালোচনা ২৯৮-৩০৮

- প্রসাদরঞ্জন রায় ❖ নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ❖ মেঘ মুখোপাধ্যায়
- বুলবুল আহমেদ

স্মরণে

- আলোর কারবারি নয়, তাপস সেন আলোর মহাজন — কুমার রায় — ৩০৯
- অনন্য শামসুর রাহমান — আবদুর রাউফ — ৩১৩
- মিজানভাই — শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩১৫

সম্পাদক : আবদুর রাউফ

শিল্পপরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত

সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী
শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তুষার তালুকদার

মূল্য : ১৫
ডাকে : ২০

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ক্রান্তি প্রেস ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

অক্ষর বিন্যাসে ক্রান্তি প্রেস ● ৩৭ রিপন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

দূরভাষ
২২১৫-০৭৭০

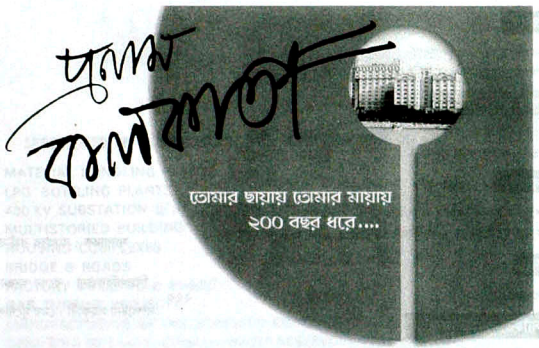

State Bank of India

With you all the way since 1806

প্রবন্ধ

অর্থশাস্ত্র, তত্ত্ব ও মূল্যবোধ

হীরেন্দ্রনাথ রায়

আজকাল অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে আধুনিক অর্থশাস্ত্র একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত হওয়ার দরুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং সেই সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে মানবিকতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের ছিটেফোঁটাও সম্বন্ধ নেই। এই অভিযোগ আংশিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আংশিক সত্য সম্পূর্ণ মিথ্যার চেয়েও বেশি বিভ্রান্তিকর। তাই অভিযোগটির যাথার্থ বিচার করা জরুরি।

প্রথমে বিষয়টিকে অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বিচার করা যাক। অর্থশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তি হলেন ইংরাজ দার্শনিক অ্যাডাম স্মিথ। দীর্ঘদিন গবেষণা, চিন্তাভাবনার পর তিনি ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন যার নাম *An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth of Nations*। বইটি প্রকাশিত হবার পর অর্থশাস্ত্রের চরিত্রের খোলনলচেই পালটে গেল। এর আগে অর্থশাস্ত্র বলে কোনও আলাদা শাস্ত্রই ছিল না; যা ছিল তা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তৎকালীন অর্থনৈতিক বিষয়ের ওপর লেখা ছোটখাটো পুস্তিকা। এই লেখকদের pamphleteers অর্থাৎ পুস্তিকাকার বলা হত, অর্থনীতিবিদ বলা হত না। এঁদের অনেকেই যথেষ্ট জ্ঞানী ও বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এঁদের লেখায় তথ্যের অভাব থাকত না। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি সুসম্বদ্ধ শাস্ত্র গড়ে তোলার দিকে এঁদের নজর ছিল না। সেই কাজটি প্রথম করলেন অ্যাডাম স্মিথ। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে স্মিথের গ্রন্থে মূল শব্দটি হল Wealth অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ। দেশের সম্পদের প্রকৃতি ও তার বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করার গুরু দায়িত্বটি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথ। স্মিথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে Moral Philosophy অর্থাৎ নৈতিক দর্শনের অধ্যাপনার কাজ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই অর্থশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের একটি শাখা বলেই বিবেচিত হত; অর্থশাস্ত্রের নিজস্ব কোনও স্বতন্ত্র রূপ ছিল না। স্মিথ *wealth of Nations*-এ অর্থশাস্ত্রকেই প্রাধান্য দিলেন; কিন্তু নীতিশাস্ত্রের মূল বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ সরে এলেন না। মানুষের মনে যে অন্তর্জাত একটি নীতিবোধ আছে তাকে বিসর্জন দিয়ে অর্থশাস্ত্রের প্রবর্তন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

স্মিথের আগে জাতীয় সম্পদ নিয়ে আলোচনা করেছেন দু'টি গোষ্ঠী। একটি Mercantilist বা বাণিজ্যসর্বস্বতা মতবাদী গোষ্ঠী এবং অপরটি physiocrats বা ভূমিপ্রাধান্যবাদী গোষ্ঠী। স্মিথ তাঁর গ্রন্থে এই দুই গোষ্ঠীর ধ্যানধারণাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণ করেছেন। প্রথম গোষ্ঠীরা মনে করতেন যে মুদ্রাই (তৎকালীন সোনা, রুপো বা অন্য কোনও মূল্যবান ধাতু) হল দেশের প্রকৃত সম্পদ। দেশের স্বর্ণভাণ্ডার বাড়াতে পারলেই দেশের সমৃদ্ধি ঘটবে। এর জন্য যত বেশি সম্ভব আমদানি কম করে রপ্তানি বাড়িয়ে যেতে হবে যাতে দেশের মুদ্রাভাণ্ডার ক্রমশই স্ফীতি লাভ করে। তাত্ত্বিক বিচারে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, এটি নানাভাবে প্রমাণিত। তাছাড়া সোনারূপা বাড়ালেই দেশের জনসাধারণ কীভাবে যে উপকৃত হবে সে বিষয়ে মার্কেন্টিলিস্টরা প্রায় নিশ্চুপ। অর্থাৎ জনগণের ভালমন্দের বিচারে যে নৈতিকতার প্রশ্নটি সামনে এসে পড়ে, সে কথা এঁদের মাথাতেই আসেনি। ভূমিপ্রাধান্যবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে। এঁরা কৃষিকেই সম্পদ বৃদ্ধির একমাত্র উৎস বলে মনে করতেন, কারণ তাঁদের মতে, কৃষি থেকেই একটা উদ্বৃত্ত (surplus) পাওয়া যায়। শিল্প থেকেও যে উদ্বৃত্ত আসতে পারে সেটা এঁরা বুঝতে পারেননি। তাছাড়া স্মিথ যখন *Wealth of Nations* লেখেন তখন ব্রিটেন শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। নতুন-নতুন শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, লোকে শিল্পে কাজ পাচ্ছে, বেকারসমস্যার তীব্রতা ক্রমশই ক্ষীয়মান, লোকের আয় বাড়ছে, দারিদ্র দূর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শিল্পকে অবহেলা করে শুধু কৃষিতেই মনঃসংযোগ করলে ভুল করা হবে। তাছাড়া কৃষিজমি তো সীমিত, একটি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। শুধু

চাষ করে আর কতদূর এগনো যাবে। স্মিথ এই দুই মতবাদকে খণ্ডন করে একটি যুক্তিনির্ভর সুশৃঙ্খল শাস্ত্র গড়ে তুলতেই আগ্রহী হলেন। এ বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু David Hume তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন। স্মিথের দৃষ্টিভঙ্গি বহুমুখী ছিল। তিনি সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর নজর দিয়েছিলেন। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম সোপান হিসাবে তিনি শ্রমবিভাজন (division of labour) এর ওপর জোর দিয়েছিলেন। একজন শ্রমিককে যদি কোনও কাজের সবটাই করতে হয় তাহলে সে একদিনে যতটা উৎপাদন করতে পারবে, তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব যদি পুরো কাজটিকে নানা স্তরে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং এক একজন শ্রমিক কাজের একটি অংশই করতেই থাকে। এর কিন্তু একটি খারাপ দিকও আছে। পুরো কাজের একটি অংশই যদি একভাবে কেউ করতে থাকে তাহলে কাজটি তার কাছে একঘেয়ে হয়ে যাবার সম্ভাবনা বিস্তর। এতে শ্রমিক শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিরক্তবোধ করে এবং কাজে অনীহা দেখা দেয়। এতে সমাজের সমূহ ক্ষতি। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবোধ (alienation) আসতে পারে, এই মানবিক দিকটি কিন্তু দার্শনিক অর্থশাস্ত্রী স্মিথের লেখায় সুস্পষ্ট। এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের পরিচায়ক।

স্মিথ অবাধ বাজার-ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছেন। প্রতিযোগিতার বাতাবরণে জিনিসপত্রের দাম সর্বনিম্নস্তরে পৌঁছবে এবং বিক্রেতা ন্যূনতম স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) লাভ করবে। এটি সম্ভব হবে জোগান-চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে। এই প্রসঙ্গেই স্মিথ একটি বিতর্কমূলক অথচ মূল্যবান কথা বলেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষই নিজেকে খুব ভালবাসে এবং যে কাজই করে তা নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই করে। এর বাইরে তার কোনও উদ্দেশ্যই নেই। Self-interest এবং self-love আমাদের জীবনে সর্বক্ষেত্রে প্রধান্য বিস্তার করে। এই প্রবন্ধের শেষ অংশে আমরা দেখব যে স্মিথের এই মতবাদ সব অর্থশাস্ত্রী মেনে নেন না। এই সূত্রেই স্মিথ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মত উপস্থাপিত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে সকলেই যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা ভেবে কাজ করে তাহলে পারস্পরিক সংঘাত অনিবার্য। স্মিথ কিন্তু তা মনে করেন না। তিনি বলেন যে যতই সংঘাতের সম্ভাবনা থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত কিন্তু সামাজিক সমন্বয় (social harmony) ঘটবে। এটি হবে বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে। সামাজিক সমন্বয়ের এই মতবাদ তাঁর *Theory of Moral sentiments* (1759)-এও প্রতিষ্ঠিত।

স্মিথ সব সময়েই মানুষের কথা ভেবেছেন; নিছক অর্থশাস্ত্রীয় কচকচি তাঁর মনঃপূত ছিল না। বিস্তৃত আলোচনায় এসবের উল্লেখ হয়ত করা যেত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য একটু ভিন্ন। তাঁর মূল্যবোধের দিকটিই আমি প্রধানত তুলে ধরতে চাই। এই সূত্রেই স্মিথ মনে করেন শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হতে পারে না। অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল জনগণের উপভোগ (consumption) বৃদ্ধি করা। তাই স্মিথ ব্যবসায়ীশ্রেণিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন। বলেছেন যে যখনই তাঁরা এক সঙ্গে জড়ো হন তখনই অভিসন্ধি চলতে থাকে যে কী করে জনগণকে শোষণ করা যায়। শিল্পের অগ্রগতির জন্য ধনিকশ্রেণির ভূমিকা যথেষ্ট হলেও এঁদের পক্ষে তিনি কোনও যুক্ত খাড়া করেননি।

পক্ষান্তরে শ্রমিকশ্রেণি কিছুটা শোষিত হলেও তাদের সম্বন্ধেও কোনও খেদোক্তি করেননি। স্মিথের স্পষ্টোক্তি Consumption is the sole end and purpose of all production , এবং এরপর সেই সমাজব্যবস্থাকে তীব্র ধিক্কার দিয়েছেন এই বলে যে যেসব ব্যবস্থা শুধু বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ দেখে এবং উপভোক্তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে সেই আর্থব্যবস্থা ঘৃণ্য এবং সর্বতো-পরিত্যাজ্য। মানবিক মূল্যবোধের এর চেয়ে ভাল উদাহরণ আর কী হতে পারে।

স্মিথ সম্বন্ধে প্রারম্ভেই এত কথা বলার একটিমাত্র উদ্দেশ্য হল যে অর্থশাস্ত্র যখন স্মিথের হাতে একটি সামাজিক বিজ্ঞানে পরিণত হচ্ছে তখন কিন্তু অর্থশাস্ত্র নীরস মূল্যবোধহীন আলোচ্য একটি বিষয় ছিল না। মানবকল্যাণে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই এটি গঠিত হচ্ছিল। এই সূত্রেই স্মিথ শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কোনও নির্দিষ্ট বেতন থাকবে না। ছাত্রেরা আসবে এবং অধ্যাপকের অধ্যাপনার ভিত্তিতে একটি মূল্য ধরে দেবে। এর ফলে অধ্যাপক বাধ্য হবেন নিজেকে ঠিকভাবে তৈরি করে নিতে এবং যথাসাধ্য ভাল করে পড়াবার চেষ্টা করবেন। তা না হলে দিনদিন ছাত্রসংখ্যা কমবে এবং অধ্যাপককে হয়ত ভুখা মরতেও হতে পারে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা স্মিথের এই দাওয়াই মানবেন? মনে তো হয় না।

স্মিথের এই মন্তব্যকে হালকা রসিকতা বলে মনে করলে ভুল হবে। এর পেছনে একটি অর্থনৈতিক তত্ত্ব আছে, যা হল যখন একটি কাজের ভালমন্দ বিচারের সময় তাঁর আর্থিক প্রতিদানের কোনও যোগসূত্র থাকে না, তখন অবশ্যম্ভাবী ভাবেই কর্তব্যে অবহেলা করার প্রবণতা দেখা দেয়।

এ কথা স্মিথ মানতেন না। এই জন্যই তিনি আয় বিভাজনের কথাও বলেছেন। আয়ের সমবণ্টন না হলে ধনী

ব্যক্তিরাই অধিক মুনাফা করে লাভবান হবেন এবং দরিদ্রশ্রেণির মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এটি কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থশাস্ত্রীই সমর্থন করবেন না। তাঁর আয় বিভাজন তত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটি আছে, একথা মানলেও এটি অস্বীকার করা যায় না যে আর্থব্যবস্থায় সমবণ্টন অতি প্রয়োজনীয়। এখানেও আবার স্মিথ তাঁর মূল্যবোধের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। অসম-বণ্টন দূর করার জন্য সরকারকে কী ধরনের কর-ব্যবস্থা চালু করতে হবে, সে বিষয়ে স্মিথ তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ধ্রুপদী অর্থতত্ত্বকে এই কারণেই political economy অর্থাৎ রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত অর্থশাস্ত্র বলা হয়। অর্থশাস্ত্র Economics হয়ে উঠেছে নয়া-ধ্রুপদী অর্থতত্ত্বে (Neo-classical economics)। সে কথায় পরে আসছি।

ধ্রুপদী অর্থতত্ত্বে স্মিথের উত্তরসূরি ছিলেন ডেভিড রিকার্ডো (1772-1823) স্মিথ মূলত দার্শনিক ছিলেন এবং নীতিশাস্ত্রের অঙ্গন থেকে অর্থবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। রিকার্ডো এসেছিলেন বৈষয়িক কাজকারবার থেকে। তাই রিকার্ডোর আলোচনায় আর্থব্যবস্থার বিভিন্ন অঙ্গের সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্টতর আভাস পাওয়া গেলেও নৈতিকতার কোনও প্রশ্ন সেখানে স্থান পায়নি বললেই চলে।

রিকার্ডো দেশের সম্পদ বৃদ্ধির কারণ নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের সম্পদ কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিভাজিত হয়। এই নিয়ে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেসব নিছক অর্থতত্ত্বের কথা। সম্পদ এবং জনগণের আয় কীভাবে পরিমাপ করা যায় সেদিকে তিনি অনেকটা নজর দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি মূল্যের শ্রমভিত্তিক তত্ত্ব অনুসরণ করেছিলেন, অর্থাৎ কোনও দ্রব্যের উৎপাদনে কতখানি শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে তারই ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারিত হবে, এমনই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। রিকার্ডোর তত্ত্বে ত্রুটি ছিল, সেকথা সব অর্থনীতিবিদই জানেন। একটি কথা অবশ্য তিনি বলেছিলেন যা পরবর্তী কালে কার্ল মার্কসের লেখায় প্রকট রূপ নিয়েছিল। রিকার্ডোর মতে শ্রমিক যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করেন সেই অনুযায়ী মজুরি পান না। তিনি শোষিত হন। লাভের গুড় ঘরে তোলেন মালিকশ্রেণি— বাড়তি মুনাফা হিসাবে। এই শোষণ নীতিসম্মত কি না তা নিয়ে রিকার্ডোর কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তিনি শুধু রসকষবিহীন তত্ত্ব আলোচনায় আনন্দ পেতেন। তবে একথাও তিনি বলেছিলেন যে দীর্ঘমেয়াদে এই বাড়তি মুনাফা লাভ করা যাবে না। কয়েকটি তাত্ত্বিক কারণে মুনাফার হার ক্রমশই কমতে থাকবে এবং আর্থব্যবস্থার সেই পরিণতি ঘটবে যাকে ইংরাজিতে Stationary State, অর্থাৎ পরিবর্তনহীন পরিস্থিতি বলা হয়েছে। এই অনড় পরিস্থিতি কতদিন চলবে, তার থেকে মুক্তি পেতে ধনতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে কি না, সেসব কথা আমরা রিকার্ডোর বিখ্যাত গ্রন্থ *Principles of Political Economy and Taxation (1817)*-এ বিস্তারিতভাবে পাই না। একটা কথাই এখানে জোর দিয়ে বলতে হবে যে অর্থশাস্ত্র রিকার্ডোর হাতে ক্রমশই নীতিশাস্ত্র থেকে সরে আসছে এবং সুদৃঢ়ভাবে বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠছে।

বলাই বাহুল্য যে অর্থশাস্ত্র একটি সামাজিক বিজ্ঞান। তাই অর্থনৈতিক কর্মকৌশলের দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে কি না তা বিচার করা জরুরি। উপকার বা অপকারের কথা উঠলেই নীতির প্রশ্নটি এসে পড়ে। সুতরাং নৈতিকতা বিবর্জিত একটি রুক্ষো তত্ত্বসম্বলিত বিজ্ঞান খাড়া করার যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকেই আজ সরব হয়েছেন। পুনরুক্তি করে বলি নৈতিকতা এবং মূল্যবোধকে বাদ দিয়ে একটি সমাজবিজ্ঞান গঠন করা সঙ্গত নয়; বোধহয় তা করা সম্ভবও নয়।

কার্ল মার্কস (1818-1883) ধ্রুপদী গোষ্ঠীরই একজন। অবশ্য তাঁর চিন্তাভাবনা ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। তাঁর অদ্বিষ্ট ছিল ধনতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার গতিশীলতার নিয়মগুলি (laws of motion of society)। তাঁর মতে ধনতন্ত্র যতদিন টিকে থাকবে ততদিন শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবেই। জনসংখ্যার একটি বড় অংশই হল এই শ্রমিকশ্রেণি। তারা যদি ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত দরিদ্রতর হতে থাকে তাহলে কীসের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। মালিকেরা শ্রমিক শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) সৃষ্টি করে এবং সেই উদ্বৃত্ত মূল্য বিনিয়োগ করে আরও বেশি মুনাফা করে। কী করে এই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় তা তিনি একটি তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। সে তত্ত্ব এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই। এইভাবে মূলধন গঠন, তাঁর মতে, দীর্ঘদিন চলতে পারে না। ক্রমাগত বিনিয়োগের ফলে শ্রমের চাহিদা বাড়ে এবং মজুরি বৃদ্ধি পায়। মুনাফার হার বজায় রাখতে মালিকপক্ষ শ্রম-সঞ্চয়ী মূলধন-নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে থাকেন, ফলে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। এর নিদারুণ ফলস্বরূপ শ্রমিকশ্রেণি দলবদ্ধ হয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। শ্রেণি দ্বন্দ্ব ক্রমশই দানা বাঁধে। পরিশেষে নানাকারণে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং ধনতন্ত্রের সন্ধিক্ষণ (crisis) দেখা দেয়। শেষমেশ ধনতন্ত্র ভেঙে পড়ে এবং communist রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত করেছে। সে যাই হোক, এখানে আমার বক্তব্য হল

মার্কসের এই prognosis ভ্রান্ত হলেও তিনি যে শ্রমিকস্বার্থের কথা ভেবেই তাঁর অর্থতত্ত্ব খাড়া করেছেন তাতে তাঁর জনদরদি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জার্মান দার্শনিক হেগেলের ছাত্র ছিলেন; হেগেলের সব কথা না মানলেও দার্শনিকসুলভ তাঁর স্পর্শকাতর মনের যে পরিচয় আমরা পাই তাতে নৈতিকতার সুস্পষ্ট আভাষ মেলে। তাঁর নিশ্চয়ই একটা মূল্যবোধ ছিল, যাকে তিনি আড়াল করে অর্থতত্ত্বের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। অর্থনৈতিক তত্ত্বে এখানে অন্তত প্রচ্ছন্নভাবে একটা গভীর মূল্যবোধ আছে এবং এই কারণেই মার্কসের আলোচনাকে আজও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়নি। মার্কসবাদ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আজও সমানে চলছে।

ধনতন্ত্রের অনিবার্য ধ্বংসের কথা বলে মার্কস ইংরাজ এবং ইউরোপীয় অর্থশাস্ত্রীদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। ধ্রুপদী অর্থতত্ত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একধরনের অর্থতত্ত্ব গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। অর্থতাত্ত্বিকেরা অনেকে মিলে একটি নতুন গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করলেন যা ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের মতবাদ থেকে অনেকটাই আলাদা। এই গোষ্ঠীকে নয়া-ধ্রুপদী গোষ্ঠী (Neo-Classical school) বলা হয়। নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিকেরা ধ্রুপদীতাত্ত্বিকদের মতো সমষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্বের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেননি। বলাই বাহুল্য যে সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যার আলোচনা করতে হলে পুরো সমাজকে নিয়ে ভাবতে হবে এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রশ্নটি এসে পড়বে। মার্কস সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ধনতন্ত্রকে বিচার করেছিলেন এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের অনিবার্য পতনের কথা বলেছিলেন। নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিকেরা অর্থনৈতিক সমস্যাকে অন্য চোখে দেখলেন। তাঁরা ব্যষ্টিকেন্দ্রিক স্তরে (micro level) সমস্যাকে বিচার করতে শুরু করলেন। এঁরা সোজাসুজি বললেন যে অর্থবিদ্যার উদ্দেশ্য প্রবৃদ্ধি বা জনগণের উপভোগের সর্বোচ্চায়ন নয়। এর উদ্দেশ্য হল অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণগুলিকে এমনভাবে প্রতিস্থাপিত করা যাতে উৎপাদনের সর্বোচ্চায়ন ঘটে প্রান্তিকভাবে ন্যূনতম খরচে। পরিভাষায় বলা হয় efficient allocation of resources। এই তত্ত্ব খাড়া করতে নানা সূত্রের উদ্ভাবন করা হয়েছে যেগুলির ব্যাখ্যা হয়ত এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। আসল কথা হল ব্যষ্টিকেন্দ্রিক অর্থতত্ত্বে নৈতিকতার কোনও ছাপ নেই। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বর্জিত এই ধরনের তত্ত্ব দাঁড় করাতে এঁরা গণিতের ব্যাপক সাহায্য নিলেন। গণিত ব্যবহারের একটা বিরাট সুবিধা আছে। গণিত 'কারও' পক্ষে বা বিপক্ষে সায় দেয় না—গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ। গাণিতিক নিয়ম অনুসারে যে সিদ্ধান্ত সঠিক, তাকেই মান্য করতে হবে। এতে আপনি ভুরিভোজ করুন, আর রাম, শ্যাম, যদু অনাহারে শুকিয়ে মরুক, এ নিয়ে গাণিতিক মাথা ঘামান না। এরকম নিষ্করুণ সিদ্ধান্ত কী কোনও সামাজিক বিজ্ঞানে গ্রাহ্য হতে পারে? দক্ষ সম্পদ প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে যদি সমাজে অসম আয়বণ্টন দেখা দেয় তাতে গাণিতিক অর্থতাত্ত্বিকেরা অস্বস্তি বোধ করেন না। এই অসম আয়বণ্টন কীভাবে পরিমাপ করা যায়, তার গাণিতিক পদ্ধতির কথা চটজলদি তাঁরা বলতে পারেন। Gini Co-efficient এবং Lorenz Curve এসব গালভরা গাণিতিক পদ্ধতির কথা বলে এঁরা বিপক্ষ দলকে বিভ্রান্ত করতে পারেন। তবে যেসব অর্থশাস্ত্রী সামাজিক কল্যাণের কথা ভাবেন তাঁদের অস্বস্তি কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। নোবেলজয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসান বলেছেন যে গণিত একটি ভাষা—mathematics is a language—সুতরাং এই ভাষাও তো আমরা যে কোনও বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহার করতে পারি। যদি গ্রিক, ল্যাটিন, ইংরাজি বা বাংলা ভাষা অর্থতত্ত্বের আলোচনায় ব্যবহার করা যায়, তাহলে গাণিতিক ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? গাণিতিক ভাষার আরেকটি গুণ হল যে এই ভাষায় ভুল বোঝাবুঝির কোনও অবকাশ নেই, যা literary language-এর বেলায় সম্ভব। এই মতের একটি আপাত-যৌক্তিকতা আছে। অর্থতত্ত্বের অনেক বিষয়েই গণিতের প্রয়োগ অপরিহার্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে ভালরা প্রবর্তিত সার্বিক সমস্থিতির (General quilibrium) উল্লেখ করা যায়। গণিত ছাড়া ধারণাটির ব্যাখ্যা করা প্রায় দুঃসাধ্য। এতদসত্ত্বেও অর্থশাস্ত্রে গণিতের যথেচ্ছ প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন নামকরা অনেক অর্থনীতিবিদই। যেমন জর্জ স্টিগলার আরেক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ—তাঁর একটি প্রবন্ধে ঠাট্টা করে বলেছেন যে গণিত শুধু একটি ভাষাই নয়, একে বিজ্ঞানের রানিও (Queen of sciences) বলে মনে করা হয়। তবে গণিত বিজ্ঞানের রানি হলেও গাণিতিক অর্থনীতিবিদ কখনওই রাজ্যশাসনকর্ত্রী রানির স্বামী হতে পারে না। স্টিগলারের ভাষায় 'If mathematics is the queen of sciences, the mathematical economist is seldom a prince consort'। ঠাট্টা হলেও এই উক্তির যাথার্থ অনস্বীকার্য। এখানে একটা কথা বলা খুবই জরুরি। আমার উদ্দেশ্য গণিতকে নস্যাৎ করা নয়—তা সম্ভবও নয়। আমার বক্তব্য হল অর্থশাস্ত্রের মতো একটি আপাদমস্তক সামাজিক

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গণিত প্রয়োগ করার কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা আছে। তাছাড়া অর্থতত্ত্বের আলোচনায় নীতি ও মূল্যবোধকে বাদ দিই কী করে? আমার ধারণা যাঁরা সর্বপ্রথম ব্যষ্টিকেন্দ্রিক প্রান্তিকতাভিত্তিক অর্থতত্ত্বের বিশ্লেষণের প্রবক্তা—যথা ইংল্যান্ডের Stanley Jevons, ফ্রান্সের লিওঁ ভালরা ও অস্ট্রিয়ার Carl Menges—এঁরা সবাই প্রথমজীবনে গণিতচর্চা করেছিলেন। পরে ইংল্যান্ডে অ্যালফ্রেড মার্শাল, যিনি গণিতে একজন প্রথমশ্রেণির র‍্যাংলার ছিলেন, নয়া-ধ্রুপদী অর্থতত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তা কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের। জেভন্‌সেরা শুধু গাণিতিক দিক থেকে সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করেছিলেন। অর্থনীতিতে কীভাবে সমস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কথাই শুধু ভেবেছিলেন। ওই সমস্থিতি জনগণের স্বার্থসিদ্ধি করছে কি না, সেদিকে এঁদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এ বিষয়ে শেষ কথা বললেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসের অধ্যাপক Lionel Robbins। 1930 সালে তিনি একটি প্রভাবশালী বই—*An Essay on the Nature of Economic Science* লেখেন। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে যখন কোনও পণ্যের জোগান ও চাহিদা সমান হয় তখনই বাজারে সমস্থিতি আসে, সম্পদ প্রতিস্থাপন দক্ষতম হয়। Equilibrium is just equilibrium—এই ভারসাম্যের পেছনে জনগণের অনুমোদন আছে, না নেই সেটা অর্থতাত্ত্বিকের দেখার কথা নয়। অর্থাৎ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ধারণাটি অর্থতাত্ত্বিকদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। কট্টর নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিকদের সম্ভবত এইটেই শেষ কথা। অ্যালফ্রেড মার্শাল অবশ্য প্রখ্যাত ইংরাজ নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিক হলেও একজন ব্যতিক্রমী তাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁর *Principles of Economics* গ্রন্থে অর্থশাস্ত্রের অভিষ্টের কথা তিনি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন: তাঁর ইংরাজি উক্তির তরজমা করলে বলা যায় যে অর্থশাস্ত্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব নিকাস (ordinary business of life) করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে; বাস্তবে উপকরণগুলিকে কীভাবে সদ্ব্যবহার করলে সমাজের কল্যাণ হবে তারই সম্যক পর্যবেক্ষণ করাই অর্থশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। বলা যেতে পারে আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বের (Welfare Economics) শুরু হয়ত মার্শালের এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই। অনেকে বলে থাকেন যে কেমব্রিজে মার্শালের সুযোগ্য ছাত্র অ্যালেক পিগুর লেখা *Wealth and Welfare* (1912) এবং পরবর্তী পর্যায়ের তাঁরই *Economics of Welfare* (1920, 4th edn)-এর বিভিন্ন সংস্করণে কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বের যে বিস্তৃত আলোচনা আছে সেখান থেকেই কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্র একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছে। এটি অবশ্য বিতর্কের বিষয়। এখানে একটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মার্কিন দার্শনিক Will Durant বলেছেন Science gives us knowledge—বিজ্ঞান আমাদের তথ্য ও জ্ঞান দেয় মাত্র; একমাত্র দর্শনই আমাদের প্রাজ্ঞ করে তুলতে পারে—'Only philosophy can gives us wisdom।' একই মন্তব্য একটু অন্যভাবে বলেছেন ভারতীয় দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন; 'Greater Knowledge has not resulted in greater wisdom।'

যাঁরা আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বের আলোচনা করেন তাঁদের সুস্পষ্ট মত হল যে নয়া-ধ্রুপদী তাত্ত্বিকেরা যে অর্থশাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্রের গণ্ডির বাইরে রাখতে চেয়েছেন তাতে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে অর্থশাস্ত্রের দু'টি উৎস মূল আছে। একটিকে ন্যায়শাস্ত্র-সম্বলিত ঐতিহ্য—ethics related tradition এবং অন্যটিকে কারিগরি বিদ্যা-সম্বলিত ঐতিহ্য—engineering related tradition আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর *On Ethics and Economics* গ্রন্থে এভাবেই বিষয়টিকে দেখেছেন। প্রথম ধারাটি এসেছে অ্যারিস্টটল থেকে। তাঁর *The Nicomachian Ethics* এবং *Politics* গ্রন্থ দুটিতে স্পষ্টোক্তি আছে, অর্থশাস্ত্র শেষমেশ নীতিশাস্ত্র এবং রাজনীতি সম্পর্কিত একটি বিষয়। অর্থশাস্ত্রকে কোনওমতেই ethics এবং political philosophy থেকে আলাদা করা সমীচীন হবে না, কারণ মানবিক প্রেরণা (human motivation) সাধারণভাবে নৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। আমরা কীভাবে বাঁচব, তার উত্তর পেতে গেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নীতিগত প্রশ্ন তুলতেই হবে। আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বে এই ধারণা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় ধারাটি অর্থাৎ কর্মকৌশলের কারিগরি দৃষ্টিভঙ্গিটি তৈরি হয়েছে নানা সূত্র থেকে। ফরাসি অর্থতাত্ত্বিক লিওঁ ভালরা, যিনি বাজারে সার্বিক সমস্থিতির ধারণাটির জনক; শিক্ষাগত যোগ্যতায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বাজার কীভাবে লেনদেন চালায় তার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সার্বিক সমস্থিতির ধারণাটির প্রবর্তন করেন। এটি সাড়া জাগানো একটি মৌলিক তত্ত্ব। সুপ্রাচীন কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রেও* কারিগরি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। এর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। *অর্থশাস্ত্রের* প্রথম পরিচ্ছেদে কৌটিল্য জ্ঞানের চারটি বিভাগের কথা বলেছেন (four fields of Knowledge)। এর মধ্যে অধিবিদ্যা

(Metaphysics), ন্যায়শাস্ত্র, সরকার চালাবার বিজ্ঞান, এবং ধনসম্পদের বিজ্ঞান সবই আছে। ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোচনায় তিনি অর্থশাস্ত্রে আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, যথা কী করে গ্রামগঞ্জ তৈরি করা যায়, রাজস্ব আদায়ের সঠিক পন্থা কী, কী করে খরচপত্রের হিসাব রাখতে হয়, আমদানি, রপ্তানি শুল্কের হার কীভাবে নির্ধারণ করা যায় ইত্যাদি, এসবেরই আলোচনা আছে। এমনকী 'কূটনৈতিক সম্পর্ক' কীভাবে স্থাপন করলে নিজের দেশের লাভ হবে, উপনিবেশ স্থাপনের জন্য কী ধরনের চুক্তি সুবিধাজনক, এমনকী সব দিকে নজর রাখার জন্য গুপ্তচর নিয়োগকেও কৌটিল্য সমর্থন করেছিলেন। এটা সুস্পষ্ট যে কৌটিল্য নৈতিকতার ধার ধারেননি। মানবিক প্রেরণা, উদ্যোগের পেছনে কোনও গভীর নীতিবোধ আছে কি না, সেটি কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* গ্রন্থটিতে কোনও স্থান পায়নি।

নীতিশাস্ত্র থেকে অর্থশাস্ত্রকে আলাদা করে দেখার এই যে প্রবণতা ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, এটি অর্থশাস্ত্রের মতো একটি সামাজিক বিজ্ঞানের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। এই মন্তব্যই শ্রীসেন জোরালো যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে মানুষের প্রেরণা এবং উদ্যোগ ও ব্যবহারিক আচরণে নীতিশাস্ত্র-বিবর্জিত সঙ্কীর্ণ কারিগরি দৃষ্টিভঙ্গিরও একটি সুফল আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সার্বিক সমস্থিতির ধারণাটির উল্লেখ করেছেন। সামাজিক পারস্পরিক নির্ভরতার ব্যাপারটি এতে স্পষ্টতর হয়। ফলে এই গণিতভিত্তিক বিমূর্ত ধারণাটির সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন রুজিরোজগারের সমস্যাও অনেকটা সমাধান করা সম্ভব হয়। এসবই তাত্ত্বিক কচকচি। এর মধ্যে আমরা এখানে প্রবেশ করতে চাই না। আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া যাক।

অ্যাডাম স্মিথ যে self-interest-এর কথা বলেছেন—লোকে শুধু স্বার্থসিদ্ধির কথাই ভাবে—এটি কতটা গ্রহণযোগ্য? বলাই বাহুল্য যে শুধু স্বার্থসিদ্ধির কথা ভাবলে ন্যায়নীতিকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। আমাদের বাস্তববাবহার কি সত্যিই এই মতে সায় দেয়? শাস্ত্রে স্মিথের self-interest ধারণাটির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্মিথ self interest -এর কথা বললেও একই সঙ্গে sympathy অর্থাৎ সহমর্মিতার কথাও বলেছেন। এর ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আছে *Wealth of Nations* গ্রন্থটিতে। বাজারের কাজকারবারে সহমর্মিতা না থাকলে তিনি পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক লাভের কথা কখনওই বলতেন না। স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কীর্ণ যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধতা করে অমর্ত্য সেন বলেছেন আমাদের সাধারণ আচরণেও আমরা self-regarding action থেকে other-regarding action-এর কথাও প্রায়শই ভাবি। একটা দৃষ্টান্ত দিলে সহজেই বোঝা যাবে। ধরা যাক রেলের ভিড়ে ঠাসা কামরায় একজন যুবক একটি আসনে উপবিষ্ট। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেখা যাবে যে অন্তত শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই যুবকটি ওই বৃদ্ধকে আসন ছেড়ে দেবে। এমন ঘটনা তো আমরা ট্রামে-বাসের নিত্যযাত্রীরা প্রায়ই দেখে থাকি। একে কী বলবেন? স্বার্থত্যাগ, না বৃহদর্থে স্বার্থসিদ্ধি? স্বার্থসিদ্ধির পরিধিকে যদি একটু বিস্তৃত করে ভাবি তাহলেই বুঝতে পারব যে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখালে সবারই মনে একটা তৃপ্তিবোধ জাগে। এই সহানুভূতির ভাব না থাকলে সমাজ-ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়বে। কল্যাণমূলক যে অর্থশাস্ত্র গড়ে উঠেছে তাতে সামাজিক কল্যাণের সর্বোচ্চায়ন করতে হলে সমাজে ঐকমত্য জরুরি। এই সত্য অবশ্যই সহমর্মিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীসেন তাঁর কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বে এই সহমর্মিতার ওপর জোর দিয়েছেন। অর্থতত্ত্বে আমাদের আচরণের যৌক্তিকতার যে কথা বলা হয় তার একটি নতুন ধরনের ব্যাখ্যা আমরা এখানে পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিতে পাবে না। Positive এবং Normative economics-এর যে পৃথকীকরণ করা হয় তার একটি যুক্তি হল বর্ণনামূলক অর্থবিদ্যা থেকে আমরা অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত, তার ধারণা করতে পারি এবং সেই ধারণাকে ভিত্তি করেই কল্যাণমূলক অর্থবিদ্যা যুক্তিসম্মত হয়ে ওঠে।

কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহজ থেকে ক্রমশ জটিলতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সে ইতিবৃত্ত এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এটুকু বললেই এখানে যথেষ্ট হবে যে একদিকে দেখি কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্রের কোনও ভিত্তিই নেই তা সপ্রমাণ করেছেন প্রখ্যাত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ কেনেথ অ্যারো। অন্য দিকে অমর্ত্য সেনের মতো অর্থশাস্ত্রীরা অ্যারোর বিরোধিতা করে কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্র যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়, তার প্রমাণ দিয়েছেন। সমস্ত বিষয়টি বেশ জটিল এবং বিতর্কমূলক। এসব কথা থাক। জরুরি কথা হল যে যাঁরা মনে করেন যে গণিতের ভাষা নিরপেক্ষ তাই সমাজ-বিজ্ঞানের মতো একটি শাস্ত্রে গণিত ব্যবহার সঙ্গত নয়, তা কিন্তু ঠিক নয়। আগেই বলা হয়েছে যে গণিত একটি ভাষা। এই ভাষা ব্যবহার করলে আমাদের যুক্তির ফাঁকফোকরগুলো ধরা পড়ে, যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছই তার যুক্তিগ্রাহ্যতা সুদৃঢ় হয়। গাণিতিক ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলা চলে না; গাণিতিক ভাষার অপপ্রয়োগ ঘটলেই

বিপদ। অর্থশাস্ত্রে গণিতের অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি পাওয়া যায়। তবে যোগ্য গাণিতিক অর্থনীতিবিদও অপ্রতুল নয়। তাই আমরা দেখি আধুনিক কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বেও পর্যাপ্ত গণিত ব্যবহার করা হয়েছে।

স্যামুয়েলসনের মতো গণিতপ্রিয় অর্থতাত্ত্বিকও কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব আলোচনা করেছেন গণিতের মাধ্যমে। সামাজিক কল্যাণ অপেক্ষক (Social Welfare function) অথবা সর্বজনভোগ্য দ্রব্যের (public goods) চরিত্র বিশ্লেষণে উচ্চস্তরের গণিত ব্যবহার করেছেন। কেনেথ অ্যারোর *Social Choice and Individual Values* (1951) গ্রন্থে symbolic logic ব্যবহার করে কারও কারও ভীতির সঞ্চার করেছেন। এমনকী অমর্ত্য সেন অ্যারোর মতের বিরোধিতা করে যে অন্য ধরনের কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্ব খাড়া করার প্রয়াস করেছেন, তাতেও গণিত প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। ইদানীন্তন এও লক্ষ করা যায় যে কোনও কোনও তরুণ গাণিতিক অর্থনীতিবিদ, যাঁরা অমর্ত্য সেনের তত্ত্বকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করেছেন, তাঁরাও ঢালাওভাবে কল্যাণমূলক অর্থতত্ত্বে গণিতের আশ্রয় নিয়েছেন। দারিদ্রের পরিমাপ করেছেন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। Ethically flexible measure of poverty, প্রবন্ধের এই নামকরণ থেকেই তা বোঝা যায়। *Ethical Social Index Number* গ্রন্থটির প্রামাণ্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই, তবে ওই গ্রন্থে যে ধরনের গণিত প্রয়োগ করা হয়েছে, তা আমাদের মতো অগাণিতিক অর্থনীতিবিদদের পক্ষে প্রায় দুর্বোধ্য। সুতরাং গণিত বনাম নীতিশাস্ত্র এমন দ্বন্দ্বের ছবি আঁকা ঠিক নয়। নিন্দনীয় হল অর্থশাস্ত্রে গণিতের অপপ্রয়োগ।

কল্যাণমূলক অর্থশাস্ত্র যেহেতু ন্যায়-নীতির অনুশাসন মান্য করে, সেইহেতু সমাজের দুঃস্থ, অশিক্ষিত, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের উন্নতির দিকে বেশি নজর দেয়। অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষের কারণ অন্বেষণ করেছেন। শিক্ষার, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মান কীভাবে বাড়ানো যায় তার বিশদ আলোচনা করেছেন। সমাজে অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা এসব দূর করার পেছনে অর্থশাস্ত্রীদের অবশ্যই একটি সমাজ স্বীকৃত মূল্যবোধ থাকে। আর্থিক উন্নয়নের আধুনিক যে অর্থতত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তাতেও development with human face লক্ষ্য হিসাবে পুরোভাগে রাখা হয়েছে। মানুষের কল্যাণেই উন্নয়নের সার্থকতা। খালি জাতীয় আয় বৃদ্ধি করলেই চলবে না, সেই বর্ধিত আয়ের সুফল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রচালকদের একটি মূল্যবোধ থাকলেই এরকম লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন হল এই মূল্যবোধ কী করে সৃষ্টি করা যায়। শিখিয়ে পড়িয়ে কী এই মূল্যবোধ জাগানো যায়? এর সহজ উত্তর আমার জানা নেই। হয়ত কেউই এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না। এ সত্ত্বেও বলতে হবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নানা কারণে অপরিহার্য। স্বামী বিবেকানন্দ জনশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এ শিক্ষা শুধু অক্ষরপরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে আধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিকভাবে গড়ে তুলতে পারে। এইভাবেই হয়ত সমাজে একটা মূল্যবোধ জেগে উঠবে। এটা সময়সাপেক্ষ; আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। উদ্দেশ্যে একটাই : আসল মানুষ গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে সমাজের সর্বত্র অর্থনীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। দর্শন, কাব্যসাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা, রাষ্ট্রনীতি, এ সবেরই ভিত্তিভূমি হল অর্থনীতি। এই ধারণাকে একটি মার্কসীয় প্রত্যয় বলে নিন্দা করা ঠিক হবে না। এর ঐতিহাসিক অভ্রান্ততা সর্বজনস্বীকৃত। তাই আমরা যাই করি না কেন তা সমাজের সব শ্রেণির উপকারে না এলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করতে হবে। এই মানসিকতা যদি গড়ে না ওঠে তাহলে সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে, এ কথা বলা যাবে না। সকলকে ভালবাসতে হবে, আপনজন বলে মানতে হবে। এই মূল্যবোধ যদি সৃষ্টি না করতে পারি তাহলে সমাজ ক্রমশই অবক্ষয়ের পঙ্কে নিমজ্জিত হবে। অর্থশাস্ত্রীয় সূত্র, তত্ত্ব ও কৌশল যদি তর্কশাস্ত্রের নিয়ম মেনে গঠিত হয়ও, তাহলেও তা মূল্যহীন। শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত এটি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরই একটি কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করি :

সবলে কারেও ধরি না বাসনামুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে,
যখন ছেড়েছি উচ্চে ওঠার দুরাশা,
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নীচুতে।

কবিগুরুর এই আপ্তবাক্যকে যদি জীবনে রূপায়িত করি তাহলেই আমাদের সার্থকতা, নচেৎ সমস্ত মানবজীবনই হয়ত ব্যর্থ। অর্থতত্ত্বের আলোচনা মূল্যহীন এবং অবান্তর।*

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার কর্তৃপক্ষ আয়োজিত আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা। প্রদত্ত সময় ২৩শে মে, ২০০৬।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও সাম্প্রতিকতা

দিলীপকুমার সিংহ

শিরোনামটি অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে ফ্রয়েডের একশো পঞ্চাশতম জন্মবর্ষপূর্তির জন্য। ফ্রয়েড, মার্কস, ডারউইন প্রমুখ দিকপালদের কথা যখনই ওঠে, তখনই তাঁদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্মর্তব্য কী কী তা লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়। ঐতিহাসিক দিক থেকে তাঁদের সব অবদান গ্রহণযোগ্য না হলেও, সাম্প্রতিককালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের অবস্থান কোথায় তার উল্লেখ অপ্রতিরোধ্যভাবে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল সাম্প্রতিককালের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রয়েডকে নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা তথা আলোচনা করা, বিশেষ করে সৃজনমুখিতার নিরিখে। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তাত্ত্বিক অবদান এইদিকে যে কতখানি মূল্যবান এবং ফ্রয়েড যে প্রাসঙ্গিকভাবে মানুষের সৃজনমুখিতা নিয়ে ভাবনাচিন্তার কতখানি পুরোধা ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়াস রয়েছে এই প্রবন্ধে।

ফ্রয়েডের নাম করলেই সাদামাটাভাবে মনের আনাচে-কানাচে কাম-সম্পর্কিত আরোপ কোথাও না কোথাও বর্তাবে বা রূপ পরিগ্রহ করবে। এই ব্যাপারটার অনুশীলন এবং প্রয়োগসমূহ এত ব্যাপ্ত, অনেক বড় বড় মনীষীদের সৃষ্টিতে অনুশীলনে, কর্মশৈলীতে যেভাবে প্রকট হয়েছে সেসব কথা স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে। মনুষ্যপ্রকৃতি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে কিন্তু ফ্রয়েড যতক্ষণ না নিপীড়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু বললেন, ততদিন এই দিকে মনীষীদের নজর আকৃষ্ট হয়নি।

যেমন কার্ল মার্কস সচেতনতার ত্রুটির সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অনেক সমাজ-জীববিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছেন যে কীভাবে আমাদের বেশ কিছু ক্রিয়াকলাপ, বিশেষ কয়েকটি চাপ থেকে উদ্ভূত হতে পারে, আর যার ফলে আমাদেরই কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু পারস্পরিক অন্তর্দৃষ্টি অনেকাংশে প্রতারণা হিসাবে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। কে না জানে ফ্রয়েডীয় অসচেতনতা তত্ত্ব, আইনস্টানের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, পিকাসোর কলাশিল্প, জেমস জয়েসের সচেতনতার-স্রোতময় গদ্য ইত্যাদিকে মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে, যা বহুকালের অনেক বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করেছে, ফ্রয়েডের জীবনপঞ্জি এতই বৈচিত্রপূর্ণ ও সুবিদিত যে সে সম্পর্কে কোনও রকমের পুনরুক্তি সমীচীন হবে না কিন্তু তাঁর জীবন কাহিনির কিছু জানতে হলে সুস্মর্তব্য হবে ফ্রয়েডের একটি অসাধারণ কথা। মূলত, তা ছিল সুখী জীবনের রহস্য সম্পর্কে একটি প্রশ্নের আপাতবিরোধী সদুত্তর, তা হল : 'ভালবাস ও কাজ করে যাও' আর এই দু'টি কথার মাধ্যমেই যা যা সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে, তারই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। ফ্রয়েড-প্রণীত বহু রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি প্রামাণ্য আকার ধারণ করেছে।

আমাদের সাধারণ জীবনেও আমরা সম্মুখীন হই লালসা ও সংযম। এমনকী উভয়েরই যৌক্তিক ও অযৌক্তিক দ্বন্দ্বের মধ্যে। ফ্রয়েডীয় ভাষায় আমরা সেইটিকে 'অসচেতনতা' আখ্যা দিতে পারি যেখানে শৈশবের নিপীড়ন হয়ে যায় স্থিত; আবার ফ্রয়েড-পরবর্তী যুগের মনোবিজ্ঞানীরা যথা ইয়ুংপন্থীরা অবশ্য এইটিকে এক ধরনের 'একত্রিত অসচেতনতা' বলেছিলেন। ফ্রয়েডের উত্তরসূরিরা যথা অ্যাডলার ও ইয়ুং যে অনেক বক্তব্য রেখেছেন ফ্রয়েডের তত্ত্বের বিরোধিতা করে তা-ও প্রায় সর্বজনবিদিত। মনঃসমীক্ষণ চর্চার শুরু ১৮৯৩ সালে ভিয়েনাতে। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব যে কত রূপ গ্রহণ করেছে তার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে নানাভাবে। আমাদের প্রাথমিক আলোচনা সীমিত রাখব মুখ্যত ও মূলত ফ্রয়েড যা পেশ করেছিলেন ১৯৩৯ পর্যন্ত, যা ছিল তাঁর প্রয়াণবর্ষ। যে যাই বলুক ফ্রয়েডের আত্মসমীক্ষা, বিশেষকরে মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে মূল্যায়ন, বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ফ্রয়েডের কিছু ব্যক্তিগত মত ছিল আকর্ষণীয় কিন্তু তিনি সেগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হননি। যেমন তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে, যে মতামত আমি পেশ করেছি সেগুলি সম্পর্কে আমার নিজের বিশ্বাস আছে কি না এবং তাহলে তা দুরপ্রসারী কি না। আমার উত্তর হবে যে আমি

নিজে বিশ্বাস করিও না বা অন্যকে বিশ্বাস করাতেও চেষ্টা করিনি। আরও সঠিকভাবে বললে, আমি জানি না, কতদূর এগুলি বিশ্বাস করি'। তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫-এ মার্কিনমুলুক থেকে, সেখানে তিনি বলেছিলেন : 'আমার জীবনের নানা কাজের দিকে পিছন ফিরে যখন তাকাই, আমি বলতে পারি যে আমি অনেক কিছুই শুরু করেছিলাম এবং অনেক প্রস্তাবও রেখেছিলাম। ভবিষ্যতে কিছু তার থেকে উদ্ভূত হবে কিন্তু তার মধ্যে কত কম বা বেশি হবে সে সম্পর্কে বলতে পারি না'। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যা হালআমলের সৃজনশীলতা ও সৃজনমুখিতাকে সহায়তা ও সমর্থন জোগাতে পারে।

সাম্প্রতিকতা ও সার্বিকতার সাযুজ্য এতই বিস্তৃতি অর্জন করেছে যে হেন বিষয় বা চর্চা অধুনা দেখা যাচ্ছে না যা আন্তর্বিষয়কতা থেকে মুক্ত। অনিশ্চয়তা, অযৌক্তিকতা, অনিয়ন্ত্রণ, আংশিক উন্মত্ততা ইত্যাদি কোথাও-না-কোথাও মানুষের চেতনাকে আগ্রাসী অঞ্চলে এনে ফেলেছে। ভাবলে হয়ত বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে এই সংক্রান্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ এমনকী গণিত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফ্রয়েড গণিতকে দেখেছিলেন কামজ ব্যবস্থার এক ধরনের ব্যতিক্রমী বিকল্প এবং এই সম্পর্কে অতৃপ্ত প্রেমিকের সম্বন্ধে রুশোর বক্তব্য প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন। সান্ডোর ফেরেনসিজি, যিনি ছিলেন ফ্রয়েডের কাছের মানুষ, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (১৯৫৩ সালে বিলেত থেকে প্রকাশিত) গণিত সম্পর্কে ফ্রয়েডের আলোচনার কথা বলেছেন যা অপ্রকাশিত হলেও, মুখ্যত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট (explicit ও implicit) গণিত সম্বন্ধীয়; এই গণিতের গুরুত্ব আজকালকার লোকগণিতচর্চার ক্ষেত্রে প্রায়ই উল্লেখিত হচ্ছে। অসচেতনতার গাণিতিকীকরণ বা বিপরীত দিক থেকে গণিতের মনঃসমীক্ষণ অধুনা প্রাধান্য পাচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই দিকের প্রাসঙ্গিক কিঞ্চিৎ আলোচনা সংযোজিত হয়েছে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অনুগামী বিষয় হিসাবে।

এখনকার কালে কিছু বলতে গেলে, বিশেষ করে সৃজনশীলতা সম্পর্কে, পুনরাবৃত্তি না করে এমন কিছু বিষয় অগ্রাধিকার পাচ্ছে যে ফ্রয়েডীয় অসচেতনতা তত্ত্বের নতুন ধাঁচে প্রয়োগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ঔৎকর্ষ ও অভিনবত্ব, শিল্পজগতে বিশ্বায়নের আওতায় নতুন থেকে নতুনতর আকার গ্রহণ করে চলেছে। বলা হয়ে থাকে কৌশল অর্থাৎ strategy কথাটি সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে Cognition বা অসচেতন বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া, নতুন আঙ্গিকে ব্যবহৃত হচ্ছে। যখন কোনও ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করছে তখন বিবর্তনশীল না হবার বিকল্প কোথায়? Cognitive strategy শব্দ দু'টি তাই খুব দ্রুত এসে গেছে আর তা না হলে কোনও সমস্যার মোকাবিলা বা আপেক্ষিক সমঝোতা সম্ভব হবে না। এঁচিক বা আবশ্যিক কোনও ভাবেই তা হল উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনারহিত। উঁচুমাপের আলোচ্য বিষয়ে মনঃগতিবিদ্যার (psychodynamic) প্রয়োজনীয়তা যে হবে তা পূর্বে কখনও বোঝা যায়নি। রেনেসাঁস জমানায় বহুমুখী প্রতিভার আলোচনায় ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণাত্মক অসচেতনতা প্রভূত। কিন্তু সাদামাটা খবরাখবর পর্যায়ে জনপ্রিয় করার বিষয় মনস্তত্ত্বভিত্তিক যে হতে পারে তার নজির আজকাল অনেক পাওয়া যায়; এই প্রসঙ্গে উদাহরণ বোধকরি নিষ্প্রয়োজন। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে, বিশেষকরে যা সমাজের গতি-সম্পর্কিত, তার সামগ্রিক মূল্যায়ন তা হলে কি বিলম্বিত হতে পারে? যেমন হাল আমলে গণিতচর্চার এঁচিকতা বা পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে অনবধানতা, আবেগমুক্ত হতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য-সমর্থিত হতে হবে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ কখনওই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বরং সাফল্যের নিশানা দর্শাবে। সৃজনমুখিতা সম্পর্কে ফ্রয়েডের একটি উভয়বল (ambivalent) মানসিকতার ধারণা চালু আছে। মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তৃতায় (দ্রষ্টব্য : *Lecture XVIII, Introductory Lectures on Psycho-Analysis*, London, 1963) তিনি, উদাহরণস্বরূপ বলেছিলেন যে শিল্পী হলেন মৌলত অন্তর্মুখী যিনি উদবায় (neurosis) থেকে মুক্ত নন। অতএব ফ্রয়েডীয় মতে কোনও শিশু সম্পর্কে পিতা বা মাতার এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে তাদের সন্তানের কোনও না কোনও সময়ের সৃজনমুখী গুণ দেখা যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে এটি মনে হতে পারে যে এ হল এক ধরনের অতিসরলীকরণ। মনঃসমীক্ষণ কখনওই ভাল বা খারাপ কলার মধ্যে তুলনা করে না। এমনকী একটি শিল্পকর্ম এবং স্নায়বিক দুর্বলতার মধ্যেও।

অনেকের মতে মনঃসমীক্ষণের প্রয়োগের দুর্বলতা এখানে। ব্যক্তিগতভাবে ফ্রয়েড ছিলেন কবিতার অনুরক্ত এবং যখন উনি শিল্পীদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাঁর মনের আড়ালে ছিল সৃজনশীল লেখকদের কথা, যদিও অনেকের মতে তাঁর দস্তয়েভস্কি, শেক্সপিয়র ও ইবসেনের ওপর রচনাবলির থেকে মিকেলাঞ্জেলোর ওপর লেখা এবং লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ওপর পুস্তিকা উৎকৃষ্টতর। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনায় প্রকাশিত এই মত এখনও স্মরণ করা যেতে পারে। বস্তুত বহু জায়গায় ফ্রয়েড লিখেছিলেন যে মনঃসমীক্ষণ সৃজনশীলতা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি জানিয়েছিলেন : মনঃসমীক্ষণ 'শৈল্পিক

প্রকৃতিকে না পারে বিস্তৃত করতে, না শৈল্পিক পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিতে'। সৃজনশীলতা সম্পর্কে ফ্রয়েডের অস্বস্তিকর দোনামনা বা উভয়বলতা আর্নেস্ট জোনসের লেখা ফ্রয়েডের জীবনীতেও বিশদভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এক সাংবাদিককে ফ্রয়েড লিখেছিলেন 'শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার অসম্ভাবনা যে বিশ্লেষণপ্রসূত তা কখনওই প্রশ্নাতীত নয়। তবে তা কিন্তু বিশ্লেষণের ত্রুটি নয়; এটি ঘটার কথা যে কোনও ক্ষেত্রে এবং এটি লাভবান হয় তখনই যখন সঠিক সময়ে তা জানা যায়'। মারিয়া থোমানকে লিখেছিলেন 'যখন একদিকে শৈল্পিক আবেগ, অন্তর্নিহিত প্রতিবন্ধকতার বিশ্লেষণ থেকে বেশি মজবুত, তখন তা পারদর্শিতার ক্ষমতাকে বিনষ্ট না করে সমৃদ্ধ করবে'। এই বক্তব্যের প্রকৃত ইঙ্গিত হল যে শৈল্পিক আবেগ হল পশ্চিমে যাকে বলে *sui generis* বা অনন্য। ফ্রয়েড যে নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগতভাবে সৃজনশীল ছিলেন তা বললে অতিশয়োক্তি হবে না। এমনকী একচল্লিশ বছর বয়সে যখন উনি তাঁর এক বন্ধুকে জানাচ্ছেন যে কামজ উত্তেজনা তাঁর মতো ব্যক্তির কাছে আর প্রয়োজনীয় নয়; তাহলে কি এটাই দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে তাঁর জীবনের পরবর্তী বিয়াল্লিশ বছরে সবকিছু আনন্দই অনুত্তেজক ছিল? অতএব শিল্পীর পক্ষে উত্তরণ (sublimation) স্বাভাবিক, শৈশব পর্যায় যাই থাকুক না কেন, ফ্রয়েডের আত্মকথা বা তার ওপর জীবনী এত মতানৈক্যে ভরপুর বিশেষ করে ভাষ্য বা ব্যাখ্যায় যে বহু উদ্ধৃতি সংকলিত হতে পারে যেখানে ফ্রয়েডের স্ববিরোধিতা, দোনামনা ইত্যাদির সমন্বয়ে এক ভাবমূর্তি প্রতিভাত হবে।

সৃজনশীলতার একটি বিশেষ দিক প্রজ্ঞার সঙ্গে যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা অনেকেরই জানা আছে; আরও জানা আছে যে গণিতানুশীলনের এক বিশেষ শৈলী হল প্রজ্ঞা-সমর্থিত। ফরাসি গণিতজ্ঞদ্বয় পঁয়কারে (১৮৫৪-১৯১২) ও হাদামার্দ (১৮৬৫-১৯৬৩) এই দিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। হাদামার্দ বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও একটি কথা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে নতুন ভাবনাচিন্তা অসচেতন পর্যায়ে উদ্ভূত হয়, বিশেষকরে গাণিতিক সৃজনশীলতার জন্য চাই অসাধারণ অথচ ফলপ্রসূ ভাবনাচিন্তার সংযুক্তি। তাঁর মতে, এই সংযুক্তির উৎস হতে পারে আকস্মিকভাবে, কিন্তু তা ঘটবে অসচেতন স্তরে এক অন্তর্বর্তীস্থানে। আবার, বয়োজ্যেষ্ঠ গণিতজ্ঞ পঁয়কারে আরও বিশদভাবে সমস্যার সমাধানে, নানা দশা চিহ্নিত করার মধ্যে নিহিত আছে প্রস্তুতির এক সচেতন প্রয়াস। ফ্রয়েডীয় উত্তরণ তত্ত্বের পূর্বসূরি তাই পঁয়কারকে বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র শব্দটির ব্যবহারের জন্য নয় (প্রাসঙ্গিক ইংরাজি শব্দ sublimal self), যা হল স্বজ্ঞাপ্রসূত উদ্দেশ্যহীন ও অব্যবহারযোগ্য। সচেতনতা কখনও গোচরের আওতায় এলেও গাণিতিক সৃজনশীলতা নিশ্চয়ই গাণিতিক লালিত্যকে উদ্ভাসিত করবে। এই ধরনের ভাবনাচিন্তার উদ্‌গাতা হলেন ফ্রয়েড; তাঁর সৃষ্ট মনঃসমীক্ষণ এই সৃজনশীলতাকে কয়েকটি মৌল-পদ্ধতি সমর্থিত চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে; অর্থাৎ বলা যেতে পারে এই জাতীয় চিন্তা মূলত হল অবচেতনমুখী। আদি দশার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, এমনকী বলা যেতে পারে এক ধরনের অলৌকিক আধারে শিশুসুলভ ও সম্পদশীল অবস্থা। মনঃসমীক্ষকদের মতে এই মৌল উপাদানগুলি সৃজনশীল ভাবমূর্তি ও প্রতীকী দিককে সমৃদ্ধ করে, যা ফ্রয়েডীয় মতে 'স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতার' মধ্যে নিহিত ছিল। অধুনা উদ্যোগী মহলে, Cognition সৃজনশীলতার এক বিশেষ আঙ্গিক হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে, যেখানে অসচেতন মানসিকতা, মনঃসমীক্ষকদের অভিমতে, তত্ত্বগত, উৎকর্ষগত, বৈচিত্রের উৎস হতে পারে, যার সম্ভাবনা অন্তত সচেতন মানসিকতা উদ্ভূত নয়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের পূর্ণ মূল্যায়ন তাই কি এ যুগে প্রয়োজনীয় নয়?

পরিচালনা-জগতে এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে যে সেখানে স্বাতন্ত্র্যের বা স্বকীয়তার চাহিদা আরও বিশিষ্টভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। এমনকী ওপরওলার নির্দেশ প্রশাসনিক স্তরে আজ প্রায় কালাতিক্রমী (anachronistic) হতে চলেছে। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি সম্যক রূপ পরিগ্রহ করানো এখন একটি অমোঘ কর্তব্য হিসাবে পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হচ্ছে; নিশ্চয়ই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সেখানে মদত জোগাচ্ছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা সেখানে নানা রূপে দেখা যাচ্ছে। অসচেতনতা, অবচেতনতা, সচেতনতা—এই দশাত্রয়ী আশাতীতভাবে আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে অংশগ্রহণ করছে। বলতে গেলে, সচেতন ধাক্কা (intervention)'র অভাবে অসচেতন যোগাযোগ প্রভাবিত হবেই। মানসিক পর্যায়ে, অসচেতনতা যে সৃজনশীল ব্যক্তিকে জানবার আগ্রহ বা জ্ঞাতব্য হতে প্রাথমিক অনুভবকে সমর্থন করবে, তা বললে কোনও ভাবেই অতিশয়োক্তি হবে না। যে কোনও উদ্যোগের বা প্রয়াসের আপাত সাফল্য-ইঙ্গিত দেখা গেলেও, অসচেতন মানসিকতাশৈলী সৃজনমুখী হতে সহায়তা করবে। আরও সোচ্চারে ভাবলে অনুভূত হবে সৃজনশীলতার সহায়কের আকার। মূলত তা ঘটে অসচেতন পর্যায়ে, বিশেষ করে, অধুনা ব্যবসাবাণিজ্যের উৎকর্ষের নিমিত্ত। এ কথা চিন্তাজগতে একটা বড় স্থিতি অবস্থান অর্জন করেছে। সৃজনমুখী অন্তর্দৃষ্টি যদি সমস্যার সমাধানে হাতিয়ার হতে হয়,

তবে প্রয়োজন, প্রাসঙ্গিক অসচেতন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিগূঢ় অনুসন্ধান ও গবেষণা। তাই মনস্তাত্ত্বিকরা সমস্যা নিরসনের বিশ্লেষণকে 'protocol analysis' আখ্যা দিতে প্রয়াসী হচ্ছেন। সৃজনশীলতাকে আবার এক নতুন নামে বলা হচ্ছে, psychopathology: প্রশ্ন উঠেছে যে এই নতুন বর্ণনা সৃজনমুখিতাকে সাফল্য জোগাবে, না অন্য কিছু হবে? অবিচ্ছেদ্যভাবে সহায়ক বা কোনও-না-কোনওভাবে সম্পর্কিত হয়ে কি আদৌ পাওয়া যাবে এক নতুন চিন্তা? যদি পাওয়া যায়, ফ্রয়েড অবিসংবাদিতভাবে যে এই নতুন চিন্তার পথিকৃৎ, তা বললে কি অন্যায় হবে? হালআমলে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে এই উদ্যোগসমূহের স্বচ্ছ আঙ্গিকে হলেও উভয়ই যে মানসিক প্রক্রিয়া প্রসূত তার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন আবার সেই ফ্রয়েড। অসচেতন আকাঙ্ক্ষা যে বিদগ্ধ হতে পারে, বিশেষকরে, যা আমরা জানছি কৃত্রিম ব্যাকরণ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, যার ঐতিহাসিক উৎস ও প্রেরণা আবার সেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে। মোট কথা, সৃজনশীলতা আশা-তৃপ্তি রূপ হলেও পরিচালন সংস্থায় 'ওপর-নিচু' দিক অপেক্ষা 'নিচু-ওপর' দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব পাচ্ছে। পরিচালনার আওতায় আর একটা দিক একেবারেই পাত্তা পেত না, যা হল কোনও পদক্ষেপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কিছু অবগতি। পদক্ষেপের শুরুতেই যদি কোনও খামতি থেকে যায়, যেমন প্রাথমিক শর্তাবলির স্বল্প পরিবর্তন করলে, তা হলে কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে? অধুনা যে অনুশীলন চলছে এই ভবিষ্যৎ বা পূর্বাভাস সম্পর্কে তার থেকে দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে পূর্বাভাস বা ঘটনাচক্রের ক্রম অনিশ্চিত হতে পারে। আজকালকার জমানায় আমরা এক ছন্নছাড়া বা বিপর্যয়মুখী কিছু হতে পারে তার আশঙ্কা করে থাকি অর্থাৎ ক্রম (order) প্রত্যক্ষভাবে বিঘ্নিত হয়ে যায়, পৌঁছে যাই এক দশায়, ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি chaos; বাংলা তরজমায় বলা যেতে পারে অস্থিরতা। 'সৃজনশীলতা'র বা 'সৃজনমুখিতা'র অস্থিরতায় কী হাল হবে?

Chaos Incorporated নামে একটি সংস্থা বা এইরকম অনেক সংস্থা বিশ্বের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য কীভাবে 'সৃজনশীলতা', 'সৃজনমুখিতা' সকল উদ্যোগের আওতায় ও 'অস্থিরতা'কে স্বাভাবিকীকরণের স্তরে বাস্তবায়িত করা যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে যে বৃহৎ পরিণতি হতে পারে, এমনকী মানবসমাজে তার উদাহরণ অনেক দেওয়া যেতে পারে। খুব প্রচলিত উদাহরণ হিসাবে উল্লিখিত হয়ে থাকে, তা হল প্রজাপতি পরিণতি (Butterfly effect), যার অর্থ হল যে ব্রাজিলের কোনও এক প্রান্তে প্রজাপতি পাখা নাড়ালে আর এক সুদূর জায়গায়, যেমন ধরা যাক মার্কিনমুলুকের টেকসাসে আবহাওয়ার অবস্থা বদলে যেতে পারে; এটাও হল 'অস্থিরতার' একটি উদাহরণ। সম্প্রতি আমরা দেখেছি যে বিশ্বের কোনও-না-কোনও জায়গায় স্টক বাজারে খুব ক্ষুদ্র ধস নামাতে সেই সেই মহাদেশে কয়েক মাস পরে অর্থনৈতিক সংকট দেখা গেল; আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশেষকরে, সম্পর্কঘেঁষা অবস্থায় বেঠিক সময়ে অসঠিক কথা ব্যবহারের জন্য সম্পর্ক একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেল—ছোট কারণ, বড় ফল। এই ঘটনাগুলির চরিত্র অনুধাবন করে বিশেষণ দেওয়া হয়েছে অরৈখিক (nonlinear); অরৈখিকতা অস্থিরতার সৃষ্টি করতে পারে এবং বিবর্তনশীলও হতে পারে। এ-ও আমরা জানি যে মস্তিষ্কে কয়েক সহস্র স্নায়ুর মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের জন্য সচেতনতা উদ্ভূত হতে পারে, যেটা অবশ্য কোনওক্রমেই স্নায়ুর কর্ম নয়। মানবিক স্তরে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর আদানপ্রদানে বা ঘাত-প্রতিঘাতে যে পরিণতি হবে, তার পূর্বাভাস কখনওই পাওয়া যাবে না অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতাগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করলে। প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন অংশে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, উদ্ভূত হবে বেশ কিছু আশ্চর্য রকমের বৈশিষ্ট্য, যা নেটওয়ার্কের কোনও অংশেরই ধর্ম হিসাবে দৃশ্যমান হয়নি। এই হল সৃজনশীলতার একটি বিশেষ দিক। উৎকর্ষ সম্ভব হতে পারে এইরকম এক আদানপ্রদানকারী পরিবেশে; এমন শর্তের বা অবস্থার সৃষ্টিও হতে পারে যাতে সৃজনশীলতার স্বতঃস্ফূর্ততাও অর্জিত হবে। কিছু আগে আমরা উল্লেখ করেছি সংস্থাগত পরিচালনা সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে সেই পরিচালনায় যদি আত্মসাংগঠনিক (self organisation) চরিত্র নিহিত না থাকে বা প্রস্ফুটিত না হয় তবে সৃজনশীলতার জন্য কোনও রকম পরিবেশ গঠন করা যাবে না। কিছু পূর্বেই আমরা 'ওপর-নিচু' এবং 'নিচু-ওপর' দিকগুলির কথা বলেছি। কিন্তু তাদের সমন্বয়ের কথা এখনও পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি; বোধকরি নিচু-ওপর উদ্ভূত সৃজনশীলতা আপেক্ষিক দিক থেকে অনেকখানি সহায়ক। সৃজনশীলতার ঔৎকর্ষ যদি কোনও সংগঠনে মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই সংগঠনের বুনন এক ধরনের সৃজনশীল ও আকৃতিগত-টান প্রতিফলিত করবে। এ কথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃতির পর্যায়ে এসে গেছে যে ব্যবস্থা ও সংগঠনের মধ্যে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়; যা নির্ভর করবে সেই বিশেষ সংগঠনের সংস্কৃতি ও মানসিকতার ওপর। এমন কিছু সংস্কৃতি নিশ্চয়ই উদ্ভূত হবে না, যেখানে কোনও নতুন

ধরনের স্থিতি বা সমন্বয় বা তাদের সম্পর্ক সৃজনশীলতাকে বিঘ্নিত করে। একথা অনস্বীকার্য যে তলার থেকে ওপর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনেক জ্ঞানের উৎস হয়ে থাকে, কিন্তু সেই জ্ঞানকে যদি শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও সহজাত প্রবৃত্তি লাগানোর কালে সতর্ক না হলে তা সৃজনমুখিতাকে বিনাশ করতে উদ্যত হতে পারে, কারণ সৃজনশীলতার অবস্থান তো সেই জায়গায় যেখানে জ্ঞানের উদ্ভব ও ব্যবহার যুগপৎ হয়ে থাকে। সেই সৃজনশীলতাকে যদি ধরে রাখতে হয়, লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং অন্য স্থানে বিনিময়যোগ্য করতে হয়, তাহলে আবার সেই 'ওপরতলা থেকে নিচুতলা' পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। সৃজনশীলতা কি তাহলে কয়েকটি পদ্ধতির সমষয়? বস্তুত, এগুলি জটিলতা ও বিবর্তনশীল অবস্থার আওতার মধ্যে পড়ে, যদি আমরা ভাবি যে মোটামুটিভাবে তিনটি স্তরসাপেক্ষে এগুলির বিবর্তন ঘটছে। এগুলি ভাবা যেতে পারে এইরকম : (ক) সৃজনশীলতা, বিচিত্র ভাবনা চিন্তার মধ্যে অনেক সময় অন্তর্নিহিত থাকে (খ) নতুন ধরনের ভাবনাচিন্তা থেকে নতুন রূপরেখার আবির্ভাব এবং সেগুলি অনুধাবন করা (গ) এদের মধ্যে সর্বোত্তম ভাবনাচিন্তাকে যদি কার্যকরী করতে হয়, তাহলে সুষ্ঠুভাবে বাছাই এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা। যাতে সমন্বয় সুসম্পন্ন হতে পারে। অধুনা প্রযুক্তির এত ছড়াছড়ি, যে কোথাও যেন একে বিতরণ করার প্রচেষ্টা, বোধকরি, উৎকর্ষ ও সৃজনশীলতাকে পরিহার করে। অনেক সময় মনে হয় যে প্রতিরোধের সঙ্গে পাল্লা না দিয়ে স্থিতিস্থাপকতা (resilience)-এর সঙ্গে একটা সমঝোতা গড়ে তোলা; অন্যভাবে বললে, নিয়ন্ত্রণমুখী না করে অভিযোজন (adaptation) করে নেওয়া। বর্তমান যুগে তাই দেখতে পাই এক নতুন আধারের বিজ্ঞান, যার আখ্যা দেওয়া হয়েছে জটিলতা বিজ্ঞান (Complexity Science)। এই বিজ্ঞান, সংজ্ঞা অনুসারে, জটিল বাস্তবতার সঙ্গে যুঝবে; অতএব, নানা ভাবনাচিন্তার পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার, বিভিন্ন ক্ষেত্রসাপেক্ষে অংশীদারও হয়ে। পরিচালনার জগতে আমরা তাই পাই নানা সম্ভাবনার এক শঙ্কু (cone) যেখানে সৃজনশীলতা ও পারস্পরিকতা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বতঃই মনে হতে পারে যে মনস্তাত্ত্বিক দিক কোথায় যেন পিছন দিকে হঠে যাচ্ছে। কিন্তু, বস্তুত তা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ মনুষ্য সম্পর্ক সেখানে জড়িয়ে আছে। হালকাভাবে হলেও আমরা বলে থাকি, সৃজনশীল ব্যক্তির একটি উপমার্গের মননশীলতা আছে। অতএব মনস্তাত্ত্বিকতা কোনও ভাবেই পরিহার করা সম্ভব নয়। মানবমনস্তত্ত্বে অনেক সমান্তরাল ভাবনাচিন্তা খুঁজে পাওয়া যায়। আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক আলাপচারিতায় আমরা পাই এই মানবিক মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের মতে, আমাদের আবেগ ও কামনা অনেক সময় অসংযমী হলেও আমাদের চরিত্র সেগুলিকে এক ছন্দোময় সার্বিকতায় বশীভূত করে। আর একজন বিজ্ঞানী নিলস বোর জানিয়েছিলেন যে চিন্তা ও আবেগ আমাদের সচেতন জীবনশৈলীর বৈচিত্র ও সীমা সংরক্ষণ করতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিরন্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা আমাদের বাঞ্ছনীয় হলেও তার যেন বিকৃতি না ঘটে, আত্মতৃপ্তি বা আত্মউপাসনায়। আবার সেই মনস্তত্ত্ববিদ্যার কথায় আত্মমতবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে ইংরাজিতে যাকে আমরা বলি narcissism। আত্মমুখিনতা হয়ত আবার পুরনো কথায় এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি। এমনও হতে পারে যে পলায়নমুখিনতার এমন কিছু ক্ষমতা আছে যার সাহায্যে তার আদি প্রকৃতিকে ধরে রাখতে পারে এবং চারপার্শ্বের অমানবিক শক্তিগুলিকে প্রতিহত করতে পারে। এ যুগের একজন প্রতিষ্ঠিত মনস্তত্ত্ববিদ Paul Vitz একটু বিশদভাবে বলেছেন এইরকম : 'Narcissism a private stronghold against a hostile, mechanised modern world'। বিজ্ঞানজগতের বহু দিনের স্বীকৃত তত্ত্ব হল হ্রাসকরণ তত্ত্ব (reductionist theory)। সিগমুন্ড ফ্রয়েড সরাসরি না বললেও বা দেখলেও, তাঁর উত্তরসূরিরা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে কি এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক হ্রাসকরণবাদ (reductionism) করতে পেরেছেন? আবার সেই রবীন্দ্রনাথের কথায় এবং বর্তমান বিজ্ঞানজগতের মনীষী Penrose-এর কথায়, আত্মীকরণ (internalisation)কে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বা স্নায়বিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে স্বীকৃতি দিতেই হবে, না হলে সৃজনশীলতা ও সৃজনমুখিতার এমনকার জগতের চিন্তা-ভাবনার নিরিখে ব্যাখ্যা পাওয়া সহজ হবে না।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে আধুনিককালের প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হলেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে মনস্তত্ত্বের দিকে নজর দেওয়া, কোনও রকমের অনুসন্ধানে, আদৌ প্রয়োজন কি না। এমনকী সংকট, যদি কোনও বিষয়ে বা ঘটনায় উপস্থিত হয়ে থাকে, যেখানে বিষয় হিসাবে মনস্তত্ত্বের চাহিদা আবশ্যিক হয়ে দেখা দেয়? এইরকম বহু বিষয় বা ঘটনার অবতারণা করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে লেখকের পক্ষে সহজ হবে যদি গণিত বিষয় সংক্রান্ত দিকটির উল্লেখ করা যায়। সুতরাং এই প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশটি এই দিকের ওপর সীমিত উপস্থাপনা, যা মূলত গণিতচর্চার নির্যাস নিয়ে, বিধিবদ্ধ অতিসূক্ষ্মতাকে জড়িত না করে।

সব শাস্ত্রের মতো না হলেও, গণিতশাস্ত্রানুশীলনের একটি বৈশিষ্ট্য হল, ঐতিহাসিক পরম্পরাকে অনুপেক্ষিত করে তাত্ত্বিক দিক থেকে কোনও অসঙ্গতি বা অসংলগ্নতা এড়িয়ে যাতে গাণিতিক ভিত নড়বড়ে না করে গাণিতিক বক্তব্যকে সঠিকভাবে যুক্তিসঙ্গত পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করা। ফরাসি দেশে বুরবাকি (Bourbaki) গোষ্ঠীর কথা বলা যেতে পারে। গণিত বিবর্তনশীল এবং স্বজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ, উপপাদ্য অনুসিদ্ধান্ত ইত্যাদি মানসিক প্রস্তুতির সহায়তায়, গণিতস্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছে। এই প্রয়াসে গত দু'শতাব্দী ধরে দেখা যায় এক ধরনের সংকট আর তা মোকাবিলার জন্য শরণাপন্ন হতে হল মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে। জন্ম নিল, গণিতজ্ঞদের মতে, স্ব-মনঃসমক্ষীণ (autopsychoanalysis)। এর ফলে গণিতজ্ঞরা গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন মানসিক কাঠামোর গভীরতম স্তর থেকে আর পাওয়া গেল গাণিতিক আঙ্গিকে, কাঠামো/আকৃতি (structure) ও সম্পর্ক (relations)। দীর্ঘকাল ধরে গণিতে ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী অবলুপ্ত হল এবং এই দুই নতুন তত্ত্বের নিরিখে গাণিতিক জ্ঞানসম্ভার ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা দেখা দিল। গাণিতিক সৃজনশীলতায় দেখা দিল এক ধরনের টান (tension), যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। গণিত, বোধকরি লুক্কায়িত হল মনের জগতে, কিন্তু এর শাশ্বত উৎকর্ষ এক ধরনের বিশ্বাসে পর্যবসিত এমনভাবে হল যাতে মানবজাতির অস্তিত্ব (existence) কখনই বিঘ্নিত হবে না, শুধুমাত্র যে দীর্ঘময়াদি ভাবনাচিন্তার জগতে নয়, যার থেকে জন্মাল এক উদ্ভাবনী ভাবনাশক্তি। গণিতজ্ঞদের সচেতনতা বোধকরি থাকা খেল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'অইউক্লিডীয় জ্যামিতি'র বাস্তবতা সম্পর্কে। আবার প্রশ্ন উঠেছে, এমন কী মানসিক কাঠামো আছে যা থাকলে বীজগণিতবিদ, জ্যামিতিবিদ প্রমুখ গণিতজ্ঞরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত হতে পারেন? পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে গণিতজ্ঞরা নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন করেছেন : এর কি কোনও psychosomatic ভিত (basis) আছে? গণিত যেহেতু মানসিক ক্রিয়াকলাপজাত, শুধুমাত্র মানসিক অবগতি কি একমাত্র সহায়ক, মানসিক আয়তন উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে? সত্যি কথা বলতে কি, গণিতকে দেখা যেতে পারে, মনের এক বিশেষ ধাঁচের ক্রিয়া যার সঙ্গে অন্য রকমের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার যোগসূত্রতা গড়া যেতে পারে। বস্তুত গণিত হল মনেরই একটি আরোপ, যা বিচ্ছিন্ন করাতে, একত্রিত করাতে, চাপ সৃষ্টি করাতে এমনকী এড়ানোরও অংশীদার হতে পারে; বিশেষ করে, মন যখন নিজেরই ওপর কোনও কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই ধরনের মানসিক কার্যাবলি অভিব্যক্তির জন্য কার্যত চাই একটি সক্রিয় উপাদান, যাকে বলতে পারি ভাষণ (speech) যার আলোচনা বিস্তৃত বলে এখন তার থেকে বিরত থাকা সমীচীন। শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে এই অভিব্যক্তির গতিকে বিধিবদ্ধ আকার দিতে হলে নবগণিতের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

১৯৯৩ সাল ছিল ফ্রয়েডের অসচেতন সম্পর্কিত রচনার শতবর্ষপূর্তি; স্মরণ করা যেতে পারে এর জার্মান প্রতিশব্দ হল das Unbewasse, যা সিগমুন্ড ফ্রয়েডের প্রায় সব রচনা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য যে এই পর্যায়ে এটি লেখা মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মনঃসমীক্ষণ পৌঁছে দিতে পারে এক ধরনের ভাবনাচিন্তা, যা কোনও ব্যক্তির জীবনে এক সময়ে সব কিছু ছিল অসচেতনভাবে; কিন্তু নিপীড়িত হয়েছিল, কারণ তারা ছিল ফ্রয়েডীয় দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যের প্রতিরূপ। মনঃসমীক্ষণের প্রতিপাদ্য হল : এইরকম ভাবনাচিন্তা নিপীড়িত হয়ে থাকতে পারে বা বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু সক্রিয় থাকে ব্যক্তির জীবনে এবং ব্যক্তির জীবনে এক গোপন অথচ বলিষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে যায়। তাহলে মনঃসমীক্ষণ কি শুধু অসচেতনতায় ব্যাপৃত থাকে? তা শুধু করার নিমিত্ত করা নয়, কোনও কিছুর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়; এমনকী বর্তমানের উদ্বেগের পশ্চাদ্ধাবনে। অতীতকে স্মৃতিপটে জাগানোই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; অতীতকে নতুনভাবে জীবিত করা, যার ফলে বর্তমানের সঙ্গে তার সহাবস্থান সহজ হয়। বর্তমান পর্যায়ে, বিশ্লেষণের দায়িত্ব হল এই সম্পর্ককে বারংবার পুনরুজ্জীবিত করা। কিন্তু গণিত সম্পর্কে এর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? একদিকে আবেগ, আর একদিকে আপাত-শীতল বুদ্ধিমত্তা। আবেগমিশ্রিত জীবনশৈলীকে, তাত্ত্বিক জগতের বাস্তবতার নিরিখে ধ্বংস করা কি উচিত? অন্য দিক থেকে বললে, এরকম ভাবনাও আসতে পারে যে তর্ক-জগতকে আবেগ কর্তৃক দূষিত করা কি সমীচীন? এইগুলির আংশিক জবাব পাওয়া যাবে Ignacio Matte Blanco কর্তৃক প্রণীত *The Unconscious as Infinite Sets* গ্রন্থে যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে লন্ডন থেকে এবং যার সমালোচনা, দেখা গেল মনঃসমীক্ষণের ওপর এক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পত্রিকায়; বস্তুত, সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও অসীমোত্তর তত্ত্বের জনক Georg Cantor-এর (১৮৯৫-১৯১৮) অসীমতা ও অসচেতনতার যোগসূত্রতা স্থাপন সম্পর্কে। Matte Blanco-এর কাজটিকে অসচেতনতার গাণিতিকীকরণ বলা যেতে পারে। এর বিপরীত অর্থাৎ গণিতের মনঃসমীক্ষণ কি সম্ভব? হাঙ্গেরির এক বিশেষজ্ঞ Imre Hermenn, ১৯৮০ সালে প্রকাশিত তাঁর '*Parallelisms*' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন এই দিকে,

এমনকী Cantor সম্পর্কেও। আর একজন হচ্ছেন ফরাসি বিশেষজ্ঞ Michell Serries, যিনি তাঁর বিজ্ঞান ও গণিতের ইতিহাস সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধে একটি মনঃসমীক্ষণমূলক বিশ্লেষণে গণিতের উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন এবং বহু আলোচিত অয়দিপাউস মিথ বা সংগ্রামের সঙ্গে পিথাগোরাসের অমূলদতা তত্ত্ব অনুসন্ধানের সাযুজ্য দেখিয়েছেন। মনঃসমীক্ষক হিসাবে আগেই বেশ কিছু বলা হয়েছে, ফ্রয়েডের ধারণা ছিল যে কোনও ব্যক্তির জীবনের কয়েকটা বছর কেবলমাত্র পরবর্তী জীবনের গুণগত ধারাকেই নির্ণয় করবে তা শুধু নয়; এই প্রথম কয়েকটি বছর নির্ভর করবে জীবনের প্রথম কয়েকটি মাসের উপর। তাহলে ফ্রয়েড জীবনবিকাশের সময়সীমা ধরেছেন : তিন থেকে পাঁচ, যা হল তথাকথিত অয়দিপাউস-দশা বা গুঢ়ৈষা। ফ্রয়েডের আর একজন উত্তরসূরি, মহিলা মনঃসমীক্ষক Melaine Klein-এর মতে, এই দশা আরও আগের থেকে শুরু অর্থাৎ যখন থেকে শিশুর মাতৃবক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু। আর এক মনঃসমীক্ষক Wilfred Bion, গাণিতিক ভাষায় বলেছেন, এইরকম বয়স-পর্যায়ে, মানসিক ক্রিয়াকলাপ হল শৈশব অবস্থার অপেক্ষক। Bion তাঁর গ্রন্থে অনেক মনীষীদের কথা উদ্ধৃত করেছেন, তবে পঁয়ত্রিশের রচিত *Science and Method* নামে বিখ্যাত পুস্তকে বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতা সম্পর্কে উদ্ধৃতি আজও বিশেষভাবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক।

উপসংহারে বলা যায়, ফ্রয়েডীয় সাম্প্রতিকতা তখনই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, যখনই যুগপৎ প্রসঙ্গ ও সম্প্রতি নানাভাবে আলোচিত হতে থাকে; উভয়ের মধ্যে যোগসূত্রতা কোনও ক্রমেই যেন হারিয়ে না যায়, অর্থাৎ ইতিবাচক দিক থেকে তা যেন নিরন্তর প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকে। Bion তাঁর সুবিদিত *Learning from Experience* (প্রকাশক : Heinemann, London, প্রকাশকাল ১৯৮২) পুস্তকে ফ্রয়েডের ওপর যা মন্তব্য করেছেন, তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য; তা হল এই : Any experience may be used as a 'model' for future experience. This aspect of learning by experience is related to and may be identical with, the function Freud attributes to attention when he says it had 'periodically to search the outer world in order that its data might be already familiar, if an urgent need should arise'। একথাগুলি আজও প্রযোজ্য, বিশেষকরে উদ্যোগী প্রয়াস সম্পর্কে ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানার্জনে। আর একটু বলা যেতে পারে যে Bion মনঃসমীক্ষণের 'মডেল' নির্মাণে প্রেরণা পেয়েছিলেন গণিত তর্কাচার্য Alfred Tarski-র থেকে। এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলে গাণিতিক জগতের আপেক্ষিকভাবে জটিল তত্ত্বে উপনীত হতে হবে, যেখানে গণিতজগতের দুই দিকপাল Gödel ও Cohen-এর গাণিতিক অবদানের কথা অবশ্যই এসে যাবে ফ্রয়েডের দেড়শো বছর জন্মপূর্তিতে। প্রসঙ্গত রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে যেন আমরা ভাবি : 'We need not feel that we are faced with a choice between poetic warmth and the cold, dry fruits of the Pythagorean tree'। যা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন Sherry Turkle তাঁর *Psychoanalytic politics* গ্রন্থে (প্রকাশক, Burnett, London; 1979 Pg. 237)।

পুনরাবৃত্তি

শম্ভু রক্ষিত

চারপাশের রিক্ত হৃদয় চিৎকার করে এসে দাঁড়াল গোচারণ ভূমির ওপরে।
প্রত্যেকবার আমার পাশ বেয়ে প্রদর্শিত মুখ
অভিশপ্তের উন্মুক্ত প্রার্থনার মতো
বিবস্বানের নির্দেশে স্বতন্ত্রভূমি তৈরি করল।

এক শ্বেত কুষ্ঠরোগিনী শতচ্ছিন্ন পোশাকের তলায়
হাত লুকিয়ে আমার শরীরে উচ্ছ্বাসের সংলাপ ঢালছিল।
তার বৈশিষ্ট্য সমর্পিত, পরিপূর্ণ
এবং তার প্রশ্নকটি আমার কাঁধের ওপর হয়ে দিনের ঊষায় জঠরাগ্নি নামাচ্ছে।

পিতলের বাতিদানের চিহ্ন ধরে এসে গান গেয়ে ক্লোম জাগল।
মিশ্রিত ধ্বনি অবলীলাক্রমে এক-একজন নৃত্যাঙ্গনা নোংরা আর উকুনভর্তি
নারীর মেঘরেশম শাড়ির ছোট ছোট ঘোড়াদের ওপর পশুর গলা বানিয়ে ফেলল।
সবই বেসুরো। অপরিণত। অবশ্য স্বচ্ছন্দ।

তিনজন আবকার আমার ঘরের মেঝেয় বসে হিজিবিজি সব বানাচ্ছে।
সামান্য আগে জানালাম। আমি তখনো আমার হয়ে উঠিনি। নির্দিষ্ট।
মৃতদের বিস্ময়কর শক্তি দেখে আমার ভীষণ রোষ হল।
আমি রাসায়নিক তত্ত্বর কাছে অনেকদিন কাউকে গলে যেতে দেখলাম না।
কোন মানুষ ছায়া হতে পরিবর্তন এল।
আপিঙ্গল বাতাসকে আমি কি করে সম্বোধন করব?
আমার আপশোস থাকল। সুখের ক্ষীণ শব্দের মধ্যে
আমার চাবুক। এবং চিরন্তন যেন
জাহানের চিত্রের ঘাড় বেঁকিয়ে রূপান্তরিত। আধুনিক।

অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সহগামিনীরা বেগবান জলোচ্ছ্বাসের মতো
এগিয়ে এল। ফুলে ফুলে হেলে দুলে নাচতে লাগল। আর প্রত্নতত্ত্ব ভূতত্ত্ব ও
আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের শাসন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।
আমার শূন্য যন্ত্রণা।
আমার অজ্ঞেয় হৃদয়ে ধারণার আইনঘড়ি। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
তাদের নিরুদ্দেশ যাত্রায় ষাঁড়ের ও মেষশিশুর অবসর।

সবাই নির্ব্যাজ নিকুঞ্জের বাইরে এসে পড়ল।
দেখল মাটির ওপর বিচ্ছিন্নতার ভেতর আমি পরিপূর্ণতা জুড়ে রয়েছি।
আমার অভিসন্তাপ মুখ দেখা যায়নি।
আমার উদ্ধত মুখ শুদ্ধ। উন্মুক্ত। অভ্যর্থিত।

অন্য আলো

আনন্দ ঘোষ হাজরা

কতদিন থাকে সে আলোক?

যে আলোক নেমে আসে
বাঁকানো চাঁদের শিং ভেঙে
অথবা সে অবিশ্রাম স্বর্গীয় শশ্রুর রূপে নামে
চৌপাহাড়ি জঙ্গলের ধারে—
সেইখানে রাত্রি জুড়ে বছর বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছ
রহস্য ছবির মতো তুমি......
কতদিন থাকে সে আলোক?

ধূলিকণা মুছে দেয় সে আলোর রেখা
মুছে দেয় প্রবল বাতাস
তবু পড়ে থাকে গূঢ় আরিজোনা-ক্ষত।

ই-মেলে সংবাদ এল
তোমার পুত্রের বিয়ে হল
দ্বিতীয় পুত্রের......

বৃত্তি

সুদেব বক্সী

হেঁটে হেঁটে যাই
ভরা পেটে যাই
কথা সম্বিৎ জগতে

প্রহরে প্রহরে
সে কী ধোঁয়া ওড়ে
খিদেও পারে না এগোতে
না এগোলে খিদে
তখনই সুবিধে
ভীরু দু'পা থুই বরফে

যদি খিদে পায়
অন্নের প্রায়
কথাগুলি রাখি হরফে!

আসি

সতীনাথ বৈরাগ্য

বাবার আজ বিকেলে ফিরে আসার কথা ছিল ব'লে
মা, ঠাকুমার কথামত বাবার প্রিয় তিলের নাড়ু
করেছিল সকালে।

এখন বিকেল।
কয়েকজন লোক—বাবার কাঠুরে সঙ্গী,
বাবার দেহটা ধরাধরি করে এনে
উঠোনে শুইয়ে দিয়ে বলল—
বাঘে খেয়েছে।

পাথরের বুড়ি আমার ঠাকুমা!
তার ঘোলাটে চোখে জল নেই।
মার বনরঙা শাড়িতে লেগে যাচ্ছে বাবার রক্ত।
বাঘের হিংসাকে ধুয়ে মুছে দিচ্ছে তার
অজস্র অশ্রুবিন্দু।

বাবার পাশে ফেলে রাখা কুড়ুলটা তুলে নিই
বনে যাব।
বাবার ঘাতক বাঘ, তোকে আমি নাও পেরে পারি
কাঠ পাব।

ঠাকুমা, আসছি.....
আসি, মা।

ধ্বনি

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

তুমি শব্দময়
তুমি আমার কাঁধের শব্দে
হাত রেখেছিলে
আমার হাতের শব্দে
তোমার আঙুলগুলো
কী যে একলা হয়ে উঠেছিল
কাকে বলব
আমি আজ মাছির সংসারে বসে আছি
ধ্বনির সংসারে
যদি কালো ফুল ফুটে উঠল
কে শুনিল রাজেশ্বরী
কমল মুকুল দল
সেই শব্দে
কোন গঙ্গাজলে

অপার

সন্দীপন চক্রবর্তী

হাওয়া জমে জমে পাথর হচ্ছে
রোদ জমে জমে মাখন

ভয় জমে জমে মাথার ভিতর
নড়বড়ে এক সাঁকো...

কিছুতে পেরোতে পারছি না; জানি
পা ফস্কে গেলে মৃত্যু

রাগ জমে জমে শিরায় ছুটছে
চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ

ছাই হয়ে গেছে মাইল মাইল...
তুমি সব লিখে রাখো

হাওয়া জমে জমে পাথর হচ্ছে
রোদ জমে জমে মাখন

খেলা

শ্রীজাত

আর কী খেলব আমি, আমাকে শেখাও কোনও নতুন খেলা
তুমি তো দূরেই থাকো, এখানে পড়েও আসে বিকেলবেলা
জামায় দাগের মতো, যেতেও চায় না আর, অলস যে রোদ...
কোথাও যাবার নেই। তোমার ডানায় কাজ...বাসায় ফেরো
আমার লাগে না ভাল আমার লাগে না ভাল লাগে না ভাল
ছায়ায় কাটাই ছায়া...হেলায় কাটায় পাশ একেকটা লোক
আর কী বুঝব আমি, আমাকে বোঝাও কোনও জটিল ধাঁধা
তুমি তো দূরেই থাকো, এখানে পায়ের নীচে কাঁকর, কাদা...
আবার সন্ধে নামে। কেন যে ফুরিয়ে আসে বিকেলবেলা
আর কী খেলব আমি, আমাকে শেখাও কোনও নতুন খেলা

আর. এস চতুর্দশপদী : ১৮

জয়দেব বসু

মশলা বাটতে-বাটতে আমার
এত বছর কাটতে, হঠাৎ
স্বপ্নে এলেন উনি—
বললেন, 'ওরে ভুনি,

তোকে কত ভালই যে বাসতাম;
না বুঝে তুই রাস্তায়
বেরিয়ে গেলি মাগী! আজও
তোর লাগি রাত জাগি।'

চমকে উঠি...ইশ্,
লাগে উনিশশো তেত্রিশ!
দেখি : দর্জিপাড়ার সেথো
ওর্ায় ডেকে নিচ্চে ভেতর।

কিন্তু, কোথায় গেল সে,
আমায় বার করল যে!

আমার সময়ের কথা

ননীমাধব চৌধুরী
সম্পাদনা ও টীকা—সুমিতা চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বড় ম্যাথেম্যাটিসিয়ান, বড় ফিজিসিস্ট, আবার কাব্যে, সংগীতে রুচিবান, হাসা-কৌতুকের রসে উচ্ছল, গল্প-গুজবে অপরিমিত উৎসাহী, আসরজমানো মজলিশি আলাপে অদ্বিতীয়। যেমন নিবিষ্টচিত্তে মোটা খাতায় পাতার পর পাতা equation কষতে থাকে আবার আমার মেয়ের এসরাজ নিয়ে একা বসে তেমনই নিবিষ্টচিত্তে বাজাতে লাগল স্বচ্ছন্দ গতিতে—দিকে দিকে বিচরণশীল বৃহৎ, উদার মন সত্যেন্দ্রনাথের। নানা রকম চরিত্রের, নানা রকম শখের, নানা রকম ভাবনার মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারতেন তিনি। মানুষের কথা ও ব্যবহারের পশ্চাতে যে মন কাজ করে সেই মনকে চিনে নেবার সহজ দক্ষতা ছিল তাঁর। কারও মনের মধ্যে ভাল জিনিস আছে দেখতে পেলে বাক্য ও ব্যবহারের ত্রুটি উপেক্ষা করতে পারতেন। তাই নানা মতের নানা পথের লোক ভিড় করত তাঁর চারপাশে। সহজ প্রীতিতে মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর।

বাংলাসাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। বাংলাভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের জন্য 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাকে উচ্চশিক্ষার, বিজ্ঞানশিক্ষার বাহন করবার জন্য বহু প্রচারকার্য করেছেন। বিরল অবসরে বাংলা প্রবন্ধও লিখেছেন। কিশোর বয়সে ও প্রথম যৌবনে বাংলার বিপ্লবীদলের সংস্রবে এসেছিলেন। অনেক বিপ্লবী নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ছিল তাঁর। শুধু সত্যেন্দ্রনাথ কেন তাঁর নাম করা সতীর্থ ও বন্ধুগণের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্বন্ধে একথা বলা যায়। বয়স অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের সাধনা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি কৈশোরের সহানুভূতি মুছে ফেলে নাই।

সবুজপত্রের সূত্রে আলাপ আরম্ভ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই আলাপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কোঠায় পৌঁছেছে। ঠিক এমনটি আর কারও বেলায় হয়নি। সবুজপত্রের সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল কিন্তু মেলামেশা থাকলেও তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়নি। সত্যেন্দ্রনাথের warm heartedness, large heartedness, wide sympathy এবং balance যার-তার মধ্যে দেখা যায় না।

আমার সাহিত্যকর্মে সত্যেন্দ্রনাথ বরাবর আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "জ্ঞান বিজ্ঞান" পত্রিকায় আমার অনেকগুলি প্রবন্ধ ("ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়" সিরিজ) প্রকাশিত হয়েছে। আমার কয়েকটি গল্প, বিশেষ করে দেশবিভাগের পরে লিখিত কয়েকটি গল্প তিনি পড়েছেন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আশ্রয় করে যে উপন্যাস সিরিজ লিখেছি তার কিছু কিছু পড়েছেন। আমার এই উদ্যমের তিনি উৎসাহী সমর্থক।

বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ সভাসমিতিতে রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেননি কখনও। দেশ স্বাধীন হবার পরেও। ঘরোয়া আলোচনার মধ্যে সরকারি নীতির সমালোচনা উঠলে সাধারণত বিতর্কে যোগ দেন না। এ সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত মত কোন দিকে বুঝে নেওয়া যায়। ১৯৪৯ থেকে কংগ্রেসি সরকারের মানে পণ্ডিত নেহরুর তিব্বত নীতির সমালোচনা করে কাগজে প্রবন্ধ লিখেছি। কয়েকমাস আগে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। দেখলাম ডা. রাম মনোহর লোহিয়া এবং আরেকজন অবাঙালি ভদ্রলোক এসেছেন। নেফায় চীন আক্রমণের কথা এবং নেহরুজির তিব্বত নীতির কথা উঠল। সত্যেন্দ্রনাথকে দেখাব বলে ১৯৫০ সনে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশিত তিব্বত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের কপি নিয়ে গিয়েছিলাম পকেটে করে। সেটি বের করে ডা. লোহিয়াকে পড়তে দিয়ে বললাম, look at the date of publication and the lines marked with red pencil. লাইনগুলিতে নেহরুজির চীন-তিব্বত নীতি রীতির নিন্দা করা হয়েছিল, এরপর দেখা যাবে তিব্বতে কায়েম হয়ে বসবার পরে চীন নেফা এবং আপার আসাম গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসবে।

ডা. লোহিয়া প্রবন্ধটি পড়লেন এবং চিহ্নিত লাইনগুলি জোরে পড়লেন। সত্যেন্দ্রনাথ হেসে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, তুই যে একজন Prophet জানতাম না। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম, চেরাগের নীচেই যে আঁধার। তিনি উচ্চহাস্য করলেন। ডা. লোহিয়া ও তাঁর সঙ্গী চলে গেলে প্রবন্ধটি তিনি মন দিয়ে পড়লেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা থেকে ফিরে বালিগঞ্জ সার্কুলার এবং নিউ আলিপুরের ভাড়া বাড়িতে কিছুকাল কাটিয়ে অবশেষে ঈশ্বরী মিল লেনের পৈতৃক গৃহে পাকা হয়ে বসেছেন। তাঁর বাড়ি বালিগঞ্জ থেকে একটু দূরপাল্লার পথ, অতুলবাবুর মৃত্যুর পরে এই পথ পাড়ি দিয়ে আড্ডা দিতে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত কিছু বেড়েছে। একদিন বললেন, যেতে আসতে কষ্ট হয় একটু না? বললাম, কী করি পনেরো কুড়ি দিন দেখা না হলে বিরহব্যথা জেগে ওঠে প্রাণে। হাসলেন আমার কথা শুনে। একদিন ফোনে ডাকতে রিসিভার ধরে বললেন, হ্যালো। বললাম, নবীবাবু ফোন করছেন, তাঁর কাজ হয়ে গেছে এবার ছেড়ে দিচ্ছে না, বিস্ময়ের স্বরে বললেন কী ব্যাপার? কী খবর তোর? বললাম, অনেক দিন শুনিনি, তাই গলার স্বর শোনবার জন্য ফোনে ডাকলাম। উচ্চহাস্য করে বললেন, চলে আয় এখানে।

অতুলবাবুর কথা শুনলে মনে হত বন্ধ জানালা খুলে গিয়ে খোলা হাওয়া লাগল, সত্যেন্দ্রনাথের হাসি দেখলে, হাসি শুনলে মনে হত মন ভাল হয়ে গেল। সম্প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে উৎসব হয়ে গেল কলকাতায় শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, দেশের বিভিন্ন স্তরের লোকের বিশেষ করে ছাত্র এবং যুবসমাজের অনেকের মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। সবুজপত্রের মজলিশে প্রমথ চৌধুরীমশায়ের প্রবন্ধ ও গল্প পড়া শুনেছি, রবীন্দ্রনাথের গান, নাটক করা এবং গল্প শুনেছি। কিরণশঙ্কর রায়ের গল্পপড়া শুনেছি। যতদিন কলেজে চাকুরি করতেন মজলিশে নিয়মিত অগ্র আসনে কিরণশঙ্কর, রাজনীতিতে যোগ দেবার পরে কম আসতেন। বেশ ভাল লাগত তাঁকে। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় অতুলবাবুর বাড়িতে তাঁর এক ছেলের বিয়ের সময়। মানিক গকুর গ্রাম্য ভাষায় লিখিত গল্প করতেন সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য। তাঁর কয়েকটি গল্প সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। আরও অনেকের কথা ভুলে গিয়েছি।

সত্যেন্দ্রনাথ এবং অতুলবাবুর কথা বলতে গিয়ে সময়ের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে এসেছি। আবার ফিরে যাওয়া যাক কলকাতা বাসের প্রথম কয়েকটি বৎসরের কথায়। এবার পড়াশোনার কথা কিছু বলব। এই পড়ার নেশা, জানবার নেশা খানিকটা পঙ্গুত্ব এনে দিয়েছে বৈষয়িক জীবনের পথে। তার ফলে অনেকদিকে অসুবিধা ঘটেছে, অসুবিধার ফল ভোগও করেছি।

সবুজপত্রে ফরাসি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকলে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে স্প্যানিশ, রাশিয়ান, জার্মান এবং ইতালিয়ান ভাষা শিখতে আরম্ভ করেছিলাম। হিন্দি এবং উর্দুও। এক স্প্যানিশ ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষাশিক্ষায় অগ্রসর হতে পারিনি। একটা কারণ ছিল বইয়ের অভাব। স্প্যানিশ অক্ষর গ্রামার এবং কয়েকখানি সাহিত্যের বই প্রমথ চৌধুরীমশায়ের কাছে পেয়েছিলাম। সেই বইখানায় বেনাভেন্তের কয়েকটি নাটিকার সঙ্কলন ছিল। দুটি নাটিকাও বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম।

ভাষাশিক্ষার উৎসাহ একটু কমে আসতে দেখলাম ইংরাজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেছি বটে কিন্তু জানি না কিছুই। দেশের প্রাচীন সাহিত্যের, ইতিহাসের কিছু জানি না। এই বিরাট দেশের বিরাট জনসংখ্যার পরিচয়, ধর্মের ইতিহাস, প্রতিবেশী দেশগুলির ইতিহাস, লোকপরিচয় কিছু জানি না। জানি শুধু ইংরাজি সাহিত্যের ডজন তিন লোকের নাম এবং তাঁদের রচনার অতি সামান্য অংশমাত্র।

অনেকটা এলোমেলোভাবে পড়াশোনা আরম্ভ হল। দূর অতীতের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে বসলে মনে হয় গোড়াতে যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে সুপরিকল্পিত প্ল্যান করে পড়াশোনা আরম্ভ করতাম হয়ত একটা চিহ্ন রেখে যাওয়া সম্ভব হত। আমার কোনও প্ল্যান ছিল না। নিজের বিরাট অজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। যেন কিছু করে যাবার কথা মনেই হয়নি, মনে হয়েছিল শুধু নিজের মনে জ্ঞানের আলোক জ্বালতে হবে। তাই আরম্ভ করলাম geology এবং geography নিয়ে।

এখন কথাটা ভাবলে হাসি পায় কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, সেকালে পাঠ্য বিষয়ের choice খানিকটা বিঘ্নিত হয়েছিল বই পাবার সুবিধার দ্বারা। যেসব বইয়ের প্রয়োজন, প্রমথ চৌধুরীমশায়ের লাইব্রেরিতে সেসব বই ছিল না। দু'জন নতুন বই সরবরাহক হাতের কাছে ছিলেন। দু জনেই প্রতিবেশী এবং ছাত্র আমলের বন্ধু। একজন ভাই প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দ্বিতীয় জন তারকচন্দ্র দাস। উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। উভয়েই Ancient Indian History and culture বিভাগের ছাত্র কিন্তু পাঠ্যবিষয় আলাদা। প্রবোধ নাম করেছেন বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য সম্বন্ধে (বিশেষ করে চীনা ভাষায়) গবেষণা করে। তারক কাজ করেছেন cultural anthropology এবং tribes নিয়ে। যেসব বই এঁদের দু'জনের বাড়িতে দেখতে পেতাম তার মধ্যে পছন্দমতো দু'চারখানা বেছে নিয়ে পড়তে লাগলাম। আমার চাহিদা মতো

বই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে দিয়েছেন। সেকালের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরি সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরি থেকে আনিয়েছি। দেশের ধর্ম সাহিত্য এবং লোকপরিচয়, লোক-ধর্মচর্চায় আমার সব চাইতে বেশি সময় ও উৎসাহ নিয়েছে। অনুসন্ধানক্ষেত্রের প্রসার ক্রমে বেড়ে গিয়েছে। দেশের সীমা অতিক্রম করে প্রতিবেশী এবং দূরবর্তী দেশগুলির প্রাচীন ইতিহাসের খোঁজ নিতে হয়েছে। সে প্রাচীন ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, সভ্যতা পত্তনের, জাতি সংমিশ্রণের, ধর্ম ও সংস্কৃতির, প্রতিবেশীর সঙ্গে সংযোগের, আদানপ্রদানের ইতিহাসও বটে। দেশের লোকপরিচয়ের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পণ্ডিতদের লেখা বই পড়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান বিভাগে গিয়ে সমবয়সি অধ্যাপকদের কাছে anthropomatric formulaae সম্বন্ধে পাঠও নিতে হয়েছে। লোকধর্মের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্রতকথা ও পাঁচালি থেকে উপপুরাণ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং বেদ পর্যন্ত ছুটতে হয়েছে আবার দেশের সব প্রদেশের পুরনো জেলা গেজেটিয়ারগুলো আটকাতে হয়েছে। সেকালের ইংরাজ সিভিলিয়ানদের সংকলিত এই পুরনো গেজেটিয়ারগুলি অপূর্ব জিনিস। খুঁজতে খুঁজতে ঝাঁপি দু'চারটে যে না বেরোয় তা নয় তবে মণিমুক্তা, সোনাদানাও অনেক মেলে।

আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতিসংমিশ্রণ সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় এবং আমেরিকান পণ্ডিতগণ পিঠ-চাপড়ানোর সুরে যেসব কথা বলে গেছেন এবং দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে সাড়ে পনেরো আনা যা মেনে নিয়েছেন তা-ই ঠিক কি না জানবার ইচ্ছা মনে রেখে যাত্রা আরম্ভ করেছিলাম। গোড়ায় বুঝতে পারিনি এ যাত্রাপথ সোজা সড়ক ধরে নয়, অনেক বনবাদাড় ভাঙতে হবে, খানাডোবা পেরতে হবে, চড়াই উতরাই ডিঙোতে হবে। পণ্ডিত বলে নাম করবার ইচ্ছা নয়, আমার জাতি-সংস্কৃতি-ধর্মসাধনা সম্বন্ধে বিদেশি পণ্ডিতগণের এক দলের মতামতের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করবার দুর্বিনীত অভিপ্রায় ছিল আমার দুরন্ত পরিশ্রমের একমাত্র প্রেরণা। যে পন্থা আমি আশ্রয় করেছিলাম সেটা নামখ্যাতি অর্জনের পন্থা নয় এ জ্ঞান জন্মেছে এক সময়ে, জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করলে, মেকি ও ফাঁকির আবরণ অপসারিত করবার চেষ্টা করলে প্রশংসা সুলভ না হয়ে দুর্লভ হওয়াই স্বাভাবিক এ জ্ঞানও জন্মেছে এক সময়ে। যাক এসব কথা।

এত পরিশ্রমের বিষফল প্রসব করেছে, পরে সে কথা বলব। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলছি। কী উদ্দেশ্য নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে পণ্ডিতি গবেষণা করেছি ওপরে বলেছি। ভাষা একটু বদলে বলা যায় যে এই উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বরূপ জানবার সাধনা। জওহরলাল নেহরুর বিখ্যাত গ্রন্থ Discovery of India। নাম একটু পরিবর্তন করে বলা যায় Endeavoure to discover India আমার সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্যও তাই endeavoure to discover India।

পণ্ডিতি পড়াশোনা আরম্ভ হয়েছিল যৌবনের গোড়ার দিকে, বোধহয় ১৯২৫/২৬ সনে। খেয়াল করিনি কবে যৌবন চলে গেছে, প্রৌঢ়ত্বের মাঝপথে এসে পড়েছি। যখন ক্লান্তি বোধ করেছি গবেষণামূলক পড়া ও লেখাতে, দু' একটা গল্প লেখবার চেষ্টা করেছি একঘেয়েমি কাটাবার জন্য। সে আমলের কয়েকটা গল্প বন্ধু শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত 'ছোট গল্প' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় বের হত। একটি গল্প স্বল্পায়ু 'উদয়ন' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(১০)

ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ফ্রান্স থেকে ফিরলে তাঁর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়ি আমাদের অন্যতম আড্ডার জায়গা হয়েছিল আগে বলেছি। এই বাড়িতে ইয়োরোপে যেসকল বাঙালি পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের কেউ কেউ আসতেন। এঁদের মধ্যে ড. বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় ড. সুবোধ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। প্রবোধ উৎসাহী পণ্ডিত। ফেরবার কিছুদিন পরে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে এক ইন্দো-লাতিন সোসাইটি গড়ে তুললেন। এঁরা ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী এবং চারপাঁচজন ফ্রান্স-ফেরত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কক্ষে সোসাইটির অধিবেশন। সোসাইটির সম্পাদক প্রবোধ এবং নগেন্দ্রচন্দ্র। ইনি চন্দননগরবাসী, ভাল ফরাসি জানতেন, ফরাসি ট্রেড কন্সালের অফিসে কাজ করতেন এবং সম্ভবত তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসি ভাষা শেখাবার ক্লাসও নিতেন। সাপ্তাহিক সভায় ফরাসি ভাষায় বক্তৃতা হত এবং খানিকটা ফরাসিতে খানিকটা ইংরাজিতে আলোচনা হত। ট্রেড কন্সাল অফিসের ফরাসি কর্মচারিরা মাঝে মাঝে কলকাতায় আগন্তুক ফরাসি ভদ্রলোকদের বক্তৃতা দেবার জন্য নিয়ে আসতেন। গোড়া থেকে আমিও এ সভার সভ্য ছিলাম এবং এক সভায় ফরাসি ভাষায় লিখিত বাংলাসাহিত্যের ওপর ফরাসি প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও পড়েছিলাম। যতদূর মনে আছে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, ড. সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ড. বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, ড. সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ড. কালিদাস নাগ ও

হারীতকৃষ্ণ দেব, ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (প্রেসিডেন্সি কলেজ), ড. নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) (পরে Director, Archaeological Survey) প্রভৃতি এ সভায় আসতেন। সে আমলের ছাত্র হুমায়ুন কবির আসতেন। হিরণ্ময় ঘোষাল নামে প্রেসিডেন্সির একটি ছাত্র আসতেন। এঁর সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে ইনি পোলান্ডের ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিজয়ী জার্মানদের আদেশে তাঁকে পোলান্ড ছাড়তে হয়। দেশে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও কাজের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়ে দিল্লি চলে যান। মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যখন মস্কোতে ভারতীয় এমবেসেডর হয়ে যান তিনি Cultural Attache হিসাবে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এর পরের কোনও খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। এর কয়েকখানা বাংলা বই আছে, একখানার নাম "মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়"। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনিতে পূর্ণ এই বইখানি সুপাঠ্য।

এই সভায় আর একটি ভদ্রলোককে প্রথমদিন দেখে চিনতে পারিনি। পরে আলাপ হয়েছিল, ইনি ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার মধ্যমভ্রাতার কালাজ্বরের চিকিৎসা প্রসঙ্গে যাঁর নাম করেছি। ইনি তখন আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্যাথোলজির প্রফেসর। কয়েক বছর ফ্রান্সে ছিলেন গবেষণা করবার জন্য। শেষের দিকে ডাক্তারি করা প্রায় ছেড়ে দিয়ে গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। একদিন নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গবেষণার কাহিনি শুনেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে গবেষণার বিষয়বস্তু সম্ভবত Pathology নয়, Supramental ব্যাপার ট্যাপার কিছু।

Indo-Latin-Society-র সভায় Prof. Tucci একদিন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। Prof. Sylvain-levy কলকাতায় এলে তাঁকে প্রবোধ সোসাইটির সভায় এনেছিলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। সেদিন অনেক লোক হয়েছিল সভায়। চন্দননগরের ফরাসি Administrator প্রো: লেভির সম্বর্ধনা উপলক্ষে সোসাইটির সভ্যদের চন্দননগরে তাঁর ভবনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমরাও গিয়েছিলাম। ফ্রান্স ফেরত দু'চার জন সভ্য এই উপলক্ষে চন্দননগরে গিয়ে ফরাসি পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করেছিলেন কিঞ্চিত অধিক মাত্রায়। অর্থাৎ তাঁদের বেএক্তিয়ার হয়ে পড়বার কথা একটু মনে পড়ছে।

সোসাইটি বছর দু'তিন জীবিত ছিল। প্রবোধ ড. কালিদাস নাগের Great India Society-র কাজে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়াতে ক্ষীণ-প্রায় ইন্দো-লাতিন সোসাইটির মৃত্যু ত্বরান্বিত হল। Great India Society-র কাজে সহানুভূতি থাকলেও তাতে যোগ দিই নাই। সে অধিকারও বোধহয় ছিল না।

কলকাতায় বসবাসকালের অন্যান্য স্মৃতি

(১১)

যে সময়ের কথা বলছি সেটা গান্ধীজির সব চাইতে বড় কীর্তি অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই প্রতিক্রিয়ার যুগ চলেছিল কয়েকবছর ধরে আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে গান্ধীজি আবার সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে স্বরাজি Politics-এর উদয় হল। কংগ্রেস গান্ধীজির হাত থেকে চলে গেল চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু প্রমুখের হাতে। organised disciplined oppsition-এর আবির্ভাব হল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হল গরম গরম বুলিওয়ালা কিন্তু আসলে আপোকার আমলের liberal politics-এ বিশ্বাসী স্বরাজি এবং গান্ধী-অসহযোগ নীতির বয়কটে বিশ্বাসী No-changer দলের মধ্যে। স্বরাজি দলের হাতে কংগ্রেসকে ছেড়ে দেয়াকে এঁরা গান্ধিজীর Surrender বলে সমালোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু Surrender-এর মূল্য বাবদ তিলক স্বরাজ ফান্ডের যে মোটা টাকাটা হাতে পেলেন তাই নিয়ে গ্রাম সংস্কার ইত্যাদি ব্যাপারে হাত লাগালেন নিজের কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে। কংগ্রেসের বাইরেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রথমত গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের বড় স্তম্ভে অর্থাৎ কংগ্রেসি ও খিলাফত আন্দোলনের সংযোগে ফাটল দেখা দিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গেল। আরম্ভ হল প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। একদিকে শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলন আরম্ভ হল, অন্যদিকে পালটা তবলিব, তাঞ্জিম আন্দোলনে আরম্ভ হয়। Hindu Nationalism, Hindu reorganisation-এর শ্লোগান নিয়ে হিন্দু মহাসভা আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ্লবীরা হাত গুটিয়ে বসেছিলেন গান্ধীজির আবেদনে। তাঁরা নতুন তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। আবার বোমা দেখা দিল।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটেছিল তার প্রভাব ভারতে এসে পৌঁছল। কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হল কানপুরের সভায়।

অসহযোগ আন্দোলন ছিল সত্যিকার বিপ্লবাত্মক আন্দোলন। Aimed revolt নয়, mass revolt। এই revolt এর গায়ে অহিংসার ছাপ দেগে দিয়েছিলেন

গান্ধীজি। তাঁর পরিকল্পিত গণবিপ্লব যখন মূর্ত হয়ে উঠল, তার প্রলয়ঙ্কর-সম্ভাবনাপূর্ণ চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। মনে পড়ছে দু'চারজন ইংরেজ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি বলেছেন the revolt was within an inch of success। এ মন্তব্য তৎকালীন ভারতীয় জননেতাদের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতার ফল। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার মতো সাহস, শিক্ষা, মনোভাব তাঁদের ছিল না। success থেকে এই এক ইঞ্চি দূরত্ব কখনও ঘুচত না। অসহযোগ আন্দোলনে ঘোচেনি, আইন অমান্য আন্দোলনে ঘোচেনি, বিয়াল্লিশের বিপ্লবে ঘোচেনি।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় পড়ে পড়ে মার খাওয়া দেখে যাঁরা প্রিয়মান হয়েছিলেন স্বরাজদলের stage herdies তাঁদের প্রিয়মানতা এবং মুহ্যমানতা বোধহয় একটু ঘোচাতে পেরেছিল। ভোট কড়াকড়ির ব্যাপারে ঘুষ এবং অন্যবিধ দুর্নীতির বিষ তখন থেকেই প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসি politics-এ ঢুকল।

(১২)

এই সময়ের কাছাকাছি দুটো জায়গায় বেড়াবার স্মৃতি মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট রয়েছে।

আগে দার্জিলিংয়ের কথা বলেছি। দার্জিলিং এর আগেও একবার গিয়েছি, দৃশ্যের নতুনত্বের আকর্ষণ ছিল না, আকর্ষণ ছিল অন্য রকমের। পূজার সিজনে আমার মেজভাইয়ের সঙ্গে দার্জিলিং গেলাম। আমি উঠেছিলাম স্যানাটোরিয়ামে। আমার মেজভাই চুনি উঠেছিল জ্বলাপাহাড়ে একটি বাড়িতে কুমুদনাথ চৌধুরীর পরিবারের অতিথি হয়ে। সস্ত্রীক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন কেরোলিন ভিলা নামে একটি হোটেলে এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিয়নাথ চৌধুরী সপরিবারে ছিলেন ম্যালের কাছে তার উইসওয়াস নামক বাড়িতে। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র একনকার জেনারেল জে. এন চৌধুরী, তখন কিশোরবয়স্ক বালক।

সকালে চা খেয়ে কেরোলাইন ভিলায় হানা দিতাম। সেখানে আরেক দফা চা খাবার পেতাম ন' জ্যাঠাইমা ইন্দিরা দেবীর কাছে। কোনও দিন গল্পগুজব চলত, কোনও দিন বেরিয়ে পড়তাম হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্য। মাঝে মাঝে খাবার নিমন্ত্রণ পেতাম জ্বলাপাহাড়ের বাড়িতে। অনেক ছেলেমেয়ে জুটত ও বাড়িতে।

সে-সময় যেসব ছেলেকে কিশোর বয়সি বা আরও ছোট দেখেছি তাদের মধ্যে পরে তিনজন হয়েছিল বৈমানিক। মি. পি কে মজুমদারের ছেলে ডি.মজুমদার ভারতীয় বিমান বাহিনীতে নামকরা বৈমানিক ace pilot হয়েছিলেন, বিমানদুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। অমিয়নাথ চৌধুরীর মেজছেলে হেমনাথ চৌধুরী ভারতীয় বিমানবাহিনীতে squardon commandor হয়েছিলেন। ব্যারাকপুরে এক বিমানদুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। কুমুদনাথ চৌধুরীর ছোট ছেলে কালিপ্রসাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের রয়েল এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছিলেন। জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের ওপর বোমা ফেলে ফেরবার সময় জর্মনফাইটার প্লেন কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তিনি নিহত হন। আর অমিয়নাথ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র জয়ন্ত হয়েছেন ভারতবর্ষের Chief of the army staff। উইসওয়াসের ছেলেমেয়েরা আসত। তাদের মেসো ওসেসপয়েন্টের মি. পি কে মজুমদারের (ব্যারিস্টার) ছেলেমেয়েরা আসত। সঙ্গী বা আড্ডার অভাব হত না। সে সময় স্যানাটোরিয়ামে ড. নরেশ সেনগুপ্ত ছিলেন। ড. সেনগুপ্ত আমার অফিসের বন্ধু কুঞ্জবিহারী রায়ের সহপাঠী শুনেছিলাম। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে গিয়ে আলাপ করতাম। স্যানাটোরিয়ামে এক ভদ্রলোকের সহযাত্রী হয়ে একদিন শেষরাত্রে উঠে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখে এলাম। তখন অক্টোবরের শেষ দিক। সুতরাং শীতের প্রকোপ প্রচণ্ড। অন্ধকারের মধ্যে শেষখাড়া পথটুকু উঠতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। গিয়েছিলাম ডাঙ্গিতে। টাইগার হিল সম্পর্কে তিনটি জিনিসের কথা মনে আছে : শীত, সূর্যোদয় এবং আগত একপাল ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষের আধা-অন্ধকারে মাতলামি ও জড়াজড়ি।

টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখবার জন্য নানা দেশ থেকে লোক আসে। এই অপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনা অনেকে করেছেন। হিমালয়ের চিরতুষারমণ্ডিত শিখরগুলি চোখের সামনে উদঘাটিত হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার অনেকখানি চোখে পড়ে, পর্বতগাত্রের যে অংশে তুষার-আচ্ছাদন নাই তাও দেখা যায়। এভারেস্টের চূড়াও দেখা যায়। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে থেকে রঙের খেলা আরম্ভ হয় শুধু চিরতুষারবৃত শিখরগুলিতে নয়, সমস্ত দৃষ্টিপথ জুড়ে। কয়েক মিনিট স্থায়ী সূর্যোদয়ের দৃশ্যটি যেন লোকাতীত সুষমামাখা একটি লিরিক, ভাষায় যার সৌন্দর্য প্রকাশের অতীত।

এবারকার দার্জিলিং বেড়ানোর কাহিনির উল্লেখ করবার প্রধান উদ্দেশ্য অতীত দিনের একটি আনন্দময় স্মৃতি স্মরণ করা। সে-আনন্দের স্মৃতি হচ্ছে অমিয়নাথ চৌধুরীর গৃহে বিজয়া সম্মিলনী। দু'ভাই প্রমথ চৌধুরী ও অমিয় চৌধুরী, তিন বউ, রাধারানি দেবী, ইন্দিরা দেবী ও প্রমীলা দেবী, দু' বাড়ির ছেলেমেয়েরা এবং এদের অনেক আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। এঁদের পরিচিত বাঙালি অবাঙালি, অনেকে এসেছিলেন। প্রচুর মিষ্টির সরবরাহ ছিল, গান, গল্প

ছিল, উজ্জ্বল আলো ফুলের সমারোহ ছিল, সাজপোশাকের জৌলুস, নমস্কার, প্রণাম, কোলাকুলি সব কিছু ছিল, মায় সিল্কির সরবৎ পর্যন্ত। সেই কম বয়সে ভাল লেগেছিল সমস্ত অনুষ্ঠানটি। বোধহয় গৃহকর্ত্রী মিলিকাকিমার (মিসেস এ এল চৌধুরী) সস্নেহ ব্যবহারের জন্য অত ভাল লেগেছিল।

এরপর রাঁচি বেড়াবার কথা। একবার বড় দিনের সময় মোরাবাদীর "সত্যধাম" গৃহে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর অতিথি হয়ে কটা দিন কাটিয়েছিলাম। ইন্দিরার মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখন ওই বাড়িতে ছিলেন। পাশের একটি গৃহে সেবার সস্তবত আর্টিস্ট যামিনী গাঙ্গুলি ছিলেন। আর একটি বাড়িতে থাকতেন আশুতোষ চৌধুরীর কন্যা অশোকা দেবী এবং জামাতা উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী। উপেন্দ্রবাবু ছিলেন জিয়োলজিস্ট, সিলেটের লোক। রানিগঞ্জের সানি পার্কের বাড়ি ভাড়া দিয়ে উপেন্দ্রবাবু রাঁচির স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। আগে থাকতে এঁর সঙ্গে আলাপ ছিল। আড্ডা দেবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যেতাম। এর ছোট ছেলে এস কে চৌধুরী ভারত সরকারের Diplomatic Service-নিযুক্ত। বর্তমানে (১৯৬৪) ঢাকায় ডেপুটি হাইকমিশনার।

রাঁচির কথায় এক সহৃদয় ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। ইনি মার্টিন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। রাঁচি যাবার সময় গাড়িতে এঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে হাজারিবাগ যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি বললেন তাঁর কোম্পানি হাজারিবাগে কোর্ট বিল্ডিং তৈরি করছে, দু'তিন দিন পরে ইনসপেকশনে যাবেন, আমি যদি যাই তাঁর গাড়িতে নিয়ে যাবেন। ক'দিন পরে তিনি 'সত্যধামে' গাড়ি পাঠালেন সকালে। আগের দিন নিজে 'সত্যধামে' বসে প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে আলাপ করে গাড়ি পাঠাবার কথা জানিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাসায় গিয়ে দেখি অত সকালে বিস্তর খাবার আয়োজন করেছেন। আমি বেশ কিছু খেয়ে এসেছি জানালেও শুনলেন না, জোর করে খাওয়ালেন। আমি মাফলার আনিনি দেখে বকলেন একটু, বাড়তি কম্বল ও মাফলার নিলেন আমার জন্য। বললেন রাত হয়ে যাবে ফিরতে, খুব ঠান্ডা লাগবে, এ বাবুপোশাকে কুলবে না। বয়সের হিসাবে তখন আমি তাঁর কাছে ছেলেমানুষ এবং ছেলেমানুষের স্নেহশীল, সতর্ক অভিভাবকের মতোই তিনি হাজারিবাগ শহর ঘুরে দেখিয়ে, সুপারভাইজিং ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে খুব খাইয়ে ফেরবার পথে মাফলার জড়িয়ে, কম্বল ঢেকেঢুকে মোরাবাদীর বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। পথে ক'খানা ছবি তুলেছিলাম, তাঁর ছবিও তুলেছিলাম কিন্তু তাঁর নাম ঠিকানা লিখে না রাখতে কলকাতায় ফিরে প্রিন্ট করবার পর তাঁকে কপি পাঠাবার সময় দেখলাম তা ভুলে গিয়েছি। ইন্দিরা দেবী এ কথা শুনে বকুনি দিয়েছিলেন আমাকে।

আগে আলাপ না থাকলেও খুব সহজে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল ক'দিনের মধ্যে। এর একটা কারণ বোধহয় এই যে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে আমার জর্দা খাবার অভ্যাস আছে এবং বেশি পান খাই। এ দু'টি অভ্যাস তাঁরও ছিল। হাজারিবাগ বেড়াতে যাবার সময় যখন গাড়িতে উঠেছি কাগজে মুড়ে কয়েকটি পান ও কিছু দোক্তা আমার হাতে দিয়েছিলেন। খাবার টেবিলে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। তাঁর কারণ হরিপুরের লোকের খাদ্য বিষয়ে রুচি সম্বন্ধে তাঁর সকৌতুক মন্তব্য। টেবিলের অপরপ্রান্তে উপবিষ্ট তাঁর জামাতা ইঙ্গিতে ইশারায় আমাকে রীতিমতো উৎসাহ দিতেন ঝগড়া বাধাতে। হরিপুরের রন্ধনবিদ্যার originality সম্বন্ধে আমার ডবল ডোজের প্রশংসা শুনে তিনি হাসতে হাসতে একদিন আমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন এই originality-র প্রমাণ দিতে। তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবীও তাঁকে সমর্থন করলেন। জোর গলায় আমি Challenge accept করলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জামাতা একটু উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন, কী করে প্রমাণ দেবে তুমি? বললাম, রান্না করে খাইয়ে। সকৌতুক হাস্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বললেন, কী রান্না করবে? ভাত, না পুঁটি মাছের কালিয়া? বললাম, ঠাকুরবাড়ির লোকরা পুঁটিমাছের কালিয়া খান, হরিপুরের লোকেরা পুঁটি মাছের চচ্চড়ি আর অম্বল খায়। পালংশাকের ঝোল খেয়েছেন ঠাকুর বাড়িতে? মাতা ও কন্যা উভয়েই হেসে উঠলেন শাকের ঝোল শুনে. মাতা বললেন, শাকের ঝোল? ওটা বুঝি কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতো খেতে? গম্ভীরভাবে পালংশাক এবং অন্যান্য উপকরণের তালিকা দিয়ে বললাম, কাল বাজার থেকে এগুলো আনিয়ে দেবেন, বাবুর্চি হাত দেবে না, আমি রান্না করব।

পরদিন বাজার থেকে ফরমায়েসি জিনিসগুলো এল। ইন্দিরা দেবী মোড়া নিয়ে দেবরের কাছে চেপে বসলেন আমি কী করি দেখবার জন্য। শাকের ঝোল বস্তুটি তাঁদের কাছে originality। পাকশালে ঢুকে বাবুর্চিকে সরিয়ে দিয়ে আমার হাতাখুন্তি নাড়াবার দৃশ্যটি অপ্রত্যাশিত। মুখ দেখে মনে হল আমার উদ্যম দেখে তিনি খুশি হয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির মানরক্ষা কোন মেয়ে না চায়, হোক না একেত্রে অশ্রুতপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব তুচ্ছ শাকের ঝোলের দ্বারা মানরক্ষা। পালং শাকের ঝোল খেয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী খুশি। অনেকগুলো পুডিং খাইয়েছিলেন, নিজের হাতে পানসেজে দিয়েছিলেন এবং কদিন পর্যন্ত সত্যধামে যাঁরা

বেড়াতে আসতেন এঁদের কাছে পালংশাকের ঝোলের গল্প করতেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কুচবিহারের মহারানি সুনীতিদেবী। এঁর কথা মনে আছে এজন্য যে এঁর সামনে আমাকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল আর একটি বিষয়ে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো বড় বড় কবিতা আমার মুখস্থ ছিল এবং মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পরে আবৃত্তি শোনাবার জন্য ডাক পড়ত। সম্ভবত মহারানির কাছে পালংশাকের ঝোলের গল্প বলবার পরে আবৃত্তির কথা কিছু বলা হয়েছিল। তিনি আমার খোঁজ করলেন। ঘরে ঢুকে নমস্কার করতে মহারানি বললেন, তোমার আবৃত্তির কথা শুনলাম, শাজাহান কবিতাটি আমাকে শোনাও। আবৃত্তি করতাম ঘরোয়া পরিবেশে, মহারানির অনুরোধে ঘাবড়ে গেলাম বেশ। মাথা চুলকে কোনও মতে বললাম, সবটা মনে নেই, পারব না। মাননীয় অতিথির অনুরোধ, ইন্দিরা দেবী একটু বিরক্ত হলেন মনে হল। মহারানি আবার বললেন, লজ্জা করছ কেন, যতটা মনে আছে বলো। গতান্তর নাই দেখে আরম্ভ করলাম। 'এ কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর-শাজাহান' শেষ হতেই আরও ফরমায়েশ হতে পারে ভয়ে নমস্কার ঠুকে স্থান ত্যাগ করলাম।

রাঁচিতে থাকবার সময় ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে সকালের দিকে একা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতাম। একদিন এক টিবি পাহাড়ের, বোধহয় ডারম পাহাড়, কাছে বেড়াবার সময় হঠাৎ এক হায়েনার সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল কুকুর। তারপরেই আয়তন, হিংস্র চাহনি এবং দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হল নেকড়ে বা হায়েনা। ওর মতলব ভাল নয় হিংস্র দৃষ্টি দেখে বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি। আমার এর পরের performanceটা বিস্ময়কর। পিছু হটতে হটতে কাছেই একটা নালা দেখতে পেয়ে লাফিয়ে পড়েছিলাম তার মধ্যে। সাত থেকে আট ফুট গভীর নালা, তলায় ছোট বড় বিস্তর পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। নালাটা পাহাড় থেকে বেরিয়েছে। বৃষ্টির জল নিকাশের পথ, চওড়ায় চার-পাঁচ ফুট হবে। অনেক দূর অবধি গিয়েছে। আমার কতটা লেগেছিল মনে নেই তবে জখম হইনি। জন্তুটা নালার পাড় অবধি এসে দাঁড়িয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য কয়েকবার পাথর ছুঁড়েছিলাম দৌড়তে দৌড়তে। বাড়ি ফিরে এই adventure-এর গল্প শুনে সবাই বললেন ওটা হায়েনা বটে। কাল রাতে হায়েনার ডাক শোনা গিয়েছিল কাছেই।

রাঁচির কথা বললাম জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কথাটুকু বলবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বইতে ওঁর কথা আছে, আরও অনেকে লিখেছিলেন তাঁর কথা, আমি যেটুকু দেখেছি তাই এখানে বললাম। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছি মে-ফেয়ারের বাড়িতে। গম্ভীর মানুষ, তখন অসুস্থও বটে, সামান্য কথাবার্তা হয়েছে। শেষবার যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি আরও অসুস্থ। মে ফেয়ারের বাড়ির বারান্দায় আরাম-চেয়ারে শুয়ে তাঁর একখানি বইয়ের ফাইনাল প্রুফ দেখছিলেন একমনে। ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, ফ্যাকাশে চেহারা, মুখে নিরুদ্বেগ গাম্ভীর্য, বাইরে থেকে দেখে অসুখের বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। এর ক'দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পুরনো স্মৃতির কথা যখন বলছি আরও দু'একটা কথা বলে নিই। কিছু পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯২৪-এর মার্চ মাস।

সরকারি অনুবাদকের অফিসের কাজ ছেড়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করছিলাম তখন। বিদ্যার ও আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিলাম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি তখন, নামে পোস্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, কাজে সর্বেসর্বা—সকলেই একথা জানতেন।

চিঠি পাঠাবার ক'দিন পরে ৭৭নং রসা রোডে গেলাম মুখে আবেদন জানাতে। ছাত্র অবস্থায় তাঁকে দেখেছি অনেকবার, ছোটখাটো দরবারও করেছি, ধমকানি শুনেছি কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। দেখা করতে গেলাম কারও সুপারিশের চিঠি না নিয়েই। দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নেই। সৌভাগ্যের কথা সেই সময়টায় আর কেউ ছিল না ঘরে, থাকলে হয়ত কিছু বলা হত না। খালিগায়ে চেয়ারে বসে আছেন, মনে হল ওঠবার সময় হয়েছে। একটা প্রণাম ঠুকে গড়গড় করে বলতে শুরু করলাম চিঠিতে যা লিখেছিলাম। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার চিঠি পড়েছি। দেখো আমি তো চাই তোমাদের মতো ছেলেদের ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে আসি, পড়াশোনা করবার সুবিধে করে দিই। এই তো সুনীতিকে বিলেতে পাঠালাম। কিন্তু টাকা কোথায় পাই। গভর্নমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, টাকা দেবে না, কাজ করতে দেবে না। কতদিক সামলাই? তারপর বললেন, তোমার নামটা কী? নাম শুনে বললেন, চৌধুরী তো মস্ত নাম হে। কিছু সম্বন্ধ আছে ওদের সঙ্গে, বালিগঞ্জের চৌধুরীদের সঙ্গে?

বললাম, আছে।

একটুখানি ভেবে বললেন, দেখো মাইনে বেশি দিতে পারব না। যা দিতে পারব তাইতে রাজি আছ সরকারি চাকুরি ছেড়ে আসতে? বললাম, রাজি আছি।

বললেন, বেশ। আসছে সেশন থেকে আসবে। জুনের শেষে একবার দেখা করো।

তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কথা বলতে বলতে। গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথাটা আবার বললেন।(এই সময়ের কিছু

আগে বা পরে লর্ড লিটনকে লেখা তাঁর চিঠি কাগজে প্রকাশিত হয় এবং তিনি বিখ্যাত freedom first, freedom second, freedom last বক্তৃতা দেন।) আমি প্রণাম করে ওঠবার সময় মাথা তাঁর বিশাল অনাবৃত ভুঁড়িতে লেগে গেল। পিঠে তিনি যে থাবড়াটা মারলেন এতদিন পরেও তার কথা মনে আছে। দু'চারজনের কাছে এই সাক্ষাতের বিবরণ বলতে তাঁরা বললেন, তোমার চাকুরি হয়ে গেছে। তবে ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেবার আগে হাতের চাকরি ছেড়ো না।

ইউনিভার্সিটির চাকুরি কিন্তু হল না। মার্চ মাসে সাক্ষাৎ করেছিলাম, মে মাসে স্যর আশুতোষের হঠাৎ মৃত্যু হল।

তাঁর মৃতদেহ কলকাতা পৌঁছলে হাওড়া স্টেশন থেকে শোকযাত্রা আরম্ভ হল। আমার কনিষ্ঠভ্রাতা অশ্বিনীর শোকযাত্রায় যোগ দিয়ে কিছুক্ষণ মৃতদেহ বহন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সিনেট হাউসের সামনে শোকযাত্রার যে ছবি কাগজে বেরিয়েছিল তাতে তাঁর ছবিও উঠেছিল। আমি অফিস থেকে বেরিয়ে রসা রোডে শোকযাত্রায় যোগ দিয়ে কেওড়াতলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। কলকাতার লোক, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ হাজারে হাজারে যোগ দিয়েছিল সে শোকযাত্রায়। কেওড়াতলায় ভিড়ের চাপে আমার চশমা ঠিকরে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল।

আরও কয়েকটা শোকযাত্রার কথা মনে আছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহ কেওড়াতলায় দাহ করবার সময় গান্ধীজি শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন। ভিড়ের থেকে গান্ধীজিকে বাঁচাবার জন্য একটি লম্বা চওড়া জোয়ান যুবক তাঁকে কাঁধের ওপর বসিয়েছিলেন মনে আছে। মনে পড়ছে দু' পা ঝুলিয়ে যুবকটির কাঁধে বসে হাতে ছোট একটা বটগাছের ডাল চেপে ধরে ডান হাত তুলে চিৎকার করে জনতাকে শান্ত হবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন গান্ধীজি। ছবিটি এখনও চোখের সামনে ভাসছে। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টায় ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ে হাঁফ ফেলে বাঁচি। সব শ্রেণির লোক দেশবন্ধুর শোকযাত্রায় যোগ দিয়েছিল।

যতীন দাসের শোকযাত্রাও খুব বড় হয়েছিল। এ শোকযাত্রাতেও বিভিন্ন শ্রেণির লোক যোগ দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শোকযাত্রাতেও যোগ দিয়েছিলাম। সাহিত্যিকের শোকযাত্রা হলেও খুব লোক হয়েছিল। অনেক শিখ এতে যোগ দিয়েছিলেন।

(১৩)

১৯১২-এ কনিষ্ঠভ্রাতা ডাক্তারি পাশ করে বেরলে বৈঠকখানার মেস ছেড়ে দিয়ে গড়পারে (বাহির মির্জাপুর রোড) বাড়ি ভাড়া করলাম। বাড়ি নেবার উদ্দেশ্য ছিল ওই বাড়ি থেকে প্র্যাকটিশ করবে। কিন্তু ছ'মাস হাউস সার্জনের কাজ করবার পরে হঠাৎ P & O Company-র জাহাজে মেডিকেল অফিসারের চাকুরি নিয়ে চলে গেলেন। আমার মধ্যমভ্রাতা এর আগে B.I.S.N. কোম্পানির জাহাজে Purser চাকুরি নিয়ে বর্মা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়ায় যাতায়াত করেছিলেন। এই বাড়িতে থাকবার সময়ে ১৯২৮-এর শেষে দু'ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে আমার বিয়ে হয়ে গেল বর্ধমানে। মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন ড. প্রবোধ বাগচী। বরযাত্রীদলের মধ্যে ছিলেন তিনি, ড. নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং বন্ধুবর তারকচন্দ্র। বিয়ের পরেই চলে গেলাম চাইবাসা।

চাইবাসা তখন এখনকার মতো বড় industrial শহর হয়নি। শহরের আশেপাশে হো গ্রাম। ক্যামেরা কাঁধে, কখনও বা বন্দুক ঘাড়ে ঘুরে বেড়াতাম নিকটবর্তী গ্রামগুলোয়। অন্য পশুপাখির অভাবে কিছুদিন ঘুঘু মারা গেল, তারপর বিরক্ত হয়ে বন্দুক তুলে রাখলাম। ছবি তোলবার মতো অনেক কিছু মিলত। প্রায় সবই হো-দের জীবনযাত্রার দৃশ্য। লম্বা লাইন বেঁধে যখন হো মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে ঝুড়ি মাথায় হাটে যেত বা হাট থেকে ফিরত, আগে হতে জায়গা বেছে নিয়ে অনেক সময় হয়ত তাদের অগোচরে Snap নিতাম। ক'টা ছবি বেশ ভাল হয়েছিল। নিকটবর্তী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত দু'একটা গ্রামে, চাইবাসা হতে চক্রধরপুর পর্যন্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। পথে চড়িভাতি করতে যাওয়া হত। শহর থেকে মাইল দুই দূরে লুপুংগুটু নামে এই রকম একটা গ্রাম ছিল। আমার প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের এই নাম দেওয়া হয়েছে।

নানা খনিজে সমৃদ্ধ এই অঞ্চল। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, মাইকা মেনে, ম্যাঙ্গানিজ বেশি। চাইবাসা হয়ে একটা রেল লাইন উড়িষ্যার কেওনঝড়ের সীমানা পর্যন্ত চলে গেছে খনিজ-সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। এই অঞ্চলে খনিজ উত্তোলনের কাজ হচ্ছে দেখলাম। রোপওয়ে এখানেই প্রথম দেখি। চাইবাসা শুকনো স্বাস্থ্যকর জায়গা, মাটি লাল, কঙ্করময়, খুব বেশি পছন্দ না হলেও জায়গাটা ভালই লেগেছিল তখন।

বাহির মির্জাপুর রোডের বাড়িতে বাস করবার সময় ১৯২০-এর শেষ দিকে বালিগঞ্জে জমি কিনে বাড়ি তৈরি আরম্ভ হল। ১৯৩১-এর এপ্রিল মাসে নূতন বাড়িতে উঠে এলাম। জমি কেনা এবং বাড়ি তৈরির কথা আরও একটু বেশি করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে জীবনের শেষ অংশে। আমার দুটি বন্ধুও ছিলেন এর মধ্যে। ড. প্রবোধ বাগচী এবং তারকচন্দ্র দাস। কালিঘাটে দুটি বাড়িতে এঁরা তখন বাস করতেন। প্রবোধের গৃহের এক অংশে তখন বাস করতেন সস্ত্রীক ড. নিরঞ্জন চক্রবর্তী। এই বাড়িতেই আইরিশ মেয়েটির সঙ্গে হিন্দু মতে তাঁর বিয়ে

হয়েছিল। উভয়ের আলাপ অবশ্য বিদেশে থাকতেই। বিয়ের কনেযাত্রী ও বরযাত্রী ছিলাম আমরাই ক'জন। কিছুদিন পরে Opigraphist-এর চাকুরি নিয়ে ড. চক্রবর্তী দিল্লি চলে যান।

প্রতি রবিবারে আমরা তিনজন সমবেত হতাম তিন বাড়ির কোনও এক বাড়িতে। আমাদের তিনজনের নাম হয়েছিল Three Musketeers, সম্ভবত প্রবোধ দিয়েছিলেন। আহারাদির পরে যাত্রা করা হত জমি দেখবার উদ্দেশ্যে। জমির দাম তখন অনেক সস্তা ছিল কিন্তু গৃহ নির্মাণ অভিলাষীদের পুঁজি ছিল বেশ কম। ঢাকুরিয়া নিউ আলিপুর এবং অনেক পাড়ায় জমি দেখে দেখে অবশেষে ১৯৩০-এর গোড়ায় বন্ডেল রোডের দক্ষিণে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির স্কিমের দক্ষিণে জমি পছন্দ করা হল। পছন্দ করবার বড় একটা কারণ কিস্তিতে মূল্য দেবার ব্যবস্থা।

সমস্ত এলাকায় গোটা তিনেক মাত্র নূতন বাড়ি ছিল তখন, কিন্তু কেউ বাড়িতে বাস করতেন না। প্রায় সবটাই বড় বড় তাল তেঁতুল গাছ শোভিত, খানাডোবায় জখম মাঠ, আশেপাশে ধেনো জমি, দু'একটা বস্তি। দুই তিন ঘর ভদ্র পুরনো বাসিন্দা ছিলেন এই এলাকার পশ্চিমে রুস্তমজি স্ট্রিটের গলিতে।

প্রবোধ করিৎকর্মা মানুষ। জমি কিনে বাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করলেন। পুঁজি কম, বড় কিছু করা অসাধ্য, কষ্টে সৃষ্টে মাথা গোঁজবার স্থান করা। অথবা বাড়িভাড়ার চাপ থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা করা। কারণ দেশে মাথা গোঁজবার স্থান তিন বন্ধুরই ছিল। প্রবোধের বাড়ি হয়ে গেল ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে। পুজোর আগে তিনি গৃহপ্রবেশ করলেন। পরিবার দেশে পাঠিয়ে তারকও ওই বাড়িতে চলে এলেন। ডিসেম্বর মাসে আমার গৃহ আরম্ভ হল এবং ১৯৩১-এর এপ্রিলে আমি নূতন বাড়িতে উঠে এলাম। এরপর তারক আরম্ভ করলেন তাঁর বাড়ি তৈরি। আমি বাড়িতে আসবার দিনপনেরো আগে রাস্তায় ফিল্টার জল এল। জলের কানেকশন পেতে প্রায় দু'সপ্তাহ দেরি হল। এই দু'সপ্তাহ প্রবোধের বাড়িতে স্নান করতে হত। রান্না-খাবার জল তার বাড়ি হতে আনা হত। এইভাবে ১৯১৮ হতে যে-তিনজন এক ছাত্রাবাসের বন্ধু ছিলাম তাঁরা হলাম নিকট প্রতিবেশী।

এই কথাগুলো লিখলাম এই মনে করে যে বন্ধু ও প্রতিবেশীদের একজন শান্তিনিকেতনে মারা গেছেন কয়েক বছর আগে (ড. প্রবোধ), আরও কাজ করবার, আরও নাম করবার আশা অপূর্ণ রেখে। দ্বিতীয়জন (তারক) আরও চারদিন আগে (২৬ জুলাই ১৯৬৪) মারা গেলেন। ১৯২৯-৩০-এর জমি সংগ্রহাভিলাষী Three Musketeers-এর মধ্যে আমি অবশিষ্ট রইলাম lonely melancholy Musketeer.

(১৪)

কুমুদনাথ চৌধুরীর ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়িতে সবুজপত্রের যে আড্ডা বসত, সেটা হল সবুজপত্রের আড্ডার তৃতীয় পর্যায়। এই পর্যায় শেষ হলে প্রমথনাথ যখন এসে তাঁর সেজদার বাড়িতে বা পাম অ্যাভিন্যুর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাল বাংলোতে থাকতেন তখন আড্ডার জন্য তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হত। কখনও আমার গৃহে এসে বসতেন, কখনও অতুলবাবুর গৃহে যেতেন, প্রায়ই প্রবোধের গৃহে বসতেন।

প্রবোধের গৃহ বড় আড্ডার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ আসতেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, হারীতকৃষ্ণ দেব প্রভৃতি সবুজপত্র-মজলিসের প্রাক্তন সভ্যরা এখানে নূতন আরও অনেককে নিয়ে জমিয়ে বসতেন। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, পুরনো বন্ধু পাড়ার নীরেন রায়ও ছিলেন। এই আড্ডা ক্রমে 'পরিচয় গোষ্ঠী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। পরিচয় গোষ্ঠী নামের মূল সুধীন্দ্র দত্তের 'পরিচয়' কাগজ। কখনও কখনও প্রবোধের গৃহে এই আড্ডায় হয়ত গিয়েছি, চিনতাম আড্ডার প্রায় সবাইকে কিন্তু এই গোষ্ঠীর বাইরেই থেকে গেছি বরাবর।

নূতন আড্ডা খুঁজে নিতে দেরি হল না। এটি হচ্ছে 'রবিবাসর', প্রবাসী ও Modern Review অফিসের কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার অনুরোধে রবিবাসরে যোগ দিয়েছিলাম। প্রবাসীতে তখন নিয়মিতভাবে আমার প্রবন্ধ বেরত, Modern Review-তেও মাঝে মাঝে লেখা বেরত। মাসে দু'টি করে অধিবেশন হত রবিবাসরের, পালা করে সভ্যদের এক একজনের গৃহে। বেশির ভাগ অধিবেশন হত কলকাতায়। দু'চারটা অধিবেশন বাইরেও হত। বছরে একদিন কারও বাগানবাড়িতেও অধিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠ বা আলোচনা তবে মুখ্য ব্যাপার ছিল ভোজন। প্লেটে করে খাবার দেওয়া হত বেশিরভাগ বাড়িতে। পাত পেড়ে লুচি মাংস মাছ, দই মিষ্টির ব্যবস্থা হত কোনও কোনও গৃহে। গান বাজনাও হত কোনও কোনও বাড়িতে। চাঁদা নির্দিষ্ট ছিল মাসিক আট আনা।

রবিবাসরের চালক ও প্রাণ ছিলেন সেক্রেটারি নরেন বসু। সভাপতি ছিলেন জলধর সেন। রবিবাসরে প্রবেশ করে আলাপ হয়েছিল পরলোকগত অমূল্য বিদ্যাভূষণ, শিশুসাহিত্যের লেখক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, বাঁশবেড়ের মুণীন্দ্রদেব রায়মশায়, জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি এবং আরও অনেকের সঙ্গে। আমি সভ্য হবার কিছুদিন পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সভ্য করে নেওয়া হয়। শরৎবাবু রবীন্দ্রনাথকেও টেনে আনেন রবিবাসরের মধ্যে। তাঁর পদ হয় মহানায়ক। পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র রবিবাসরের সভ্য হয়েছিলেন।

আমার বাড়িতে দুটি অধিবেশন হয়েছিল। প্রথম অধিবেশনে অতুল গুপ্ত, প্রমথ চৌধুরী এবং পাড়ার খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পাড়ার অনেক ভদ্রলোককেও নিমন্ত্রণ করেছিলাম। এই অধিবেশনে খগেন্দ্রবাবু রবিবাসরের সভ্য শ্রেণিভুক্ত হন। দ্বিতীয় অধিবেশনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখবার জন্য পাড়ায় অনেক মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেবার জন্য বড় একটা গোলাপের তোড়া তৈরি হয়েছিল বাগানের গোলাপফুল তুলে। বাড়িতে তখন একশতের ওপর গোলাপগাছ ছিল এবং অজস্র ফুল হত। আহারাদির পরে সভা ভাঙবার সময় শরৎচন্দ্রকে একটু বসতে অনুরোধ করা হল মেয়েরা তাঁকে দেখতে চান জানিয়ে। অনুরোধ শুনে গোলাপের তোড়াটি হাতে নিয়ে একলাফে আসন ত্যাগ করে দ্রুতবেগে রাস্তায় নামলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে অনেকে হাসতে লাগলেন।

শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডের গৃহে দু'বার রবিবাসরের অধিবেশন হয়েছিল। দু'বারের কথাই বেশ মনে আছে। মনে আছে ভোজনের সুপ্রচুর ব্যবস্থার জন্য বোধহয়। প্রথম বারের অধিবেশন শরৎচন্দ্রের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে। শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ তাঁর সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। রাজনৈতিক চর্চাও কিছু হয়েছিল। গানবাজনার ব্যবস্থাও কিছু ছিল সম্ভবত। তারপর পাতপেড়ে লুচি, মাংস পোলাও, দই মিষ্টির সদ্ব্যবহার। শরৎচন্দ্র পট্টবস্ত্র পরে সুপারভাইজ করে বেড়াচ্ছিলেন। মনে আছে খেতে খেতে পার্শ্ববর্তী কে যেন বলছিলেন, শরৎবাবু জমিদার নন, ব্যবসায়ী নন, চাকুরিও করেন না। তিনি শুধু সাহিত্যিক। সাহিত্যিকের গৃহে সাহিত্যকর্ম করে লব্ধ অর্থে এই ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এজন্য এই খাওয়া স্মরণীয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। শরৎবাবুর প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরের মহানায়ক পদে নির্বাচিত হন। দুই সাহিত্য-মহারথীর মধ্যে কথাবার্তা, হাস্যপরিহাস হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় সে কথা মনে করতে পারছি না। কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। যাবার আগে রবিবাসরের সভ্যদের শান্তিনিকেতনে যাবার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। এদিনেও গুরুতর ভোজের আয়োজন ছিল।

কলেজি শিক্ষার প্রথমদিকে শরৎবাবুর রচনার সঙ্গে পরিচয়। যতদূর মনে পড়ে তাঁর 'বিরাজ বৌ' বোধহয় প্রথম পড়েছিলাম যখন ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখাটি বের হচ্ছিল। পড়েই মনে হয়েছিল একজন বিশেষ শক্তিমান লেখকের অভ্যুদয় হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না তখন। দিনদিন তাঁর পপুলারিটি বেড়ে চলল, তাঁর গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল। ভারতবর্ষ কাগজ প্রতিমাসে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাগ্রে তাঁর লেখাটি পড়তাম। মনে আছে বঙ্গবাণী মাসিক পত্রিকায় তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস যখন প্রকাশিত হল, তরুণ মহলে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। পুস্তকাকারে বেরবার পরেই 'পথের দাবী' proscribed হয়। অফিসের কার্যসূত্রে গোটা বইখানি আমাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করতে হয়েছিল। গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অনন্য সাধারণ সৃজনীপ্রতিভা অনুভব করেছি। কংগ্রেস দলভুক্ত, সুভাষ-ভক্ত, গান্ধীজির অহিংসা নীতির সমালোচক শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উদ্যমের পরিচয় সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হতে জেনেছি। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের বিপুল আকর্ষণ এবং জনপ্রিয়তার কথা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে জানতাম, স্বগৃহে এবং তাঁর নিজের গৃহে কাছে বসে তাঁর কথাবার্তা শোনবার সুযোগ হয়েছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তাঁর সঙ্গে সুযোগসুবিধা থাকলেও ঘনিষ্ঠ হবার অবসর হয়নি। মনে হয় কোথায় যেন, কিসে যেন আটকে যাচ্ছিল আরও কাছে যাবার চেষ্টা। বাংলাসাহিত্যে অনেক অনেক নূতন জিনিস দিয়েছেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যের পরিধি অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বাহুল্য বর্জিত মর্মস্পর্শী স্টাইলই এক অসাধারণ বস্তু, কিন্তু এখানে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বা সাহিত্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে বসিনি। তবুও বলব। আমার মনে হয়েছে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির রসগ্রহণ করা বোধহয় পরিণত বয়সের অপেক্ষা রাখে।

শরৎচন্দ্রের মৃতদেহ নিয়ে যে শোকযাত্রা কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছেছিল সে শোকযাত্রা ছিল বেশ বড় এবং অনেকটা আন্তঃপ্রাদেশিক, জাতীয় পতাকা এবং বন্দেমাতরম ধ্বনিও ছিল তাতে। অভারতীয় দু'চারজনকে সে শোকযাত্রায় দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরেও কিছু সংখ্যক অবাঙালি উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক বলতে পারি না, এর কারণ তাঁর সাহিত্যের প্রভাব না জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সংযোগ, অথবা দুটোই। আগে বলেছি শরৎচন্দ্রের গৃহে যেদিন এসেছিলেন সেদিন রবীন্দ্রনাথ রবিবাসরের সভ্যদের শান্তিনিকেতনে একটি অধিবেশন করবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

এই অধিবেশন রবিবাসরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। উত্তরায়ণ ভবনের প্রশস্ত সিঁড়িতে বসে সভ্যদের যে ফোটো তোলা হয়েছিল তার একখানি কপি এখনও আমার কাছে রয়েছে। যাঁদের ফটো আছে তাঁদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ব্যক্তি পরলোকগমন করেছেন। চেয়ারে উপবিষ্ট তিনজনের রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন কেউ বেঁচে নাই। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, মুনীন্দ্রদেব রায়মশাই, কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র আরও অনেকে বেঁচে নাই। উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিমশাই দীর্ঘকাল আমার

প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁর কথা পরে বলব। তিনি এই অধিবেশনের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিখেছিলেন, তার বিচিত্রা বা অন্য কোন কাগজে সেটা বেরিয়েছে মনে করতে পারছি না।

দলবেঁধে থার্ড ক্লাসের কামরা বোঝাই করে রওনা হয়েছিলাম সকলে। আমার পাশে বসেছিলেন অমূল্য বিদ্যাভূষণমশায়। তাঁর সঙ্গে নানারকম আলাপে আনন্দে সময়টা কেটেছিল। অসাধারণ বিদ্যাবত্তা, নিরহংকার এবং সদালাপি স্বভাবের জন্য এই ভদ্রলোকের প্রতি অনেকখানি শ্রদ্ধা ছিল আমার মনে। গাড়িতে একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করা গেল। রামানন্দবাবুর মতো গম্ভীরদর্শন মানুষ যে অত হাসতে এবং হাসাতে পারেন আগে আমার মতো অনেকেই কল্পনা করেননি।

বোলপুর পৌঁছবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন আরম্ভ হল। শান্তিনিকেতনে আমি প্রথম গিয়েছি, সব কিছুই আমার কাছে নূতন। রাত্রে পৌঁছেছিলাম। আহারাদি সেরে গেস্ট হাউসে রাত্রিযাপন করা হল। পরদিন সকালে চা খাবার পরে উত্তরায়ণ ভবনে কবিগুরুর দর্শন এবং রবিবাসরের অধিবেশন হবে। দুপুরে সেখানে তাঁর মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা হবে শুনলাম।

উত্তরায়ণে রবিবাসরের অধিবেশনের প্রারম্ভে সভ্যদের নাম ডেকে পরিচয় করে দেওয়া হল কবিগুরুর সঙ্গে। অনেককেই তিনি চিনতেন। অধিবেশন শেষ হলে বেশির ভাগ সভ্য যখন শান্তিনিকেতন ঘুরে বেড়িয়ে দেখবার জন্য চলে গেলেন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। কিছুদিন আগে 'মোপাসাঁর গল্প' তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। অনুবাদের প্রশংসা করে চিঠি লিখেছিলেন। বইখানা সম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন করলেন। তারপর প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দিরাদেবীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, প্রমথ বড্ড নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে, বয়সে আমার চাইতে কত ছোট। ইচ্ছে করেই হোক বা অভ্যাসবশে সিল্কের আচকানের ঢিলে হাতটা খানিকটা টানলেন। তাঁর সুপুষ্ট প্রকাণ্ড কবজি চোখে পড়ল। আমার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি দেখে মৃদু হাসলেন। বললাম, ন'জ্যেঠিমার (ইন্দিরা দেবী) হাতও আপনার হাতের মতো। আবার মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, শ্রীনিকেতন দেখেছ? ফেরবার আগে দেখে যেয়ো। শ্রীনিকেতনের কথা বলছেন এমন সময় কয়েকজন রবিবাসরের সভ্য এলেন। আমি প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

মধ্যাহ্নভোজনের সমারোহের কথা বেশ মনে আছে। সত্তর আশি জন আসন পেতে খেতে বসেছেন, থালায় ও অনেকগুলো করে বাটি সাজানো আহার্যের সামনে। একপাশে বেতের চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ উপবিষ্ট। তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী তত্ত্বাবধান করছেন, শান্তিনিকেতনের ছেলেরা পরিবেশন করছেন। কবিগুরুর হাস্যপরিহাসে মাঝেমাঝে উচ্চ হাসি উঠছে ভোক্তাদের মধ্যে। মাছ, মাংস, পোলাও, দই, নানাপ্রকার মিষ্টির প্রচুর আয়োজন। সকলেই আয়োজনের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করতে তৎপর।

উত্তরায়ণের এই ভোজসভা আরেকটি ভোজের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। পরে তার কথা বলছি।

আহারের পরে বাস ও মোটরে অনেকের সঙ্গে আমিও শ্রীনিকেতন দেখতে গেলাম। অনেক রকম কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠান ছুটোছুটি করে দেখেছিলাম। তাঁতের কাজ, ছুতোরের কাজ, বেতের কাজ, অনেক কিছু—ভাল করে মনে নাই এখন তবে তখনকার মনোভাবের কথা মনে আছে। রবীন্দ্রপ্রতিভা যে কত বৃহৎ ক্ষেত্রে কত বিচিত্র কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে বারবার সেই কথা মনে হচ্ছিল।

ফিরে এসে মোটঘাট নিয়ে স্টেশনে যেতে হল। কবিগুরু তখন বিশ্রাম করছেন, দেখা হল না। কর্মীরা চা পরিবেশনের প্রস্তাব করলেন। গুরুভোজনের গুরুত্ব শ্রীনিকেতন পরিক্রমার ফলেও তেমন লঘু হয়নি, প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন সবাই। রবিবাসরের এই অধিবেশন নিঃসন্দেহে সেরা অধিবেশন।

সিঁথির এক বাগানবাড়িতে রবিবাসরের এক মুদ্রণ ব্যবসায়ী সভ্যের নিমন্ত্রণে একটি অধিবেশন হয়েছিল। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনা হয়েছিল। কী একখানা কাগজে লিখেছিলাম এই অধিবেশনের কথা রবীন্দ্রস্মৃতি হিসাবে। এখনও ক্রোধ এবং বিরক্তি জেগে ওঠে এই অধিবেশনের কথা মনে করলে। রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দের পরিবর্তে যন্ত্রণা বোধ করেছিলাম অবাঞ্ছিত পরিবেশে তাঁর অবস্থিতিতে। মনে আছে কয়েকজন মিলে কতকটা জোর করে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গাড়িতে তুলে দিয়েছিলাম।

এর কিছুদিন পর সভাপতি জলধর সেনের মৃত্যুর পরে আমি রবিবাসর ছেড়ে দিই। জলধর সেনমশায়ের পরে রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতি হন। রবিবাসর ছাড়বার পরে দু'চারটে অধিবেশনে যোগ দিয়েছি যাঁদের গৃহে অধিবেশন হবে তাঁদের বিশেষ নিমন্ত্রণে। পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এবং রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম মনে আছে। খগেন্দ্রনাথ এবং উপেন্দ্রনাথ উভয়েই আমার প্রতিবেশী, কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন বন্ধু। যোগেন্দ্র গুপ্তমশায়ের গৃহে অধিবেশনে দেখলাম লেডি রানু মুখার্জি রবিবাসরের সভ্য হয়েছেন।

উত্তরায়ণের ভোজসভার কথা বলতে গিয়ে যে ভোজের কথা মনে পড়েছিল তার কথা বলছি। এটা একেবারে

পারিবারিক ভোজ, এর একমাত্র বৈশিষ্ট্য আমার এই ভোজে স্থান পাওয়া। বৈশিষ্ট্য বলছি এজন্য যে আমি তখন বি এ ক্লাসের পড়ুয়া বালকমাত্র এবং তিনজন নিমন্ত্রিতের মধ্যে একজন মহারাজা শশীকান্ত, আরেকজন গোবরডাঙার জমিদার প্রসিদ্ধ শিকারী জ্ঞানদাবাবু। আমি অনিমন্ত্রিত। রবিবার বা ছুটির দিনটা কাটাতে গিয়েছিলাম। ব্রাইট স্ট্রিটের ন'জ্যেঠামশাই কুমুদনাথ চৌধুরীর গৃহে। মূল্যবান কার্পেটের আসন মাপমতো প্রকাণ্ড থালা এবং গোটা ত্রিশ বাটি এবং খান দশ রেকাবি সাজিয়ে প্রত্যেকের জন্য আসন রচনা করা হয়েছিল। আমাকে টেনে নিয়ে যখন একটি আসনে বসিয়ে দিলেন ন'জ্যেঠামশাই, এই মহারাজকীয় ব্যবস্থা দেখে বিষম ঘাবড়ে গেলাম। বলাবাহুল্য খাওয়া বিশেষকিছু হল না, যদিও এই বালখিল্য পঙক্তি ভোক্তার দুরবস্থার প্রতি কোনও মনোযোগ না করে কিন্তু রাজকীয় অতিথিরা গল্পগুজব করতে করতে খেতে থাকলেন। বড় রুপোর চামচ দিয়ে বাটি থেকে খাবার তোলবার চেষ্টায় ঘেমে উঠেছিলাম কেবল। আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি আমাকে তখন ওরকম রাজকীয় মর্যাদা কেন দেওয়া হল। বোধহয় স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের খেয়াল।

রবিবাসরের সূত্রে সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে যে-পরিচয় হয় প্রতিবেশিত্বের সূত্রে তা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আলাপ হবার পরে একদিন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম বিচিত্রা প্রকাশিত হবার সময় তিনি একদিন আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন বিচিত্রার জন্য আমার বন্ধু ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচীর লেখা আদায় করবার উদ্দেশ্যে। কে তাঁকে খবর দিয়েছিস প্রবোধের লেখা পাবার উপায় হল আমার সাহায্য নেওয়া। অবশ্য প্রবোধের সঙ্গে দেখাকরেছিলেন তিনি। উভয়ের চেষ্টায় প্রবোধ বিচিত্রার জন্য তাঁর ইন্দো-চীন ভ্রমণ কাহিনি লেখেন।

উপেন্দ্রবাবুর গৃহ প্রিয় আড্ডার স্থান ছিল অনেকের কাছে। মজলিশি লোক ছিলেন তিনি। গল্প করতে ভালবাসতেন, খুব ভালো গল্প করতেও পারতেন। হাস্যকৌতুক করতে পারেন, গান গেয়ে মনোরঞ্জন করতে পারতেন। তাঁর গুণমুগ্ধ অনুরাগীর সংখ্যাও ছিল বিস্তর। তাঁর মত সত্যিকার গুণী, সম্পূর্ণ complex মুক্ত সাহিত্যিক এবং মধুর ব্যবহার, মিষ্ট ভাষণ ও আকর্ষণীয় চরিত্রগুণের অধিকার লেখক এ যুগে আর চোখে পড়েনি। তাঁর সাহিত্য ও তাঁর চরিত্রের মৌলিক মিষ্টত্ব সঞ্চারিত হয়েছিল।

(ক্রমশ)

ছোটগল্প

প্রশ্নবাচী

কুমার রাণা

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সীমিত হতে বাধ্য। কিন্তু ব্যক্তি তো তাকে মূল্য দেবেই এবং চন্দ্রা ব্যক্তিমাত্র। সমাজ, দেশ, বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যতই পাকে পাকে জড়িয়ে থাক না কেন তার নিজস্ব বাধ্যতামূলকভাবে প্রভাবশালী—অন্তত সে যেগুলিকে নিজের বলে মনে করে সেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার বেলায়। অবশ্য একথা বলাও বোধহয় অনাবশ্যক যে একক চন্দ্রার গড়ে ওঠার পরতে পরতে নানান নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক, জাগতিক এবং আদি আদি ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে গেছে। কিন্তু অবশেষে সেগুলি তার যে একান্তকে গড়ে দেয় তা সকল কিছুর ঊর্ধ্বে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব এই সঙ্কটমুহূর্তে তার সামনে পড়ে থাকা নানান তারকা তারকা প্রাইভেট হাসপাতালের লোভনীয়, দারুণ আশাবাদী এবং করুণাঘন পর্তাগুলি অথবা মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী, মন্ত্রীপদপ্রার্থী ভিন্ন ভিন্ন মাপ ও খাপের সমাজকর্তাদের উচ্চ উচ্চ ঘোষণা, কিংবা দলীয় নেতা কর্মীবৃন্দের আশ্বাসবাণী, অথবা সংবাদপত্র থেকে নিয়ে অফিসের সর্বজ্ঞ কেরানি পর্যন্ত নানান পেশাদার ও নেশাখোর খবরচিদের হতাশ্বাস—কোনও কিছুই তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

সে একটি নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে চায়।

কেননা, এই মুহূর্তে এই ঘর, মার হাতের ফুলতোলা, রংচটা বালিশের ওয়াড়, ফুটপাথ থেকে কেনা বিছানার চাদর, দু'বছরের বেশি মারা যাওয়া পরম ভক্তিসম্পন্না এবং যুগপৎ তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর চরণাশ্রিতা মার রেখে যাওয়া লক্ষ্মী, কালি, মহাদেবের ছবি—পুরনো আদলের ঘরের একটি তাকের অর্ধেক জুড়ে তাদের ফেলা যায়নি, বাকি অর্ধেক তাক জুড়ে, পেতলের ছোট থালা, ঘটি গেলাস, ধূপদানি—তাদেরও সরানো যায়নি। অন্য তাকগুলিতে বইপত্র, পত্রিকা, ডায়েরি, খাতা, অবিন্যস্ত টুকিটাকি হস্তশিল্প, ওপরের দেয়ালে একদিকে মার ছবি—সাদা কালো, শুধু সিঁথিতে ফটো কারিগরের এঁকে দেওয়া লাল সিঁথি—তাঁর পতিবন্ধী নিশান, অন্যদিকে রহস্যাবৃত কার্ল মার্কস—অদূরে মৃদুহাস্যময় ব্যঙ্গ ঝোলানো ঠোঁটে লেনিনের উপস্থিতি, নীচে তক্তাপোষে বিছানা, কাঠের পুরনো চেয়ার, প্লাস্টিকের তুলনামূলক নতুন চেয়ার, জলের জাগ—এই সব নানান সাংসারিকতা নিয়ে যে ঘর সেখানে নিশুতি রাতে সে তার পিতাকে আগলে রাখে।

এই মুহূর্তে বাবা তারই একান্ত। অথবা সে বাবার। অথবা দুই-ই। ঘোরতর দলীয়, দলময়, পিতাও তো এক একটি ক্ষুদ্র সময়খণ্ডে ব্যক্তিগত, কখনও তো তিনিও কোনও নিমেষবে নিজস্ব ভেবেছেন। সে ভাবেই তো চন্দ্রার আগমন। চন্দ্রা নামটিও তাঁর বেছে নেওয়া। বাংলাসাহিত্যে রুচি ছিল। ঈষৎ গবেষণা ছিল। কবি চন্দ্রাবতীর নামে মেয়ের নাম—কিছুটা অ-দলীয়, অ-রাজনৈতিকভাবেই, যদিও স্বাভাবিক ছিল লতিকা, প্রতিভা, অহল্যার নামে নাম রাখা—রাজনৈতিক, বিশেষত, বামপন্থী ক্রিয়াকাণ্ডে স্মরণীয় নারী নামগুলি সীমিত হলেও একেবারেই নেই তা নয়। অবশ্য কারও সম্মানে কারও নাম রাখতেই হবে তেমন কোনও কথা নেই। কিন্তু সংস্কার তো থেকেই যায়। মা তো সচেতন সংস্কারময়ী। কিন্তু বাবা?

চন্দ্রা রূঢ় হতে চায় না। বাবা যন্ত্রণায় কাতর। ওষুধ তেমন একটা কাজ করছে না। রাত এগারোটা পর্যন্ত পাড়ার ডাক্তার দলীয় কর্মী দীপেন বসেছিল। অন্য কিছু কর্মী তারও পর পর্যন্ত বসেছিল। কেউ কেউ থেকেও যেতে চেয়েছিল। চন্দ্রা সবিনয়ে তাদের যেতে বলে।

চিকিৎসা নিয়ে নানান পরামর্শ। এমনকী উত্তপ্ত বিতর্ক। সে সময়টা চন্দ্রার বিশেষ ভূমিকা ছিল না। চা করে খাওয়ানো বা জল দেওয়া, কিংবা বাবার পাশে বসা ছাড়া। সংক্ষিপ্ত রান্না সন্ধ্যাতেই সারা হয়ে গিয়েছিল। অফিস থেকে ফিরেই স্নানটানও সেরে নিয়েছিল।

ওরা বাবাকে ঘিরে রয়েছিল। বাবা ওদের। চন্দ্রা কন্যামাত্র, এবং একজন দলীয় মানুষের—বাবার কথায় অবশ্য বৃহত্তর সামাজিক—সব কিছুই দলগত। মানুষটিই তো দলের

সম্পত্তি। চন্দ্রা তাদের আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চায় না। দলকে সে অপ্রয়োজনীয় মনে করে না, এবং হয়ত বা সে নিজেও একথা মনের মধ্যে বিশ্বাসের খুঁটিতে বেঁধে দিয়েছে যে বাবা সামাজিক সম্পত্তি। অতএব সে নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ রাখে। কিন্তু কখনও কখনও তাকে গণ্ডির পরিধি বাড়াতে হয়। এবং বাবাকে তার পরিধি কমিয়ে নিতান্তই ক্ষুদ্র এক বিন্দুতে নিয়ে আসতে হয়—যখন রাত এগারোটা বারোটার পর সব কিছু ক্ষুদ্র হতে থাকে, পৃথিবী বৃহৎ হতে থাকে, আর পিতা ও কন্যা ব্যক্তিগত বৃহত্বের দিকে অগ্রসর হয়।

★

সারাদিন অফিস। চাকরি না করলে চলবে কেন? চাকরিটা নতুন। চন্দ্রার সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত সামান্যই হোক না কেন এটুকু বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে চাকরিটা কষ্টার্জিত, নিজের জোরে। কষ্টে পড়াশোনা, কষ্টে বড় হওয়া। কষ্ট করে চাকরি। তবু সে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করে। চাকরির বাজার যা তাতে কাজ পেয়ে যাওয়াটা প্রায় লটারি পেয়ে যাওয়ার মতোই।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা। ঘর ভর্তি লোক। অবশ্য সে এতেই অভ্যস্ত। বাস্তবিক সে মনেই করতে পারে না কবে তারা একা ছিল। সারাদিনই কেউ না কেউ আসে। কখনও কখনও এর চেয়ে বেশি। বাবা সর্বক্ষণের কর্মী; বাবা উঁচু স্তরের নেতা। সহকর্মী, কর্মীদের ভিড় লেগেই থাকে। এমনকী বাবা না থাকলেও তাঁদের আসা যাওয়া বন্ধ হয় না। কত কথা, আলোচনা, তর্ক পরিকল্পনা—যা ষড়যন্ত্রের উচ্চতায় পৌঁছে যায়। কখনও বা এই বাড়ি পার্টি অফিসের চেয়েও ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ। বাবাকে সে বড় বেশি ব্যক্তিগত পায়নি। বাবার সঙ্গীসাথীদের কেউ কেউ ব্যক্তিগত হতে চেয়েছে। সে অন্য কথা—চন্দ্রা মনে করতে চায় না। এই ক্ষণটিতে সে বিরক্ত হতে চায় না। বাবার অসুখ তার ব্যক্তিগত বাবাকে তার কাছে এনে দিয়েছে—তার বাবা বেঁচে উঠুক। ঘরে এমনকী তার জায়গা যদি না-ও হয় তবুও—বাবা যেমনভাবে বেঁচে এসেছে তেমনইভাবেই বাঁচুক।

সে কি মার মতো করে ভাবছে? মাকে তো সে এই নিয়ে কত কথা শুনিয়েছে। মার পতিভক্তি আর দেবভক্তি নিয়ে। মা হেসেছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ওই পর্যন্ত; মার কাছে বোধহয় পতিভক্তিটা ঠাকুরদেবতাদের ওপর ভক্তির চেয়ে বেশি ছিল—হয়ত বা পতির কল্যাণকামনায় ঠাকুরভক্তি। বাবা তো ঘোর নাস্তিক; কিন্তু মার আচারে বাধা দেয়নি কখনও—হয়ত এমন অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়, বড় কোনও স্বার্থে ছোট ছোট বিশ্বাসগুলির সঙ্গে আপোষ। দুর্বল এক মুহূর্তে বাবা বলেই ফেলেছিল—'ওটা আমার পরাজয়। আমার আদর্শ আমার ঘরেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি।' এই স্বীকারোক্তিটুকু চন্দ্রাকে তৃপ্তি দেয়। কিন্তু, মা-ও কি ঠিক এই প্রশ্নটা তুলতে পারত না? ঘর তো মারও বটে। না কি তা ছিল না?' তাছাড়া আরও প্রশ্ন জাগে, 'বাবা তো অনেক যুদ্ধেই পরাজিত। সে সবও কি সমান স্বীকৃতি পেয়েছে?' নাঃ সে মার মতো করে ভাবছে না। সে তার অর্ধেক পিতার গর্বের গরিমা, অর্ধেক পিতার পলায়নে লজ্জিতা। সব জয় পরাজয়কে সে নিষ্প্রশ্ন মাথায় তুলে নেয়নি।

না নেওয়াতেই তার নিজস্বতা। মায়ের যেমন উলটোটা। কিন্তু এখন সে কথা থাক। চন্দ্রা এখন বাবাকে ভাল দেখতে চায়। কিন্তু বাবার বঞ্চনা যে তীব্রতায় পৌঁছেছে তাতে ভাল হওয়ার লক্ষণ কোথায়? অথচ বাবার চিকিৎসা নিয়ে জটিলতার শেষ নেই। দীপেন কিছুতেই বাবাকে হাসপাতালে পাঠাতে রাজি নয়, নানান প্রাইভেট হাসপাতালের কাগজপত্রগুলি তারই জোগাড় করে আনা—যাতে সেগুলির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে কোনও একটিকে বেছে নেওয়া যায়। এতে অবশ্য কর্মীদের খুব আপত্তি নেই—যদিও তারা জোরের সঙ্গে একথাও বলছে যে সরকারি হাসপাতালেও বাবার চিকিৎসার ত্রুটি হবে না—সেখানেও দলীয় সমর্থক ডাক্তারদা আছেন—তাছাড়া বাবা নেতা। নেতা সোমনাথকাকু অবশ্য খুবই জোর দিয়ে দীপেনকে সমর্থন করে যান। সোমনাথকাকু অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং বাস্তববাদী। কিন্তু বাবার নিজস্ব মতামতটি একগুঁয়ে: 'এখানেই চিকিৎসা হবে। যা হবার তা হবে।' কিন্তু তাঁর পক্ষে তর্ক চালিয়ে যাওয়া কঠিন। রোগজনিত দুর্বলতা তাঁর মানসিক শক্তিকেও বোধহয় কাহিল করে দিয়েছে।

চন্দ্রার বক্তব্যকে কেউই তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না—সে বালিকামাত্র—তাছাড়া বাবার চিকিৎসাটাও একটা দলীয় কাজ, সদস্য সমর্থকদের বাইরের কাউকে এ নিয়ে চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। তবু সে দীপেনকে আংশিক সমর্থন করে। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, খণ্ডিত, সীমিত হলেও সে অভিজ্ঞতা তার গড়ে ওঠায় বিশিষ্ট হতে বাধ্য: বাহ্মকী তৃষ্ণা মাত্র ছ'মাস আগে সরকারি হাসপাতালে প্রাণ হারিয়েছে। চিকিৎসা বলতে যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা, স্পষ্ট বলা যায়, অপচিকিৎসা। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আবার দীপেনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা থেকে বাধা দেয়—বেসরকারি হাসপাতালের অর্ধজীবন্ত নমুনা তো সে নিজেই।

বাবা দলীয় কাজে বাইরে গিয়েছিল। মাঝ রাতে প্রচণ্ড পেটের যন্ত্রণা ওঠে। মা অসহায় বোধ করেছিল। পাশেই এক

দলীয় কর্মীর বাড়ি—তাকে খবর দেওয়া, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাহায্যের অনেক হাত। দলীয় কর্মীরাই ব্যবস্থাপত্র করে চন্দ্রাকে বড় এক তারকামার্কা হাসপাতালে ভর্তি করে। বাবা থাকলে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেত। তাতে হয়ত ভাল হত। কিংবা খারাপ। সবই এখন সংখ্যাগাণিতিক সম্ভাবনা। নয়ত অজস্র টাকা খরচ করেও চন্দ্রা বিকলাঙ্গ হয়ে বাড়ি ফিরল কেন? বহু টাকা কর্মীরাই যোগাড়যন্ত্র করে, অবশ্য বাবা পাইপয়সা ফেরত দেয়। তার জন্য আপোসও করতে হয়—যে বাড়ি সে ত্যাগ করেছিল সেই পৈতৃক সম্পত্তির ওপর অধিকার নিয়ে, বিক্রি করে টাকা শোধ হয়—বাবার তো কোনও কালে কোনও সঞ্চয় ছিল না—বাবা দলীয় অন্নদাস। পার্টি থেকে পাওয়া 'ওয়েজ' দিয়ে সংসার চালিয়ে এসেছে। ইদানীং অবশ্য চন্দ্রার চাকরির সৌজন্যে সংসারে সাচ্ছল্য এসেছে—কিন্তু মা সেটা দেখে যেতে পারেনি। যাই হোক, প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে যে সুস্থতা ফিরে পায় তার জন্য তাকে মাতৃত্বের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিতে হয়। ভুল অপারেশন—নিছক ভুল। দীর্ঘদিন ভুগে ওঠার পর সে জীবন শক্তি ফিরে পায়—কিন্তু তার প্রজননক্ষমতা কোনওদিনই ফিরে আসবে না। অবশ্য তার কাছ থেকে পুরো ঘটনাটিই গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু এমন অনেক কথাই তার কাছে স্বাভাবিক হাজির হয় যা তার জানার কথা নয়। আর এ তো তার নিজের জীবনের প্রশ্ন।

জীবনের প্রশ্ন জটিল হতে বাধ্য। সে যে একথা জানে তা সে কাউকে জানায় না। এমনকী মাকেও না। মারা যাওয়ার আগের বছর মা বহুবার তার বিয়ের কথা বলেছে। সে হেসে এড়িয়ে গেছে 'আমরা বয়স কত হল মা? তাছাড়া, চাকরি বাকরি পাই, তারপর দেখা যাবে।' মার কাছে অপরাধী থাকতে হয়নি। মার মৃত্যু তাকে বাঁচিয়েছে। বাবার ধর্মসংকট হয়নি। মার মৃত্যুটি নিছক দুর্ঘটনায়। হাসপাতাল নার্সিংহোম কিছুই করতে হয়নি। করতে হলে কী হত?

ধরা যাক, চন্দ্রা মাঝে মাঝেই নিজের মনেই খেলে, ধরা যাক মার খুব অসুখ করেছিল। তা মা প্রায়ই অসুস্থ থাকত, কিন্তু ডাক্তার-বদ্যির ওপর একটা চাপানো অবিশ্বাস প্রকট করত। সংসারের খরচ কমানো একটা বড় কথা, সংসারের সবার শেষে মা তার নিজস্ব প্রয়োজনগুলিকে স্থান দিতে গিয়ে কখনওই প্রায় কিছু পায়নি। কিন্তু শুধু তা-ই নয়, মা না থাকলে সংসার চলা কঠিন ছিল। ওই সামান্য টাকায় মা কীভাবে সবকিছু চালিয়ে নিত তা ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। মার নিজস্ব ছকে যেভাবে সংসার চলত, মার অনুপস্থিতিটা সেখানে সংসারের পক্ষে ভয়াবহভাবে দেখা দেবেই—অন্তত মা তেমনটাই ভাবত। কিন্তু কেউই অপরিহার্য নয়, মা মারা যাবার পর সংসার তো চলছে। চন্দ্রা চালাচ্ছে, বাবাকে একটুও বাড়তি দায়িত্ব নিতে হয়নি। যে কথা ভাবা—বাবা কী করত? বাবা কি মাকে সরকারি হাসপাতালে পাঠাত? না কি প্রাইভেটে নার্সিংহোমে? বাবা প্রথমটাই করত। কিন্তু তাতে খুব একটা সমস্যা হত না—বাবার স্ত্রী হিসেবে মা সরকারি হাসপাতালে যতটা ভাল সম্ভব ততটা ভাল চিকিৎসাই পেত। এবং যদি না-ও পেত, তাহলেও বাবার কি খুব ভাবান্তর হত? হয়ত হত। হয়ত না। কল্পিত একটা সমস্যা নিয়ে বেশিদূর যাওয়া কঠিন।

কিন্তু বাস্তব যে সমস্যাটি, নিজের চিকিৎসা, সেক্ষেত্রেও বাবার আত্মবিশ্বাসের মাত্রাটি চন্দ্রা স্পষ্ট বুঝতে পারে না। বাবা সরকারি হাসপাতালেই চিকিৎসা করতে চায়। কিন্তু সেটা হাসপাতালের ওপর আস্থা থেকে নাকি নিজস্ব আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতাটিকে স্পষ্টতর জানানোর সুপ্ত অহমিকা থেকে তা খুব নিশ্চিত নয়। কিন্তু এ সময়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জিদটিই বাস্তব। চন্দ্রা তাকে সম্মান করে, কিন্তু সে ভয় পায়। তার ভয় অন্যদের কাছ থেকে সমর্থিত হয়।

'কিন্তু সরকারি হাসপাতালের অবস্থা কি আপনি জানেন না?' দীপেন ক্ষুব্ধ।

'জানি। কিন্তু সৃষ্টিই হোক বা লয়, সে তো আমাদেরই। তার দায় আমি যদি না নিই তাহলে অন্যদের নিতে বলি কিসের জোরে?'

'আপনার প্রাণের মূল্য অনেক বেশি। অনেক কিছু নতুন করার জন্যই আপনাকে দরকার। সামনে অনেক কিছু বাকি পড়ে আছে তা কি আপনার অজানা?'

বিভাসকাকু আবেগঘন। জেলা নেতৃত্বের যদিও এমন আবেগ মানায় না।

'আর রাধু মন্ডলের জীবনের দাম বুঝি কম ছিল? সে মরে যেতে তার সংসারটাই উজাড় হয়ে গেল। ঠিক চন্দ্রার বয়সি মেয়েটি, আমরা তার জন্য কিছু করতে পারলাম? আর যদি করতামও রাধুর জীবনের বিকল্প তো তা হতে পারত না।' বাবার দৈহিক কষ্টকে ছাপিয়ে যায় তাঁর ব্যক্তিগত প্রীতি, টান। বিড়বিড় করে বলেন, 'কী চমৎকার মানুষ ছিল! কী অসাধারণ কর্মী।' চন্দ্রার মনে প্রশ্ন—রাধুকাকা যদি অসাধারণ কর্মী বা চমৎকার মানুষ না হত তাহলেও কি বাবা এমনটা ভাবতে পারত? ঠিক, রাধুকাকা লড়াইয়ের ময়দানে সবার আগে, রাধুকাকা বাবার অনেক কাজে পথপ্রদর্শক, কিন্তু সে সব যদি না হত তাহলেও কি প্রায় বিনা চিকিৎসায় রাধুকাকার মৃত্যুটা মেনে নেওয়া যায়? চমৎকার মানুষ বা অসাধারণ কর্মী যা-ই হোক রাধুকাকা ছিল খেতমজুর—তার জীবনের দাম অন্য খেতমজুরের জীবনের দামের চেয়ে যে বেশি হয়নি তাতে হয়ত বাবার শ্লাঘা আহত হয়েছে—রাধুকাকা তারই জায়গায় থেকে গেছে, ওপরে ওঠেনি বা নীচে নামেনি।

'দেখুন এত সেন্টিমেন্টাল হলে জগৎ চলে না। আমরা তো চেষ্টা করছি। নানান পথ খোঁজা হচ্ছে। সমস্যাটা তো বিশ্বজুড়ে। পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে দেখলে তো চলবে না। ...এই তো পাড়াতে একটা পলিক্লিনিক খোলা হল। গরিব লোকেরা কত সাহায্য পাচ্ছে।' বিভাসকাকু চরম বাস্তববাদী।

'গরিবরা নয়, মধ্যবিত্তরা পাচ্ছে। তোমার পাড়ায় ক'টা গরিব লোক থাকে? আর, ঠিক করে বলো তো পলিক্লিনিক খোলাটা কি খুব বুক বাজিয়ে বলবার মতো একটা ব্যাপার?' বাবার কষ্ট বাড়ে। শিরা ফুলে ওঠে। দীপেন তাঁকে কথা বলতে বারণ করে। উত্তেজনা ক্ষতিকর। কিন্তু তাঁর কাছে সেই সময় তাঁর বক্তব্যটি জরুরি মনে হল, 'অধিকার না থেয়রাত এখনও যদি এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয় তাহলে রাজনীতি করে কাজ নেই বিভাস। প্রাথমিক কর্তব্যকে কখনওই অন্য রকম শুভেচ্ছা থেকে মুক্তি দেওয়া চলে না, এ বোধটুকু লোকে আমাদের কাছ থেকে আশা করেছিল।'

সোমনাথকাকু কম কথার লোক। এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। বিড়বিড় করে শুধু বলেন, 'এ পাগল লোককে নিয়ে কিছু করার নেই। পড়ে আছে মান্ধাতার আমলের আইডিয়া নিয়ে।'

★

কী আর করা যাবে সোমনাথকাকু? বিভাসকাকু? আরও আরও কাকুরা জেঠুরা? বাবা তো সেই মান্ধাতার আমলের আদর্শের টানে জীবন শুরু করেছিল। মাঝারি চাষির ছেলে, পিছন থেকে টান ছিল—মধ্যচাষির টান—যে টানে সবচেয়ে কাছের শত্রুই হল শ্বেতমজুর। অথচ কলেজে পড়তে গিয়ে কী যে মাথায় ঢুকল—যা স্বাভাবিক হতে পারত, তুলনামূলকভাবে মেধাবী ছাত্র হিসাবে একটা যাকে বলে ভদ্র চাকরি নিয়ে, যাকে বলে, ভদ্রলোকের জীবনযাপন করতে পারত। কিংবা ভালভাবে চাষ করতে পারত, তারপর ব্যবসা—সুযোগ তো কত না বেড়েছে—বাবার পুঁজির অভাব ঘটত না—আর্থিক, সামাজিক কোনও পুঁজিরই না—বংশপরম্পরায় এ বংশ সুবিধাজীবী, সুযোগকে আরও প্রসারিত করে নিতে বড় বেশি মেহনত করতে হত না—সেই চল্লিশ বছর আগে শত্রুপক্ষ হিসাবে শুরুও যদি করত এতদিনে স্বাভাবিক মিত্রপক্ষে চলে যাওয়াটা অনিবার্য ছিল। কিন্তু বাবা কোনও দিকেই না গিয়ে শ্বেতমজুরদের সংগঠিত করতে লেগে গেল। ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'লেখাপড়া শিখিয়ে বিভীষণ তৈরি করলাম।' আর ত্যাগের প্রতিমূর্তি হিসাবেই শুধু নয়, বাবুদের বাড়ির এই তরুণকে মজুরশ্রেণি দেখেছিল শত্রুপক্ষ থেকে ছিনিয়ে আনা মিত্র হিসাবে—এটাই ছিল একটা জয় এবং ঠিক একারণেই রাধুকাকার চেয়ে এবং অন্য অনেকের চেয়ে যোগ্যতার দিক দিয়ে খুব এগিয়ে না থেকেও বাবার জনপ্রিয়তা চূড়ায় পৌঁছয়—তাছাড়া বাবা অন্যভাবে হাতিয়ার সমৃদ্ধ—সাংগঠনিক অপরিহার্যতা হিসাবে শিক্ষার অধিকার বাবার আয়ত্তে ছিল।

বাবা মান্ধাতার আমলের সব স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্নগুলো ভাঙতে দেখেছে—কিন্তু নতুন নতুন স্বপ্ন গড়ার প্রকৃত অথবা ছদ্ম উচ্চারণে বাবাকে দৃঢ় মনে হত—ভাঙা বা মচকানোর কোনও লক্ষণই দেখা যায়নি। আবার মধ্যচাষি বাড়ি থেকে আসা হিসাবি রক্তগুণও হয়ত বাবাকে স্থির রেখেছিল। সময়ের গতি বুঝতে পারার ক্ষমতা বাবার ছিল। অতএব যা কিছু করতে পারার সম্ভাবনা তা সে তার এক চিরায়ত পরিমণ্ডলের মধ্যেই করতে পারার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিল—যা করতে না পারা তা এর বাইরে গিয়ে হবে বলে সে বিশ্বাস করেনি। সব ভাঙাচোরা নিয়ে সে একটা কিছু বিশ্বাস গড়ে নিয়েছে। কাছের লোকরাই শুধু জানত, যেমন চন্দ্রা, অবরে-সবরে তাও, স্বপ্ন ভেঙে কেমনভাবে তার স্বপ্নের ইঁট কাঠ সিমেন্ট চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে বাবা কত সচেতন ছিল। আর কারা কারা সেই সব ছড়িয়ে পড়া মালপত্র কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সত্যিকারের মহল বানাচ্ছে তাও তার অজানা ছিল না। সোমনাথকাকু আপনিও তো বানিয়েছো। বিভাস কাকু আর আর কাকু, জেঠু অন্যরা আপনারাও তো বানিয়েছেন। আর আপনাদের সেই মহল একেবারে জীবন্ত—প্রজননশীল। নতুন নতুন স্বপ্ন দেখায়—নতুন নতুন বাস্তব গড়ে দেয়। আর বাবা? অসহায়তা ও বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও আপোষ, উত্তরণ ও অবস্থানের টান এইসব যৌগিক, সর্পিলতার পথ ধরে বাবা তার মতো করে এগোচ্ছে।

বাবা তো এরকমই। বাড়ি ছেড়েছিল সেই কবে? কোন যৌবনের প্রারম্ভবেলায়। সারাক্ষণের কর্মী মানে সারাক্ষণেরই। প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে সব কিছু যখন অনেক থিতু এবং বয়সও কিছুটা স্থিরতার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে তখন, এবং কিছুটা সহসাও বটে, বাবা ঘর বাঁধল। ততদিনে শহরে। বড় নেতা, অতএব গ্রাম থেকে আর কাজকর্ম সামলানো যায় না। কলকাতার কাছের এই শহর অবশ্য অনেক দিক দিয়েই সুবিধাজনক। কলকাতা ও মফস্সলের মধ্যে যোগসূত্র চমৎকার—তাছাড়া সস্তা। সে কারণে হয়ত বাবা কখনও কলকাতা যেতে চায়নি। চায়নি বলে চন্দ্রার অসুবিধা হয়েছে খুব, বিশেষত কলেজে পড়ার সময়, কিন্তু মানিয়ে তো গেছে। এ শহরেই বাবা কাটিয়ে দিল প্রায় তিরিশ বছর।

একশো টাকা ভাড়ায় বাড়িটা পেয়েছিল—একজন সমর্থকের বাড়ি। তিনি পরে এরা হয়ে যান। ছেলে বিলেত চলে যায়। স্ত্রী মারা যান। ভদ্রলোক একরকম জোর করে

বাবাকে বাড়িটা দিয়ে যান। যান মানে, তিনিও গত। 'সর্বহারা থাকা হল না। একটা বাড়ির মালিক হয়ে গেলাম।' বাবা ঠাট্টা করে বলেছিল। কিন্তু বাস্তবিকই কি বাবা কখনও সর্বহারা ছিল? অর্থ না-ই থাক, বাবার তো সম্পদের অভাব ছিল না—বিপুল সামাজিক পুঁজি। নাম, নেতৃত্ব, ক্ষমতা।

বাবা-মার বিয়েটা কাকতালীয়। শহরেরই এক কোণার মেয়ে তার মা। বাবার মনে প্রেম-ভালবাসা তেমনভাবে কখনও জেগেছিল কি না জানা নেই—বাবা কাউকে বলেনি, আর এসব তো মাইক ফুঁকে বলবার কথা নয়। মার সঙ্গে কোনও পূর্ব-পরিচয় ছিল না। কোনও এক ছুতোয় মার জন্য সম্বন্ধ করা পাত্র বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে উঠে যায়—বাবা উদ্ধারকর্তা হয়। আচ্ছা বাবা যদি সেখানে না থাকত? সব কিছু অন্যরকম হত। অথবা হয়ত হত না। মাকে ছাড়া যেমন চলে যাচ্ছে, তেমন বাবা না থাকলেও মার চলে যেত। যেত কি? কিছুই নিশ্চিত বলা যায় না।

বাবার অবশ্য কিছু মনস্তাপ ছিল। মায়ের কোনও কিছুতে খামতি ছিল এমন মনে করে নয়। মনস্তাপ এই জন্য যে বাবার মনে হয়েছিল সে মাকে করুণা করেছে। সেইভাবে সে মাকে অন্যরকম চোখে দেখেছিল নাকি? হবেও বা। ভাল কি বেসেছিল? হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। বাবাকে সে বরাবর রহস্যময় মনে করে এসেছে। কখনওই খুব খোলামেলা ছিল না। থাকলে অবশ্য এত ওপরে উঠতে পারত না—সেটা আগে জেনেই গিয়েছিল এবং নিজের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে নিয়েছিল। হ্যাঁ সোমনাথকাকু, আপোষই বলা যায়। যে অনাপোষি বাবাকে আপনারা জনসমক্ষে তুলে ধরেন তা তো সে নয়। হলে বহুকাল আগেই আপনাদের সঙ্গ ত্যাগ করত।

বাবা অনেক কিছুই জানত যা সে মন থেকে মেনে নিতে পারত না। কেননা বৃহত্তর স্বার্থ। আর, শ্রেণি-বিভাজিত সমাজের নানা টুকরো-টাকরা নিয়ে আমাদের চলতে হয়—অতএব ছোটখাটো অনেক কিছুকেই অনদেখি করে দিতে হয়, নজর সরিয়ে নিতে হয়। জানেন কাকুরা, জেঠুরা, আমার বাবা কতখানি চোখ বন্ধ রাখতে পারত? অ-নে-ক খানি। দলীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা সে প্রাণ গেলেও চাইতে পারত না। তাই যখন বাবার বারো বছরের বালিকা ক্যাকে আদর করার ছুতোয় পরিতোষজেঠু যেখানে সেখানে হাত দেন, সেই মেয়ে মেয়ে-পরস্পরার জ্ঞানে অস্বস্তি পায়, দুঃখ পায় এবং মার কাছে কেঁদে ভেঙে পড়ে, আর মা স্থিরকণ্ঠে হয়ত জীবনে প্রথমবার—বাবাকে নির্দেশ দেয়, 'পরিতোষদা যেন বাড়িতে না আসেন', তখনও বাবা নির্বিকার। পরিতোষ জেঠু তারপরও বাড়িতে এসেছেন—বাবার মনে হয়েছিল 'পরিতোষদাও তো সমাজেরই অংশ। একটু আধটু পদস্খলন তো ঘটতেই পারে।' বাবা কি খুব বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলেছিলেন? নাকি পরিতোষজেঠুর প্রতাপের তাপে? না কি সেই বৃহত্তর স্বার্থে?

সঠিক জানা নেই। তবে সেই কন্যা পরিতোষজেঠুর কাছে কৃতজ্ঞ। পরিতোষজেঠু তাকে অনেক কিছু এত আগাম দেখিয়ে দিলেন যা সে বই পড়ে জানতে পারত না। ব্যক্তির নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে সে তখনই শিখে গিয়েছিল।

★

যন্ত্রণা বোধহয় কিছুটা কমেছে। বাবা অনেকখানি শান্ত। উঠে বসে জল খেতে চায়। এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও স্বয়ম্ভরতার পরাকাষ্ঠা। চন্দ্রা তাড়াতাড়ি উঠে জল দেয়। বাবা বালিশের তলা হাতড়ায়। 'না, বিড়ি নেই। ফেলে দিয়েছি।' চন্দ্রা হেসে বলে, 'আর তুমি বিড়ি খেতে পাবে না'

'একটা দে মা। সারাদিন তো খাইনি।'

'হ্যাঁ। সারারাতও খাবে না! ছদ্ম গাম্ভীর্য তারপরই কোমল হয়ে ওঠে 'অনেক রাত হল। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর বাবা। এখন একটু ভাল লাগছে বাবা?' সে বারবার বাবা কথাটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলে যায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে।

'হ্যাঁ মা লাগছে।অনেক ভাল লাগছে। তোর বড় পরিশ্রম যাচ্ছেরে। যা তুই ঘুমো। সকালে তো অফিস যাবি।'

'আমার জন্য ভেব না বাবা। আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না। তুমি ওটা বাবা।'

সেরে উঠতে গেলে এখন অনেক কিছু করতে হবে। রোগ বেশ খানিকটা জাঁকিয়ে বসেছে। আগে তেমন পাত্তা দেয়নি। বেশ বাড়াবাড়ি হওয়ার আগে পর্যন্ত সহ্য করে গেছে। অসহ্য বোধ হওয়ায় নিজে গিয়ে আউটডোরে লাইন দিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছে। ডাক্তার দেখাতে গিয়ে বিপদ—প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ব্যায়বহুল। ডাক্তার দেখাতে গিয়েই রোগের কথা জানাজানি হয়—চেনা লোকের তো অভাব নেই, শুভানুধ্যায়ীরও নয়। ফলে দলের লোকেরা ধরেবেঁধে কলকাতা নিয়ে গিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে এনেছে। বাবা লাইন দিয়েই করাতে চেয়েছিল। 'তাহলে আর এ জন্মে হবে না', সোমনাথকাকুই বলেছিল। দীপেনও বলেছিল। এমনকী স্থানীয় বিধায়ক তরণকাকুও।

'কেন হবে না?' সেই তর্ক। 'যদি এত লোকের চিকিৎসা লাইন দিয়ে হয় তাহলে আমারও হবে। না হলে না হবে। ডাক্তারখানা আবার আলাদা আলাদা হবে কেন? লোকের জীবনের প্রশ্ন।' বাবা হাসপাতাল না বলে ডাক্তারখানা বলে।

সোমনাথকাকু কোনওকালেই বিতর্কের ধার ধারে না। 'যা করার কাজে করতে হবে, বেশি কথা বলে লাভ কী?

স্পষ্ট জীবনদর্শন। সে জন্যই তিনি এত সফল। ফটাফট ঝুপড়ি উচ্ছেদ, বাড়ি ভাঙা করা, বাড়িতে লোক ঢুকিয়ে দেওয়া, ধর্মঘট ডাকা বা ভাঙা—সব কিছুতেই তিনি বেজোড়। 'ভালয় ভাল না গেলে জাস্ট পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।' বাস্তবিকই বাবা কী করবে বুঝে ওঠার আগেই অ্যামবুলেন্স এসে যায়। সোমনাথকাকু বাবাকে আশ্বস্ত করে, 'সরকারি ডাক্তারখানাতেই যাচ্ছি।' ডাক্তারখানা কথাটার ওপর জোর দিয়ে সোমনাথকাকু কী বোঝাতে চাইল?

পরীক্ষানিরীক্ষাগুলিতে টাকা লাগেনি—কিন্তু প্রভাব লেগেছে। সামান্য কিছু টাকা খরচ অবশ্য হয়েছে। 'পার্টির লোকের জন্য এ দায়িত্ব পার্টির' বলার পরও অবশ্য চন্দ্রা সে টাকা জোর করে মিটিয়ে দিয়েছে।

পরীক্ষানিরীক্ষার পর বড় ডাক্তার দেখেন। অপারেশন করতে হচ্ছে। বড় ডাক্তার সমর্থক হিসাবে পরিচিত—অবশ্য এখন তো সমর্থকের অভাব নেই—যেখানেই যাও সেখানেই সমর্থক। তা সেই সহানুভূতিসম্পন্ন ডাক্তার অপারেশনের সাফল্য নিয়ে কোনও খারাপ ইঙ্গিত না দিলেও পরামর্শের ঢঙে বলে গেলেন, 'সম্ভব হলে ভেলোর বা বাঙ্গালোর নিয়ে যান।'

তারপর থেকে বাবার মেজাজ গরম। এবং রোগে চড়া। এমনিতেই তো দলে দলে লোকে ভেলোর ছুটছে। বাঙ্গালোর ছুটছে। বিদেশও ছুটছে। চিকিৎসা তো নয়, স্টেটাস দেখানো। বাবার জিদ যা হবার এখানেই হবে।

অপারেশনের তারিখ ছিল দু'সপ্তাহ পর। কিন্তু বিকেল থেকে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে এক্ষুনি এক্ষুনি কিছু একটা না করলেই নয়। এবং কিছু করা নিয়েই তর্ক-বিতর্ক। বাবাকে বাঁচানো দরকার। বাবা তো আর রাধু মন্ডল নয়। বাবা এখনও তুখোড় এক পাকা মাথার সংগঠক। জেলাকে চেনে নিজের চেয়েও বেশি। এলাকায় প্রবল জনপ্রিয়। বিশেষত প্রাচীনপন্থী বলে পরিচিত হয়ে যাওয়াটি দলের নবীনপন্থা নিয়ে সংশয়ীদের ওপর প্রভাব ফেলতে কাজে লাগে। 'এই তো দেখুন আমাদের...।'

চন্দ্রার এ কথা ভাবতেই কেমন কষ্ট হয়। যে-বাবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে খেতমজুর আন্দোলনের নেতা, যে বাবা জীবনটাই তুলে দিয়েছে সমাজের জন্য—অবশ্য সে সংশয়ী, সমাজ ও দলের মধ্যে সে পার্থক্য করে, বাবা করে না—সেই বাবার এমন অদ্ভুত ভূমিকায় সে পীড়িত বোধ করে। কর্তার ইচ্ছায় কর্মই যদি করতে হত তাহলে তো আরও অনেক কিছু করার ছিল—তার জন্য জীবন দেওয়ার দরকার কী? বাবা এখন শুধু নীতির ঘোষক মাত্র; নীতিপ্রণয়নে তার কোনও ভূমিকা নেই, মাথা নাড়া বা হাত তোলা ছাড়া, বা বড় জোর নিজের মনে বিড়বিড় করা ছাড়া; আর নীতি রূপায়ণের সামর্থ্য বা মানসিকতা কোনওটাই নেই। কিন্তু কে না জানে ঘোষকের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ?

বাবা চলো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আমরা অন্যভাবে বাঁচি। এ আমার কমবয়সি আবেগ হতে পারে। কিন্তু বাবা গো, আবেগটার কি কোনও দাম নেই? তুমি যে তুমি, আবেগ ছাড়াই কি তুমি এরকম? যদি মনের টানটাই না থাকত, শুধু কি পুঁথি পড়া জ্ঞানে তুমি এমন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে? আর কমবয়সি আবেগ যে কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে তার কথা তো তোমার কাছ থেকেই শোনা। সেই যে তোমাদের গ্রামের বড়লোক ক্ষমতাবান...আর সেই হতদরিদ্র অচ্ছুত খেতমজুরেরা...সেই কোন ছোটবেলায় তোমার চোখের সামনে জেগে ওঠে এক বীভৎস পৃথিবী যেখানে বড়লোকের জুতো গরিবদের পিঠের কালো চামড়াকে বেগুনি করে দিয়েছিল...আর তোমার বালক মনে বিদ্রোহ। বাবা গো একবার মনে করো। কিন্তু তারপর বাবা, তুমি কেন এরকম হয়ে গেলে?

কেন আমার বাবাকে লোকে শিখণ্ডীর মতো ব্যবহার করবে। কেন আমার বাবা আমার বাবা থাকবে না? বাবা! ও বাবা!

তন্দ্রার মধ্যে বাবা দেখতে পান অনেকগুলি মুখ। মৃতা পত্নী, চন্দ্রা, পরিতোষদা, বিভাস, সোমনাথ, দীপেন, রাধু মন্ডল। রাধু প্রশ্নবাচী তাকিয়ে আছে। স্থির। পরিতোষদার মুখে সবকিছু হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে আগলে রাখার বীভৎস আকৃতি।

সোমনাথ নিস্পৃহতার ভান করে; কিন্তু চিন্তা লুকোতে পারে না।

দীপেন হিপোক্রিটাসের শপথ পড়ে যাচ্ছে। বিভাস ভুলে যেতে চাইছে শিখদের ওপর নিধন চালানোর সময় তার অসমসাহসী কৃতিত্ব; বিভাসের মুখে অনন্য ভীরুতা।

চন্দ্রা যেন অসংখ্য মেঘের ভেতর নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নাময়ী।

চন্দ্রার ভবিষ্যৎ কী?

এত বছর পর মনে পড়ছে চন্দ্রার ভবিষ্যৎ কী? আমাকে দয়া দেখিয়েছিলে বলে সারাজীবন মনস্তাপে ভুগলে। ওগো, আজ আমি সত্যিই দয়াভিক্ষা করছি। আমার মেয়েটার কী হবে? এখনও যে বালিকামাত্র। তোমার গুরুগম্ভীর সংসারে তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ছাপ পড়লেও বা। সবে জীবন শুরু করেছে। চাকরিতে ঢুকেছে বটে. কিন্তু চাকরি-ই তো সব নয়—ওকে কে দেখবে? না গো, পরিতোষদাদের ভয় আমি পাচ্ছি না। সে চন্দ্রা নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু সে তো দেহে? মনের কী হবে? তার ব্যক্তিজগতের কী হবে? ওগো দয়া করো।

বাবার ধড়মড় করে উঠে বসার শব্দেই চন্দ্রা জেগে ওঠে। সে মাদুর পেতে মেঝেতে শুয়েছিল। নিজের ঘরে যায়নি।

'কী হল বাবা গো? জল খাবে? কষ্ট হচ্ছে বাবা?'

'না রে কষ্ট হচ্ছে না। দে একটু জল দে। তোর মাকে স্বপ্ন দেখলাম।'

চন্দ্রা বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, 'বাবা, একটা কথা বলি?'

'হ্যাঁ মা, বল। তোর কথা তো শোনাই হয়নি কখনও।'

'ছিঃ বাবা ও কথা বোলো না। আমার মন খারাপ হয়। না বাবা, যে কথা বলেছিলাম', সে বাবার কানের কাছে প্রায় ফিসফিস করে বলে, যেন দেওয়ালের টিকটিকিটাও না শুনতে পায়, 'চলো আমরা বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করাই। লক্ষ্মী বাবা আমার। আমার একটা কথা শোনো। খরচের জন্য ভেব না। আমি তো লোন পেয়ে যাব। তোমাকে কারও দয়া নিতে হবে না।

'রাধুর তো কেউ ছিল না যে টাকার জোগাড় করতে পারত।' কথা ক'টি খুবই অস্পষ্ট।

চন্দ্রা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। নীরবে। কিন্তু তার মধ্যেই বাবার অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হয়—

তোমার বহিরঙ্গে কোনও আঁচ পড়বে না বাবা। তুমি, তোমার বেঁচে থাকাটাই সব, লোকে দেখতে যাবে না তুমি কী ভাবে বেঁচে এলে? তা যদি দেখত, তাহলে ভাব তো ক'জন বিধায়ক নির্বাচিত হতে পারত? তাছাড়া এসব নিয়ে ভাববার সময়ই বা কার আছে? বহু বড় বড় জয়ের তলায় তোমার এই ক্ষুদ্র পরাজয় চোখেই পড়বে না...শুনতে পাচ্ছ জয়ধ্বনি? ...রাধুকাকার যন্ত্রণা বহুকাল চাপা পড়ে গেছে...কেউ শুনতে পাবে না বাবা।

অস্বস্তি হয়। কিন্তু চন্দ্রার সরব হয়ে ওঠাতে শান্তি পান—কিছুটা বা আত্মসন্তুষ্টি। 'বাবা আমার কাছ থেকে তোমাকে কিছু নিতে হচ্ছে না। আমি তো তোমারই মেয়ে, তুমিই তো আমাকে আমি করে গড়েছ। আমি যে এই সহস্র সূর্যের উদ্দীপ্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার সুযোগটুকু নিইনি তা তো আমার নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার নয় বাবা। তোমারই সুরক্ষাবলয়ে আছি বলেই তো...'

জি টি রোডের ওপর দিয়ে ছুটে চলা ট্রাকের আওয়াজ। বাইরে ফিকে অন্ধকার। মোড়ের ল্যাম্পপোস্টের আলোটা ভাঙা। পাশের বাড়ির পাঁচিলের ধারে নারকেল, আম আর লেবুগাছের ভিন্ন ভিন্ন পাতার ছায়ায় ভিন্ন ভিন্ন ছাপ। আকাশে অজস্র তারা—তার মাঝে এক ফালি চাঁদ তার নিষ্প্রভতা নিয়েও বিপুল উদ্যমে চলে ফেরে।

বাবা ঘুমিয়ে পড়ে। চন্দ্রা পারে না। তার ব্যক্তিগত বোধ তাকে অন্য এক সামাজিক তাড়নায় ছিন্নভিন্ন করে। এই মুহূর্তে ঘুরপথ পাওয়া গেলেও সর্বদা সেটা পাওয়া যাবেই এমনকী নিশ্চয়তা আছে? সে নিজেই এক প্রশ্নচিহ্ন হয়ে নিজের সামনে দাঁড়ায়।

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওই দু'জনের মধ্যে একজন অত্যন্ত প্রথিতযশা অধ্যাপক। তাঁর কাব্যময় বাচনভঙ্গি, তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাস ছিল শুনবার ও মনে ধরে রাখার মতো। প্রৌঢ়ত্বের দরজায় পৌঁছেও চলনে ও বলনে তিনি ছিলেন প্রখর তরুণ। ওই ছাত্রী এই অধ্যাপকের ক্লাস-লেকচারে মুগ্ধ বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছিল। সে ক্লাসের বাইরে করিডরে, প্রফেসরস কমন রুমে গিয়ে পাঠ্য বিষয়ে ওই অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলত প্রায়শই। পরে সে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে লাগল এবং অধ্যাপকের স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গেও ছাত্রীটির অন্তরঙ্গতা জন্মাল। কিন্তু এম এ ফাইনাল পরীক্ষার আগে অধ্যাপক তাঁর এই ছাত্রীকে অন্য কোনও স্থানে দেখা করতে বললেন। এখানেই মেয়েটির শ্রদ্ধানুভূতি ধাক্কা খেল। সে এই অধ্যাপককে এড়িয়ে যেতে আরম্ভ করল। পরিণতিতে মেয়েটির অভিযোগ, Political Thoughts in Ancient India পেপারে তাকে ১০/১২ নম্বর কম দেওয়া হয়েছে। ফলে সে First Class থেকে বঞ্চিত। আমি বেঞ্চে বসে শুনছি ডি এন ব্যানার্জি ওর নাম, রোল নম্বর চেয়ে নিলেন এবং মেয়েটিকে কয়েকদিন পরে দেখা করতে বললেন। এরপর মেয়েটি বেরিয়ে যাবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'তুমি তাহলে খুব কাছেই ছিলে?' আমি বুঝতে পারলাম তিনি ধরতে চাইছেন যে আমি মেয়েটির সব কথা শুনেছি কি না। আমি জবাব না দিয়ে একটু হাসলাম। আমি নোট বুক দেখে ডি এন ব্যানার্জিকে জানালাম, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য হয়েছে, এবার এশিয়ার পরিস্থিতি। তিনি চীনের অবিরাম গৃহযুদ্ধ, জাপানের অবিশ্বাস্য অভ্যুত্থান, এশিয়া ভূখণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্প্রসারণ, যুদ্ধ অবসানে চীনে ও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট বিপ্লবের জয়যাত্রা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি যখন ওই বিষয় আমাকে বোঝাচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাছে কোনও বই ছিল না। তিনি তাঁর স্মৃতি ও ক্লাসে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকেই আমাকে বোঝাচ্ছিলেন।

আমি ডি এন ব্যানার্জির ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু আমার চোখে তখনও ওই মেয়েটি ভাসছে। ওর অভিযোগ আমার মনে অনুরণিত হচ্ছে, সেটাই একজন রিপোর্টারের পক্ষে স্বাভাবিক। আমি আশুতোষ বিল্ডিংয়ের ডি এন ব্যানার্জির ঘর থেকে বেরিয়ে দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের বারান্দায় ক্যাশ কাউন্টারের সামনে কারও একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রং রুমের (Strong Room) একজন অতি দক্ষ অফিসার অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের বারান্দা পেরিয়ে দ্রুত আশুতোষ বিল্ডিংয়ের দিকে মোড় নিলেন। আমার মনে তক্ষুনি একটা সন্দেহ উঁকি দেওয়ায় আমি অপর্ণাবাবুকে অনুসরণ করলাম। দ্বারভাঙা ও আশুতোষ বিল্ডিংয়ের ভৌগোলিক অবস্থান যাদের মনে আছে তাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে যে এই দুটো বাড়ির যোগসূত্র হল সিমেন্টের একটি পাটাতন। পাটাতন পেরলেই ডানহাতে Statistics বিভাগের প্রধান ড. পূর্ণেন্দু কুমার বসুর ঘর। সেটি ছাড়িয়ে বাঁদিকে মোড় নিলেই প্রথম ঘরটি ছিল ডি এন ব্যানার্জি। অপর্ণাবাবু পাটাতন পেরিয়ে ডি এন ব্যানার্জির ঘরের দিকে ঘুরতেই আমি বুঝে নিলাম যে আমার অনুমান ঠিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের Strong Room-এ কোনও টাকা-পয়সার বালাই ছিল না। ওখানে ছাত্রদের পরীক্ষার যাবতীয় রেকর্ড সুরক্ষিত থাকত। অপর্ণাবাবু এখানে কাজ করতেন। খুব ন্যায়পরায়ণ ও দৃঢ়চেতা অফিসার বলে তাঁর সুনাম ছিল। ডি এন ব্যানার্জি অপর্ণাবাবুকে ওই ছাত্রীটির সংশ্লিষ্ট পেপারের উত্তরপত্রের খাতাটি নিয়ে আসতে বলেছিলেন। খাতাটি হাতে নিয়ে তিনি মেয়েটির লেখার ধরন পরীক্ষা করে নিলেন। পরে তিনি Ancient Indian History and Culture বিভাগের দু'জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ড. বিনয় চন্দ্র সেন ও ড. কল্যাণ গাঙ্গুলিকে (এই দু'জন অধ্যাপক Political Thoughts in Ancient India বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন) দিয়ে খাতাটি যাচাই করে নিলেন যে মেয়েটিকে under marking করা হয়েছে কি না। এই দু'জন অধ্যাপকের মতামত মেয়েটির অনুকূলে থাকায় ডি এন ব্যানার্জি ছাত্রীটিকে 'রিভিউ' করার জন্য দরখাস্ত করতে বললেন। পরে তিনি ড. কল্যাণ গাঙ্গুলিকে দিয়ে খাতাটি

আনুষ্ঠানিকভাবে 'রিভিউ' করিয়েছিলেন। ফলে মেয়েটি আগের নম্বরের চেয়ে ৯-১০ নম্বর বেশি পাওয়াতে তার First Class পাওয়ার পক্ষে কোনও বাধা রইল না। এই ঘটনাটি জেনেও আমি খবরের কাগজে রিপোর্ট করিনি। সন্তর্পণে নিজের মনে লুকিয়ে রেখেছি। কারণ আমি রিপোর্ট করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেরা ধরে নিতেন যে ডি এন ব্যানার্জি আমাকে খবরটি দিয়েছেন। এতে তাঁর অমর্যাদা হত। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে এই বিষয়ে কিছুই বলেননি। কিন্তু ঘটনাটি আমি জানতে পেরেছি তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের ভিত্তিতেই। সুতরাং এটি লিখলে তাঁর কাছে আমার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হত—আমার বিবেচনায় এটাই হল Continuity of relationship। ঠিক অর্ধশতাব্দী পরে আমি মন খুলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাটি লিখলাম। কারণ আমার মনে হয় যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মুগ্ধ করে রাখার মতো পড়ানো নিশ্চয়ই শিক্ষকের একটি বড় গুণ। কিন্তু তা কখনওই একমাত্র গুণ হতে পারে না। ছাত্রদের প্রতি নিরপেক্ষতা এবং পরীক্ষার খাতায় ন্যায়বিচার, রাজনৈতিক ও সেক্সজনিত মতলবের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি অবশ্যই অধ্যাপকদের অন্যতম প্রধান গুণ বলে ধার্য হওয়া উচিত। আমি ডি এন ব্যানার্জি সম্পর্কে এতখানি কথা লিখলাম এজন্য যে ১৯১০-১২ সাল থেকে যদি বাংলার শিক্ষাপ্রসারের ইতিহাসের দিকে একবার ফিরে দেখি তাহলে অনিবার্যভাবে একথা বলতে হবে, যে উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা বাংলাকে অর্থনীতি শিখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্যার জাহাঙ্গির কয়েজি (Sir Jehangir Coyaji), স্যার মনোহরলাল, ড. জে সি সিংহ, ড. পি এন ব্যানার্জি ('মিন্টো' অধ্যাপক), ড. জে পি নিয়োগী, ড. এইচ এল দে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. অমিয় দাশগুপ্ত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও ড. ভবতোষ দত্তের নাম যেমন উল্লেখযোগ্য ঠিক তেমনই বাঙালিকে যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে কমপক্ষে দুটি প্রজন্ম ধরে শিক্ষিত করে তুলেছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি (ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী (ঢাকা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সুবিমল মুখার্জি (কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক জে কে ব্যানার্জি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক রমেশ ঘোষ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সন্তোষ চ্যাটার্জি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। বাঙালিকে অনিবার্যভাবে এঁদের কথা মনে রাখতে হবে। ড. এইচ এল দে (পুরো নাম যতদূর আমার স্মরণে আছে হীরেন্দ্র লাল দে) সম্ভবত প্রথম ভারতীয় অর্থনীতিবিদ যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সহযোগিতার জন্য যখন ECAFE ('একাফে') গঠিত হল, তখন ড. দে ওই সংগঠনের ভারতীয় সদস্য মনোনীত হন। পরে তিনি আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে (IMF) ভারতীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক পরিমল রায় বিশ্বঅর্থনীতির প্রাঙ্গণে পদার্পণ করেছিলেন। ১৯৫০ বা তার পরবর্তী যুগে জন্ম নেওয়া বাঙালিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক পরিমল রায়ের নাম হয়ত শোনেননি। এমন একজন বিদগ্ধ বাঙালি বাঙালির জীবন-ইতিহাসে বিরল। তিনি জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করতে পারেননি। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে (IMF) ভারতীয় সদস্য থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ওয়াশিংটনে মারা যান। তিনি 'ইদানীং' (প্রকাশক এম সি সরকার) নামের মাত্র একটি গ্রন্থ রচনা করেই বাংলার প্রবন্ধসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। মুজতবা আলির অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু এই অধ্যাপক পরিমল রায় মুজতবা আলির বহু রচনায় দীপ্যমান হয়ে আছেন। বিশেষ করে নীরদ চৌধুরী সম্পর্কে এঁদের বাক্যবিনিময় বাঙালি পাঠককে হাসাতে হাসাতে মাটিতে লুটিয়ে ফেলবে। অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি অবশ্য গুরুগম্ভীর পাণ্ডিত্যের মানুষ ছিলেন। দেশবিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়েই তিনি ভারতীয় সংবিধানের খসড়ারচনা কমিটির বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য ছিলেন। ওই সময় ওই প্যানেলের অন্যতম সদস্য ছিলেন সেই সময়কার বিশ্বের সেরা সংবিধান বিশেষজ্ঞ স্যার আইভর জেনিংস। তিনি তখন কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধানের ধারা ভিত্তিক আলোচনা এবং বিশেষজ্ঞ সদস্যদের বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি সেই সময়কার Modern Review পত্রিকায় অনেকগুলি ধারাবাহিক লেখা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে হেগ শহরে International Political Science Congress নামে একটি সংগঠনের পত্তন হয়েছিল। তিনি ওই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন (১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স কোর্স চালু হয়।)

রিপোর্টার হিসাবে আমি আমার সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি শিক্ষা ও অশ্ব ধর্ম-সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র বৈরিতার গণ্ডিকে আদৌ গ্রাহ্য করে না। এরকম কয়েকটি নজির আমার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে এবং সেগুলি আমি এই প্রজন্ম ও ভবিষ্যতপ্রজন্মের বাঙালিদের জন্য রাখছি। ১৯৫৫ সালের শেষভাগে এই উপমহাদেশের ইংরাজি সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক অমরনাথ ঝা (Amar Nath Jha) মাত্র ৫৮ বছর বয়সে মারা গেলেন। তিনি লাহোর

গভর্নমেন্ট কলেজ, এলাহাবাদের মুয়ির কলেজে (Muir College) ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারও হয়েছিলেন। তিনি যে সময়ে মারা যান সে সময় কাশ্মীর-প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক আবার এক তিক্ততম জায়গায় ছিল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক কমিটিতে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে রুদ্ধ বাকবিতণ্ডা নিত্যদিনের সংবাদ ছিল। খবরে এমন সব কথাও শোনা যেত যে নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনের দোকানে বাজারে ভারত ও পাকিস্তানি অফিসাররা মুখোমুখি হলে কেউ কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতেন না। ওই সময় রাষ্ট্রসংঘের পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন বিখ্যাত জেড এ বোখারি (Z. A. Bokhari)। এই বোখারিসাহেব ১৯৪৪-৪৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে সে সময়কার ভারতে সংবাদ-শিরোনামে ছিলেন (যাযাবর লিখিত 'দৃষ্টিপাত' বইটিতে এই বোখারিসাহেব সম্পর্কে কয়েকটি সুরসিক মন্তব্য আছে)। এই বোখারিরা তিন ভাই অধ্যাপক অমরনাথ ঝার ছাত্র ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধিদলে Indian Foreign Service-এর অফিসারদের মধ্যেও অনেকে অধ্যাপক ঝার ছাত্র ছিলেন। এই ছাত্ররা সকলেই অমরনাথ ঝার আকস্মিক মৃত্যুতে মর্মাহত। রাষ্ট্রসংঘে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁরা তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাঁরা তাঁদের এই প্রিয় শিক্ষকের মৃত্যুর খবর পেয়ে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তারপর অন্যান্য বিদেশি কূটনীতিবিদদের এক অভাবনীয় বিস্ময়ে ফেলে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা যুক্তভাবে এক শোকসভার আয়োজন করে অধ্যাপক অমরনাথ ঝার জন্য সম্মিলিতভাবে অশ্রুবর্ষণ করলেন রাষ্ট্রীয় বৈরিতার গণ্ডি অতিক্রম করে। এই সময় অধ্যাপক অমরনাথ ঝার মৃত্যুর ওপর Statesman পত্রিকায় মনে রাখার মতো একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটি লিখেছিলেন রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মামুদ হোসেন। ড. মামুদ হোসেন অধ্যাপক অমরনাথ ঝার ছাত্র ছিলেন সম্ভবত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রায় এক কলম দীর্ঘ এই চিঠিটির একাংশে লেখা ছিল .....Professor A N Jha is dead. But hundreds of his students shall treasure his class teaching through out their life.....একজন শিক্ষকের জীবনে এবং মৃত্যুতে এর চেয়ে বড় পাওনা আর কী-ই বা হতে পারে? ড. মামুদ হোসেন ১৯৫৬-৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেখা করতে। সেই প্রসঙ্গে পরে আসব।

অধ্যাপক অমরনাথ ঝার কথা লিখতে গিয়ে আর একজন অধ্যাপকের নাম মনে এল। এই উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি শিক্ষাজগতের চেয়ে অনেক বেশি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক টর্নাডো হিসাবে। তিনি আল্লামা মাশরিকি (Allama Mashriqi), নিখিল ভারত খাকশার পার্টির জন্মদাতা। কিন্তু অধ্যাপনার জগৎ থেকে তাঁর রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ ভারতীয় শিক্ষা জগতের যে কত বড় ক্ষতি করেছিল, তা গণিতবিদ্যার এই মহাপণ্ডিতের জীবন সম্পর্কে যাঁরা নিতান্ত অল্পই জানেন, তাঁরাও স্বীকার করবেন। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসের এক দিন Morning News পত্রিকাটি দেখছিলাম। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের আগে এই পত্রিকাটি কলকাতা ও করাচি থেকে যুগপৎ প্রকাশিত হচ্ছিল। এর মালিক ছিলেন এক ধনী গুজরাতি মুসলমান পরিবার, যাঁরা মহম্মদ আলি জিন্নার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে কথিত। এই কাগজেই বিখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের সাংবাদিক-জীবনের সূচনা। আমার দেখা সেরা রিপোর্টারদের অন্যতম খগেন দে সরকার ১৯৪৫-৪৬ সালে এই কাগজের চিফ রিপোর্টার ছিলেন। দেশবিভাগের পর এই পত্রিকাটির কলকাতা অফিস ঢাকায় স্থানান্তরিত হলে সেখান থেকে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। আমরা কলকাতার রিপোর্টাররা এই কাগজের ঢাকা সংস্করণই প্রতিদিন পেতাম। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসের ওই কাগজটিতে একদিনের একটি সংবাদে আমার চোখ আটকে গেল। সংবাদটি ছিল আল্লামা মাশরিকির মৃত্যুসংবাদ। আমরা যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে কিশোর বয়সে খবরের কাগজ পড়তে শিখেছি, তাদের কাছে আল্লামা মাশরিকি একটি বিশ্রুত নাম। তিনি নিখিল ভারত খাকশার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এই পার্টির সদস্যদের পোশাক ছিল খাকি হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফ শার্ট, শার্টের সামনে ও পিছনে 'বেলচা'র ছাপ—ওই ছাপটা হল পার্টির প্রতীক। ১৯৪৬ সালে এই পার্টি সংবাদ-শিরোনামে এসে যায়। ওই সময় এই পার্টির অনুগত সদস্যরা বোম্বাই, লাহোর ও দিল্লিতে তিন তিনবার মহম্মদ আলি জিন্নার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। দিল্লিতে জিন্নাসাহেব কয়েক ইঞ্চির জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর খাকশার পার্টিকে ভারত সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং লাহোরে আল্লামা মাশরিকিকে গ্রেফতার করা হল। সুতরাং 'মর্নিং নিউজ'-এর পাতায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেখে আমার স্মৃতি অনেক পিছনে চলে গেল। কিন্তু পত্রিকাটিতে তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্তসার কয়েকবার পড়েও আমার সাধ

মিটল না। কারণ তাঁর ওই জীবনীতে এরকম কয়েকটি লাইন ছিল—'লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে আল্লামা মাশরিকি গণিতশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যখন অনার্স ক্লাসে পড়ানো শেষ করে মাথার টুপিটি আবার লাগিয়ে ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে যেতেন, তখন তাঁর হিন্দু-মুসলমান-শিখ ছাত্ররা হুমড়ি খেয়ে তাঁর পা স্পর্শ করতে চাইত। দীর্ঘকায় এই অধ্যাপক তখন তাঁর দুই বাহু প্রসারিত করে হুমড়ি খেতে উদ্যত ছাত্রদের বুকে জাপটে ধরে তারপর হেসে ছেড়ে দিতেন...।' এই কয়েকটি লাইন আমাকে অধ্যাপক আল্লামা মাশরিকি সম্বন্ধে ভীষণ কৌতূহলী করে রেখেছিল দীর্ঘদিন। মাত্র কয়েক বছর আগে (আই সি এস) অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'যুক্তবঙ্গের স্মৃতি' গ্রন্থটিতে ময়মনসিং জেলার নেত্রকোনা মহকুমার এস ডি ও আখতার হামিদ খান (Akhtar Hamid Khan ICS) নামের একজন আই সি এস অফিসারের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। পড়তে পড়তে হঠাৎ এক জায়গায় আল্লামা মাশরিকির নাম। আই সি এস আখতার হামিদ খান হলেন আল্লামা মাশরিকির জামাতা। অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, সিভিল সার্ভেন্ট হিসাবে আখতার হামিদ খান উচ্চমানের একজন অফিসার। কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাঁর মধ্যে ছিল না। কিন্তু যেহেতু তিনি আল্লামা মাশরিকির জামাতা, সেহেতু তিনি বাংলার মুসলিম লিগ শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) শাহিদ সুরাবর্দির খুবই বিষনজরে ছিলেন। অন্নদাশঙ্কর আখতার হামিদ খানের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ফৌজদারি দণ্ডবিধির (Criminal Procedure Code) প্রতি তাঁর আনুগত্যের উল্লেখ করে লিখেছেন যে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা ও অক্টোবর মাসে নোয়াখালির দাঙ্গার পর পূর্ববাংলার বেশ কিছু জেলায় মুসলিম লিগের সক্রিয়কর্মী ও গুন্ডারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে আরম্ভ করে। ময়মনসিং জেলার নেত্রকোনা শহরে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সূচনা-মুহূর্তেই এস ডি ও আখতার হামিদ খান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াতে সচেষ্ট লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের আটক করেন। এই ঘটনায় মুসলিম লিগ নেতারা বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দিসাহেব আখতার হামিদ খানের ওপর খুব রুদ্ধ হন এবং তাঁকে চিফ সেক্রেটারি মারফত রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ডেকে পাঠান। চিফ সেক্রেটারি তাঁকে শাসকদলের সঙ্গে কিছুটা আপস করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু হামিদ খান তাঁর অবস্থান থেকে এক ইঞ্চিও সরে আসতে রাজি হননি। পরিস্থিতি এমন এক জায়গায় চলে যায় যে তেজোদৃপ্ত আখতার হামিদ খান আই সি এস চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লাহোরে ফিরে যান। পরবর্তী সময়ে এই আখতার হামিদ খান পাকিস্তানে একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

যা হোক আল্লামা মাশরিকি সম্বন্ধে আমার জানা সব কথা এখনও বলা হয়নি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের 'র‍্যাংলার' এবং Indian Education Service-এর এই প্রথিতযশা অধ্যাপক আল্লামা মাশরিকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে মুখে আকস্মিকভাবে তাঁর নিজের গড়ে তোলা মর্যাদার জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন খাকশার পার্টি গঠন করে। ১৯৭০ থেকে ১৯৯০-এর যুগের মধ্যে পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও লাহোর গর্ভনমেন্ট কলেজ ওই অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষটি সম্বন্ধে কিছু গবেষণামূলক কাজ করেছে। এসব কাজ থেকে জানা যায় যে তিনি যে সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, সে সময়ে তাঁর সমসাময়িক আরও দু'জন প্রতিভাবান ভারতীয় ছিলেন। তাঁরা হলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও সি ডি দেশমুখ। কিন্তু ছাত্র হিসাবে মাশরিকি সাফল্যের যে চূড়ায় পৌঁছেছিলেন, মহলানবিশ ও দেশমুখ সেই পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। আল্লামা মাশরিকির সাফল্যের ও প্রতিভার কিয়দংশ আমি তুলে ধরছি :

(Mashriqi : Scholar and Founder of the Khaksar Movement)

Punjab University : Master of Arts (M.A.) in Mathematics; Degrees from Christ's College, Cambridge University, England (1907-1912) : Bachelor of Arts (B.A.). Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.E.), Bachelor of Oriental Languages (B.O.L.). Four Triposes with distinction in five years (at Cambridge University from 1907-1912) in Mathematics, Natural Sciences, Mechanical Sciences, and Oriental languages. Titles awarded at Cambridge University : Wrangler, Foundation Scholar and Bachelor Scholar; Fellow of the Royal Society of Arts (F.R.S.A.) (1923). Fellow Geographical Society (F.G.S.; Paris, France), Fellow of Society of Arts (F.S.A.; Paris, France), Member of the Board at Delhi University, President Mathematical Society. Authored Tazkirah and many other books, Member International Congress of Orientalists, President All World's Faiths Conference (1937), A delegate to Palestine World Conference, Gold medalist World Society of Islam, Head of the delegation for the Motamar-I-Khilafat Conference at Cairo, Member of Indian Education Service (I.E.S.), Under Secretary of Education of undivided India.

আল্লামা মাশরিকির জন্ম ২৫ আগস্ট ১৮৮৮, মৃত্যু ২৭ আগস্ট ১৯৬৬। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পর আল্লামা মাশরিকির মতো সর্বপ্রাসী প্রতিভা নিয়ে আর কতজন ভারতীয় জন্মেছিলেন? তার আমরা কতটুকুই বা খবর রাখি!

আমি আমার সাংবাদিক জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় একটা সত্যকে বারবার বড় হতে দেখেছি ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও হিন্দু-মুসলমানের তিক্ততার মধ্যেও। এই সত্যটা হল শিক্ষা এবং ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। পদার্থ বিজ্ঞানের মোটামুটি একজন পরিচিত অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরি ১৯৩০-এর যুগের গোড়ায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার ছাত্র ছিলেন। দেশবিভাগের কয়েক বছর আগে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। দেশবিভাগের পরও কয়েক বছর তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হন। ওই রকম একটা সময়ে তিনি এক সরকারি কাজে বিদেশে গিয়েছিলেন। তিনি দিল্লি ফিরছিলেন একটি বিখ্যাত বিদেশি এয়ারলাইনসে। বিমানটি করাচি বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পরই একটি বড় ধরনের ইঞ্জিন বিভ্রাটের সমস্যায় পড়ল। ফলে সব যাত্রীদের Transit lounge-এ নিয়ে এলেন পাকিস্তানের অসামরিক বিমান পরিবহন কর্তারা। বি ডি নাগচৌধুরিও অন্যান্য যাত্রীদের মতো নির্দিষ্ট স্থানে এলেন। এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রথা অনুযায়ী যাত্রীদের সিকিউরিটি প্রহরায় রাখা হয় এবং প্রত্যেক যাত্রীর পাসপোর্ট চেকিং হয়ে থাকে। এই চেকিং-এর সময় Pakistan Civil Aviation-এর একজন পদস্থ অফিসার অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরিকে শনাক্ত করে ফেলে সরাসরি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললেন—স্যার, আমি এলাহাবাদে আপনার ছাত্র ছিলাম.....অমুক বছর অমুক ব্যাচ, আমার এই নাম। .....। অধ্যাপক নাগচৌধুরী ধীরে ধীরে তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রকে চিনতে পারলেন। এক-দেড় বছর আগে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দু'দেশের সম্পর্কও মোটেই সুখকর নয়। ওই ছাত্রটি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষককে জানালেন যে এই বিমানটি যাবে না। যাত্রীদের নিতে সিঙ্গাপুর থেকে একটি 'রিলিফ' বিমান আসবে। অন্তত দশ-বারো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এই অফিসারটি অধ্যাপক নাগচৌধুরিকে দেখাশোনার দায়িত্ব অন্য কয়েকজনের ওপর দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চলে গেলেন। দেড়-দু'ঘণ্টা পরে ছাত্রটি আরও জনাসাতেক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের প্রাক্তন শিক্ষকের কাছে ফিরে এলেন। এঁরা সকলেই বারো-পনেরো বছর আগে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং সেখানে বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদে রয়েছেন। তখন এই ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ অনুমতি আদায় করে অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরিকে করাচি শহরে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের কারও একজনের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বি ডি নাগচৌধুরি দিল্লিতে ফিরে দিল্লির কয়েকজন সাংবাদিককে তাঁর এই সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। দিল্লির বেশ কয়েকটি কাগজে তখন এই সংবাদটি বের হয়েছিল। আর একটি ঘটনা ঘটেছিল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পাকিস্তানি পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালমকে নিয়ে। তিনি ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ছাত্রজীবনে লাহোরে একটি সরকারি স্কুলে একজন বাঙালি হিন্দু শিক্ষকের কাছে অংক শিখতেন। এই শিক্ষক অনিলেন্দ্র গাঙ্গুলিকে আবদুস সালম নোবেল পেয়েও জীবনে বিস্মৃত হননি। ১৯৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এই নোবেলবিজ্ঞানী কলকাতায় আসেন। তিনি তাঁর কলকাতা অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে চক্রবেড়িয়া রোডের বাড়িতে গিয়ে তাঁর লাহোরের মাস্টারমশাই অনিলেন্দ্রবাবুকে জড়িয়ে ধরেন। ১৯৮৬ সালের পর আবদুস সালম তাঁর এই বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ শিক্ষকের খাটে বসে আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন, 'স্যার, সেদিন আমাকে বকে রাগারাগি করে কান টেনে আমাকে অংক শিখিয়েছেন। তাই আমি অংকে পোক্ত হতে পেরেছি।' ১৯৮১ সালের ১৯ জানুয়ারি আবদুস সালম তাঁর মাস্টারমশাই অনিলেন্দ্রবাবুর কাছে প্রকাশ করলেন 'নোবেল' পাওয়া ছাত্রটি কত বড় 'নোবল'।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে ইতি টানবার আগে আমি আমার ওই সময়কার জীবনের সঙ্গে যুক্ত দু'জন কর্মচারীর নাম উল্লেখ না করে পারব না। এঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন পিওন। একজনের নাম ফেকন (Fekon) ও অন্যজনের নাম মফিজ (Mafiz)। ফেকনকে আমি 'ফেকনদা' বলে ডাকতাম। ফেকন বিহারের দ্বারভাঙা অঞ্চলের লোক। বালক বয়সে ফেকনদা কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের বাড়িতে কাজ করতে আসে। তখন তার বয়স ১২/১৩ বছর। শাস্ত্রীমহাশয় যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রথম প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব নেন, তখন ফেকনও তাঁর সঙ্গে ঢাকা চলে যান। সেটা সম্ভবত ১৯১৮ কিংবা ১৯১৯ সাল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতদিন ছিলেন মনে নেই। তবে তিনি ১৯৩১ সালে মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর আগেই ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ফেকন ঢাকাতেই থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয় চলে আসার পর ড. মহম্মদ

শহিদুল্লাহসাহেব ফেকনদাকে তাঁর নিজস্ব পিওন হিসাবে নিয়ে নেন। শহিদুল্লাহসাহেবের হাত ঘুরে ফেকন চলে যায় অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ড. এইচ এল দে-র কাছে। এখানে কাজ করার সময় ফেকনদা অধ্যাপক ডি এন ব্যানার্জি ও অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন অর্থনীতি বিভাগ থেকে বের করে এনে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে পৃথক বিভাগের মর্যাদা দেওয়া হল, তখন এই বিভাগের প্রথম প্রধান অধ্যাপক হিসাবে ডি এন ব্যানার্জি ফেকনদাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। সেই থেকে ফেকনদা ডি এন ব্যানার্জির সঙ্গে ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছে। ফেকনদা বিহারের লোক হয়েও অনানুকরণীয় ঢাকাই ভঙ্গি এমনকী ঢাকার 'কুট্টি' বাংলা বলতে পারত। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল বাংলার একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ফলে অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই কাছাকাছি গণ্ডির মধ্যে থাকতেন। ওই গণ্ডি ছিল পুরনো পল্টন, সেগুন বাগিচা, রমনা। বলতে গেলে রমনাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি। ফেকনদা এই চৌহদ্দির সব খবর রাখত। কোন অধ্যাপক থলের বদলে স্যাটকেশ নিয়ে বাজার করে সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে বাড়ি ফিরতেন, তারপর প্রতিবেশী অন্য অধ্যাপক-পত্নীর তাই নিয়ে রসিকতা, এসব ফেকনদার বছর কুড়ি পরেও মুখস্থ ছিল। ফেকনদার কাছে গল্প শুনতাম এক ভাইস চ্যান্সেলারের স্ত্রীর কৃপণ স্বভাবের কথা। ঢাকা শহরের তাবৎ ভিখারি ওই ভদ্রমহিলাকে নাকি চিনত। ফলে ভিখারিরা ভাইস চ্যান্সেলারের বাড়ির ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলত। এরকম অনেক মজার ঘটনা ফেকনদার মুখ থেকে শুনতে পেতাম। আর যেহেতু ফেকনদা 'ঢাকাই কুট্টি' বাক্যবিন্যাসে পারদর্শী ছিল, সেহেতু আমার তা শোনার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত।

একদিন আশুতোষ বিল্ডিঙের করিডরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ফেকনের বাচনভঙ্গি আস্বাদন করছি, এমন সময় অবিভক্ত ও বিভক্ত ভারতবর্ষের অর্থনীতিশাস্ত্রের ইতিহাসের কিংবদন্তি এক অধ্যাপকের মেয়ে আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে মেয়েটির যথেষ্ট পরিচয় ছিল। মেয়েটি প্রেসিডেন্সি কলেজে অর্থনীতি পড়ত। মেয়েটির চোখ মুখ খুব সুন্দর। মেয়েটি আমায় দেখে একটু হেসে আপনমনে চলে যাচ্ছিল। ফেকনদা তৎক্ষণাৎ আমাকে প্রশ্ন করল, 'মাইয়াটা কে? তোমারে দেইখা চক্ষে চক্ষে হামল?' আমি জবাব দিলাম, 'প্রফেসার অমিয় দাশগুপ্তের মেয়ে।' ফেকন জোরের সঙ্গে বলল, 'ঢাকার অমিয় দাশগুপ্ত? ডাকো অরে ডাকো।' ফেকনদার শেষের কথাগুলি অলকানন্দার কানে যেতেই সে ফিরে আমার দিকে চাইল। আমার ইশারায় এগিয়ে এল। আমি অলকানন্দাকে ফেকনদার পরিচয় দিয়ে বললাম, 'ঢাকায় তোমার বাবার কাছেও কাজ করেছে ফেকনদা, তাই তোমাকে দেখতে চাইছে।'

এবার ফেকনদা অলকানন্দাকে তাক লাগিয়ে দিল। ডি এন ব্যানার্জির নেমপ্লেটটা দেখিয়ে ফেকন বলল, 'আমার এই স্যার তোমার বাবার বিয়ের বরকর্তা ছিলেন। আর তোমার মায়ের আশীর্বাদের গয়নাগাটি, বেনারসি কাপড়-চোপড় সব ছিল আমার জিম্মায়। মাঝরাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমার ছাড়ল। ভোরে স্টিমার মেঘনার মধ্যে দুটো নোঙ্গর ফেলে থামল। নদী তো নয় যেন সমুদ্র। তোমার বাবায় কইল, ফেকন এখানে নামতে হবে। দুটো বড় বড় নৌকা এসে স্টিমারের গায়ে ভিড়ল। তোমার বাবারে নিয়ে আমার এই স্যার নৌকায় চড়ল। তারপর পুরুতঠাকুর ও নাপিতকে নিয়ে আমি নৌকায়।...'

ফেকনদার বলার ভঙ্গিতে অলকানন্দা হেসে কুটিপাটি। পরে একটু গাঢ়কণ্ঠে ফেকনদা অলকানন্দাকে বলল, 'তোমার মায়েরে কইয়ো ফেকনের লগে দেখা হইছিল।' ফেকনদা বিহারে তাঁর দেশের বাড়িতে বর্ষদিন হল গত হয়েছে। অলকানন্দা পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আই জি প্যাটেলকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে। উনিশশো একাত্তর সালের ডিসেম্বরের শেষের একটা দিনে ঢাকা জেলার সোনারগাঁও থেকে স্টিমারে বড় মেঘনা পাড়ি দিয়ে ওপারে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি যাওয়ার সময় শীতের মেঘনাকেও আমার ফেকনদার মতো 'সমুদ্র' বলে মনে হয়েছিল। সেদিন ফেকনদাকে খুব মনে পড়েছিল।

ফেকনদার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিতে আমার মনে যে মানুষটি আজও অম্লান, তার নাম হল মফিজ (Mafiz)। আমি বেশ কয়েকজন অপরিসীম সুন্দর পুরুষ মানুষ দেখেছি। তাঁরা সকলেই কুলকৌলিন্যে ও উচ্চশিক্ষায় বিভূষিত। যেমন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্ত চৌধুরি। কিন্তু এসব ছাড়া আমি আমার জীবনে যে একজন অপরূপ সুন্দর পুরুষ দেখেছি সে হল ওই মফিজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের একনম্বর বেয়ারা। মফিজ উত্তরপ্রদেশের লোক, লখনউ অঞ্চলে বাড়ি। ১৯৫১/৫২ সালে ওর বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি। অমাধারণ বুদ্ধি ও প্রখর বাস্তববোধ তাকে ভাইস চ্যান্সেলর থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ কর্তাব্যক্তিদের খুব প্রিয় করেছিল। রাত ন'টা, সাড়ে ন'টা পর্যন্ত মফিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকত। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তার ছুটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তাবৎ খবর ছিল তার নখদর্পণে। কলকাতা তো বটেই, তাছাড়া ঢাকা, এলাহাবাদ, লখনউ ও দিল্লি

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির নামকরা অধ্যাপকদের সকলকেই মফিজ চিনত। মফিজ আমার 'নিউজ সোর্স' ছিল। বাংলা পড়তে পারত, কিন্তু লিখতে পারত না। ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরে বাইরের কোনও অধ্যাপকদের কথোপকথনের ইংরেজি শব্দ শুনে সে তক্ষুনি উচ্চারণ অনুযায়ী উর্দুতে লিখে রাখত। তারপর সময়মতো আমাকে সেগুলি শোনাত। একটা ঘটনার কথা বলি : ১৯৫৬/১৯৫৭ সালের কথা। একদিন সন্ধ্যাবেলা মফিজের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দু'জনের কথাবার্তা শুনে মফিজের মনে হয়েছিল যে অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত রাজশাহির ভাইস চ্যান্সেলরের 'মাস্টারমশাই'। মফিজ আমাকে আরও জানাল যে কিছুক্ষণ পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক তারক সেন আসছেন ভাইস চ্যান্সেলরের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের মোহিনীবাবু। তাঁদের আলোচনার সময় মাঝেমাঝে চা ও জল দিতে গিয়ে মফিজ বুঝে নিয়েছিল যে তাঁরা ইংরাজি সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করছেন। মফিজের অনুমানের ভিত্তিতে আমি পরের দিন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম মফিজের অনুমান খুবই সঠিক। রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয় ওইসময় ছিল পূর্ববাংলার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ড. মামুদ হোসেন ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও অধ্যাপক অমরনাথ ঝা'র (A N Jha) ছাত্র। তিনি রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি অনার্স ও এম এ কোর্সের সিলেবাসের বিষয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর 'মাস্টারমশাই' অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে কথা বলতে। ড. মামুদ হোসেনসাহেব ছিলেন আমাদের রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেনের ছোট ভাই। দেশবিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন।

এরকম অনেক খবর মফিজের কাছ থেকে পেতাম। মফিজ বলেছিল, ওর জ্যাঠা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আশুতোষের একনম্বর 'চাপরাশ' (Chapres) ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বিকালে স্যার আশুতোষের সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন এবং যতক্ষণ 'স্যার' বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্যাঠাও সেখানে থাকতেন। এভাবে স্যার আশুতোষের প্রধান 'চাপরাশ' হওয়ার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মফিজের জ্যাঠার খাতির হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে সেই জ্যাঠা মফিজকে উত্তরপ্রদেশ থেকে কলুটোলায় নিজের কাছে নিয়ে আসেন। ১৯৩৮ সাল নাগাদ জ্যাঠা তাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিওনের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। তার প্রথম চাকরি হয়েছিল রেজিস্ট্রারের বিভাগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। স্যার আজিজুল হক তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। একদিন ভাইস চ্যান্সেলর ওই অশ্ববয়সি অসাধারণ সুন্দর চেহারার পিওন মফিজকে করিডরে দেখে ফেলেন। তাকে ডেকে নাম জিজ্ঞেস করলেন ও কোথায় কাজ করে তা জানতে চাইলেন। পরদিন থেকে মফিজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের টিন নম্বর পিওনের পদে বহাল হল। মফিজকে আমি দেখেছি সেনেটের বৈঠকের পর বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখার্জির সামনে হাঁটু গেড়ে তাঁকে প্রণাম করতে। সে সব সময় মনে রেখেছিল স্যার আশুতোষের পরিবারের সঙ্গে তাঁর জ্যাঠার সম্পর্ক এবং ওই সম্পর্কের জোরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চাকরির সংস্থান। মফিজ বাংলায় মজার মজার ছড়া কাটতে পারত। ওইসময় অর্থাৎ ১৯৫৪/৫৫ সাল পর্যন্ত দু'জন ইংরেজ মহিলা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। তাঁরা ছিলেন অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামরিশ (Stella Crumrish) ও অধ্যাপিকা মিস স্টোক (Miss Stok)। অধ্যাপিকা ক্রামরিশ 'বাগীশ্বরী অধ্যাপক' ছিলেন এবং ভারততত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি দেখতে বেশ সুশ্রী ছিলেন। ১৯৫৩ সাল নাগাদ তিনি কলকাতা ছেড়ে অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। অধ্যাপিকা মিস স্টোক ছিলেন ইংরাজি বিভাগের প্রধান। তিনি পদাধিকার বলে সেনেট সদস্য ছিলেন। প্রতিটি বৈঠকে যোগ দিতেন। কিন্তু দেখতে মোটেই ভাল ছিলেন না। হাঁটু ছাড়িয়ে অনেকটা নীচু পর্যন্ত গাউন পরতেন আর সেটিও আধময়লা। দেহে ও চলনে আদৌ নারীত্বের লেশ ছিল না। কিন্তু শুনেছি পড়াতেন খুব ভাল। এই মিস স্টোককে নিয়ে মফিজ একটি ছড়া বানিয়েছিল। ছড়াটি আজও আমি ভুলিনি—

'বলতে পারেন কি?
এখন যিনি চলেছেন
তিনি He কিংবা She?'

মিস স্টোক ১৯৫৫ সাল নাগাদ পাকিস্তানের করাচি কিংবা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের দায়িত্ব নিয়ে বহু টাকা বেতন পেয়ে চলে যান।

মফিজ ১৯৬৯/৭০ সালে অবসর নিয়ে চলে যায় তার উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে। কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগে

মফিজ 'যুগান্তর' অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘদিন রিপোর্ট করেছি। একটা বোধহয় জন্মের মতোই অমোঘ নিয়মে মমত্ববোধের জায়গা গড়ে ওঠে যা আমৃত্যু অম্লান থেকে যায়। আমার কাছে ফেকনদা ও মফিজ এখনও তাই।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেক মানুষকে মানুষ না দেখেই ভালবেসে ফেলে। তাঁর কথা শুনে বা বক্তৃতা পড়েই। আমি এমন একজনকে ভালবেসে ফেলেছিলাম তাঁর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করতে করতে। আমার এই ভালবাসার মানুষটি ছিলেন আন্দ্রেই ভিসিনস্কি (Andrei Vyshinsky)। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার লগ্নে রাষ্ট্রসংঘ (United Nations) প্রতিষ্ঠার সময় থেকে একটানা প্রায় দশ বছর ভিসিনিস্কি রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে (General Assembly) ও নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council) যেসব বক্তৃতা করেছেন সেগুলির (১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত) অন্তত বারো থেকে পনেরো হাজার ইংরাজি শব্দের বাংলা তর্জমা আমি করেছি। তাঁর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করতে করতে এই মানুষটির প্রতি আমার এক আবেগময় আকর্ষণ জন্মায়। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ৬০ বছরের আন্তর্জাতিক ইতিহাসে ভিসিনিস্কির মতো প্রখর ব্যক্তিত্বের, খরতর রসনার এবং প্রচণ্ড দাপুটে ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রসংঘে আর দেখা যায়নি। তাঁর সম্বন্ধে দেশি ও বিদেশি পত্রপত্রিকায় যেসব খবর বের হত, আমি তা মুগ্ধ করে ফেলতাম। তিনি রাশিয়ার এক সমৃদ্ধশালী পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা এত ধনাঢ্য ছিলেন যে তিনি এই পুত্রের স্কুল ও কলেজ জীবনের লেখাপড়া ফরাসি দেশের বিখ্যাত শিক্ষায়তনে করিয়েছিলেন। ওই বয়স থেকে তিনি ফরাসি, ইংরাজি ও স্প্যানিশ এই তিনটি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। ১৯১৭ সালে যখন সোভিয়েট বিপ্লব ঘটে, তখন ভিসিনিস্কি প্যারিসে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ করে ফেলেছেন। বিপ্লবের পর ভিসিনিস্কি দেশে ফিরে সোভিয়েট ইউনিয়নের পররাষ্ট্র দফতরে যোগ দেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় কাঠামো যাই হোক না কেন, একটা দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে আন্তর্জাতিক চূড়ায় পৌঁছে দিতে যে কূটনৈতিক কৌশল বা Career diplomacy-র দরকার সেটা তাঁর রক্তমাংসে মিশে ছিল। এই মানুষটি সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও গবেষণা বা গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে কি না আমি জানি না। কিন্তু আমি তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ঠান্ডা লড়াই যুগের সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম স্থপতি। ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি প্যারিসে, জেনেভায় ও দি হেগ শহরে লিগ অব নেশনস (League of Nations)-র শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন। হিটলারের অসীম ক্ষমতাশালী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভন রিবেনট্রপের (Von Ribentrop) সঙ্গে তিনি পাঞ্জা লড়েছেন। ১৯৪১ সালের শেষে অপরাজেয় জার্মান বাহিনী যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করল, তখন ব্রিটেন ও আমেরিকাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের 'মিত্র' হিসাবে পাওয়ার জন্য ভিসিনিস্কির কূটনৈতিক প্রয়াস ঐতিহাসিক। তিনিই মস্কোতে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (Sir Stafford Cripps) ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আভারলেল হ্যারিম্যানের (Averell Harriman) সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েট প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে দশ বছর নিউইয়র্কে ছিলেন। ওই সময় ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘে তাঁর বক্তৃতার বাংলা তরজমা করতে গিয়ে দেখেছি, শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করতে তিনি কঠোরতম ভাষা প্রয়োগ করতে দ্বিধা করতেন না। ওই সময় তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস। ডালেসকে গালাগাল করতে গিয়ে তিনি তাঁর পছন্দমতো ইংরাজি শব্দ না পেলে অত্যন্ত ক্ষিপ্ততার সঙ্গে ফরাসি শব্দের সাহায্য নিতেন। কখনও জুতসই ফরাসি শব্দ জিহ্বাগ্রে না এলে অতি দ্রুত স্প্যানিশে চলে যেতেন। ইংরাজি থেকে ফরাসি ও ফরাসি থেকে স্প্যানিশে তাঁর বিচরণ ছিল অনায়াস। ১৯৫০-এর যুগে প্রায় প্রতিদিনই ভিসিনিস্কির ছবি খবরের কাগজে প্রথম পাতায় বের হত। ছবিগুলিতে কখনও তিনি ব্রিটিশ বা আমেরিকান প্রতিনিধির দিকে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে আঙুল তুলে কিছু বলছেন। কখনওবা গালে হাত দিয়ে বসে চোখ বুজে কিছু ভাবছেন। এই দ্বিতীয় ধরনের তাঁর ছবিটি দেখলে মনে হত যেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু; মাথায় একঝাঁক তুষারশুভ্র অবিন্যস্ত কেশ। ঠিক একই রকম ভারী স্থূল দেহ। তাঁর ডেস্কে USSR লেখা প্লেটটির বদলে India লেখা একটি প্লেট রেখে দিলে কে বলবে এই লোকটি ভিসিনিস্কি—সত্যেন্দ্রনাথ বসু নন? রাষ্ট্রসংঘে তিনি কখনও কখনও ক্লান্তিকর বক্তৃতা এড়ানোর জন্য কান থেকে Headphone সরিয়ে কোনও ফরাসি কবির প্রেমের কবিতা পড়তেন। কখনওবা ফরাসি চিত্রকলার বইয়ে নিমগ্ন হয়ে দেখতেন। এই ভিসিনিস্কির পরিহাসপ্রিয়তার একটি ঘটনা কাগজে পড়েছি। ১৯৫০/৫১ সালের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সম্পাদিত ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তির (Anglo-Soviet Friendship Treaty) এক বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি লন্ডনে 'হাউস অব কমন্স'-এ আসেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রিচার্ড ক্লিমেন্ট এটলি। তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন আর্নেস্ট বেভিন (Ernest Bevin)। বেভিন রাজনীতিতে কুখ্যাত ছিলেন অন্যদের খোঁচা বা খোঁচা দিয়ে কথা বলার জন্য। কূটনৈতিক প্রথা অনুযায়ী নৈশভোজের টেবিলে ভিসিনিস্কির পাশেই বসেছিলেন বেভিন। খেতে খেতে বেভিন ভিসিনিস্কিকে বলেছিলেন—একটা ব্যাপারে আমার খুব বিস্ময় লাগে। আপনি কত ধনী ঘরের ছেলে, বলতে গেলে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছেন। আর আমি এক খনিশ্রমিকের ঘরে জন্মেছি। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেতাম না। অথচ আজ আপনি শ্রমিকশ্রেণির সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধি, আর আমি এক পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। ভিসিনিস্কির এই খোঁচামারা কথাটা মোটেই ভাল লাগেনি। কিন্তু কূটনৈতিক শিষ্টাচার একটা বড় বালাই। ভিসিনিস্কি কাঁটা-চামচ প্লেটে রেখে তাঁর জ্বলজ্বলে দুটি চোখ দিয়ে বেভিনের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—এটা এমন কী একটা বিস্ময়ের ব্যাপার? You betrayed your class—I betrayed my class! ভিসিনিস্কির বিপরীতে বসেছিলেন বিরোধী দলের নেতা স্যার উইনস্টন চার্চিল। তিনি ভিসিনিস্কির জবাব শুনে সশব্দে হেসে উঠেছিলেন। ভিসিনিস্কি কখনওই কোনও ব্যক্তিত্বের পরোয়া করতেন না। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় প্রতিনিধি কৃষ্ণমেনন কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘে পেশ করেছিলেন, তখন ভিসিনিস্কি কৃষ্ণমেননকে এমন নাস্তানাবুদ করেছিলেন যে কৃষ্ণমেনন প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়ে সংশোধিত প্রস্তাব পেশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এমন একটি ক্রুদ্ধ ও খরতপ্ত রসনার মানুষের একটি কোমল দুর্বল জায়গা ছিল। সেটি হল তাঁর মেয়ে, তাঁর একমাত্র সন্তান জিনাইদা (Zinaida)। ১৯৫১-৫২ সালে জিনাইদার বয়স ছিল ২২/২৩ বছর, বেশ সুশ্রী, বাপের মতো প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ, মাথায় একরাশ অবিন্যস্ত চুল। নিউইয়র্কের খবরের কাগজে ও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে জিনাইদার ছবি প্রায়ই ছাপা হত। জিনাইদার ১৯৪৫ সাল থেকে স্কুল ও কলেজ জীবনের দিনগুলি নিউইয়র্কে কেটেছে। জিনাইদা শৈশবেই মাতৃহারা। বাবা ভিসিনিস্কি তাঁকে মায়ের মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন। বালকাল থেকে এই মেয়ে বাপের হাত ধরে প্যারিস, জেনেভা, দি হেগ শহরে গিয়েছেন। তারপর দুরন্ত কৈশোর থেকে তিনি নিউইয়র্কে। তিনি কখনওই তাঁর এই ক্রুদ্ধ ও রাগি পিতাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। আমাদের ভারতীয় সমাজে বিশেষ করে বাঙালি সমাজে এ দৃশ্য বিরল নয় যে পরিবারে মাতৃহীনা কন্যা বৃদ্ধ পিতাকে দেখবার জন্য আজীবন অনূঢ়া থেকে গিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল এক্ষেত্রেই একশ্রেণির আমেরিকান সংবাদপত্র দিনের পর দিন বাবা ভিসিনিস্কি ও মেয়ে জিনাইদাকে কুৎসিত ও জঘন্যভাবে আক্রমণ করেছে। এই কাগজগুলি বারবার এই জঘন্য কথা বলেছে 'ভিসিনিস্কি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না, তিনি মেয়ের প্রতি আসক্ত তাই।'

আমেরিকায় তখন 'ম্যাকার্থিবাদ' সমাজ ও নাগরিক জীবনকে বিষাক্ত করে ফেলেছে। বিপন্ন হয়ে পড়েছিল গণতান্ত্রিক জীবনধারা। মেয়ে জিনাইদাকে নিয়ে আমেরিকার খবরের কাগজগুলির কুৎসা ভিসিনিস্কিকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল। যে-ভিসিনিস্কি প্রতিপক্ষকে পৃথিবীর বিষাক্ততম সাপের ছোবলমেরে তাঁর জিহ্বার সবটুকু বিষ নিংড়ে দিতেন, সেই ভিসিনিস্কির জীবনের শেষদিকের এক বড়তায় এক গভীর বেদনা ও বিষণ্ণতার সুর শুনেছিলাম। ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রসংঘের দশম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রসংঘে Foreign Correspondents Association আহ্লেই ভিসিনিস্কিকে এক সংবর্ধনা দিয়েছিল। ওই সংবর্ধনাসভায় ভিসিনিস্কি অত্যন্ত বিষণ্ণকণ্ঠে মর্মস্পর্শী ভাষায় আমেরিকান সাংবাদিকতার ওই অন্ধকার জগৎকে আক্রমণ করেছিলেন। ওই সভায় জিনাইদাও উপস্থিত ছিলেন। ওই বছরেই অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে নভেম্বর মাসে ওই নিউইয়র্ক শহরেই আহ্লেই ভিসিনিস্কি লোকান্তরিত হলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। কমিউনিজম অথবা পুঁজিবাদের বিতর্ক সরিয়ে রেখে কেবল এই একটি মানদণ্ডে আহ্লেই ভিসিনিস্কির বিচার করার প্রয়োজন অপরিহার্য যে তিনি ছিলেন বিশ শতাব্দীর সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত মানুষ। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর আমেরিকায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণার যৎকিঞ্চিৎ আমি Time সাপ্তাহিকীতে দেখেছিলাম। তাতে বলা ছিল : Andrei Vyshinsky been one of the Soviet Union's best known political figures in the early 1950's when he served as head of the Soviet mission to the United Nations, A master of inflamatory rhetoric, combative scornful and ready in an instant to heap the most undiplomatic abuse on other U. N. spokesmen. Vyshinsky drew wide attention, more of it favourable. Visitors to the U. N. hoped to catch him in the act of banging his fist or flalling his arms. Delegates complained that he attacked them like criminals. At his death a few weeks before his 71st birthday on November 22, 1954, the New York Times called him 'a master of the Vitriolic word.' Other editorialists remembering as well the role he had played as state prosecutor in Stalin's purge in 1930...

কেবল ভিসিনিস্কির মেয়ে জিনাইদার ব্যাপারে নয়, ওই সময় আমেরিকার সংবাদজগতে এক জঘন্য রুচি দাপিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু এই রুচির সাংবাদিকরা জব্দ হয়েছিল উইনস্টন চার্চিলের ছেলে র‍্যানডলফ চার্চিলের (Randolph Churchill) হাতে। ওই সময়টাতেই ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ তৎকালীন ব্রিটেনের একজন সেরা সাংবাদিক র‍্যানডলফ চার্চিল রাষ্ট্রসংঘের হাঙ্গেরি-সুয়েজ খাল সংক্রান্ত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের রিপোর্ট করতে নিউইয়র্ক যান। ওই সময়টাতে ইংলন্ডের সেরা মাতাল বলে চিহ্নিত ছিলেন উইনস্টন চার্চিলের কন্যা সারা চার্চিল (Sarah Churchill)। সারা খুব বলশালী মহিলা ছিলেন। তিনি চার-পাঁচটা স্বামী বদলেছেন। তিনি কারণে-অকারণে স্বামীদের খুব মারতেন। কারও নাক থেতলে দিতেন, কাউকে ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙে দিতেন, কাউকে কানে মেরে বধির করে দিয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর স্বামীরা আদালতে গিয়ে তাঁদের দৈহিক আঘাত দেখিয়ে কেবল ডিভোর্সই পাননি চিকিৎসার ক্ষতিপূরণও পেয়েছেন। রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরার সময় লন্ডনের রাস্তায় সারা চার্চিল নিরীহ পথচারীদের আক্রমণ করতেন প্রায়শই। কোনও পুলিস কনেস্টবল তাঁকে একা মোকাবিলা করতে পারত না। তাঁকে ধরতে গেলে তিনি কনেস্টবলদের জননেন্দ্রিয় মুচড়ে দিয়ে পালিয়ে যেতেন। ফলে সারা চার্চিলের চলাফেরার রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ে লন্ডন পুলিস অত্যন্ত বলশালী দৈত্যাকৃতি নিগ্রো পুলিস রাখতেন। সারা চার্চিল সপ্তাহে অন্তত দু'দিন রাতে জেল হাজতে কাটাতেন। এসব খবর লন্ডনের কাগজে তো বটেই পৃথিবীর সর্বত্র বিশেষকরে আমেরিকার কাগজগুলিতে প্রকাশিত হত। ১৯৫৩/৫৪ সালে উইনস্টন চার্চিলের প্রধানমন্ত্রিত্বের শেষ আমলেও সারা চার্চিল অবিরাম এইসব কাণ্ডকারখানা করতেন। ৩৮/৪০ বছরের সারাকে কেউই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। নিউইয়র্কে র‍্যানডলফ চার্চিলকে একদিন একদল আমেরিকান রিপোর্টার ঘিরে ধরলেন। তাঁরা র‍্যানডলফকে অনেক অশোভন ও অভদ্র পারিবারিক প্রশ্ন করলেন। র‍্যানডলফ তাঁদের জবাব দিয়েছিলেন যে সারা চার্চিল একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা, তিনি স্বাধীন ইচ্ছায় চলাফেরা করেন। মাঝে মাঝে আইন ও আদালতের দ্বারা সারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। সারার সম্পর্কে পরিবারের অন্য লোকদের কিছুই করার নেই। কিন্তু আমেরিকান রিপোর্টাররা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও কিছু অশোভন প্রশ্ন করলে র‍্যানডলফ ক্ষেপে গিয়ে ওদের কিছু কথা বলেন। অর্ধ শতাব্দীর আগের এই ঘটনা সম্পর্কে র‍্যানডলফ চার্চিলের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা সব ইংরেজি উক্তি আমার মনে নেই। কেবল একটা লাইন আমার এখনও মুখস্থ, সেটি হল...you Americans are so indecent that I doubt wheather you people have any parent at all...। র‍্যানডলফ চার্চিলের এই খিস্তি ইংলন্ড ও আমেরিকার খবরের কাগজের জনতাকে খুব আলোড়িত করেছিল সেই সময়ে। তবে এই ঘটনার পর থেকে আমেরিকার রিপোর্টারদের সবিৎ ফিরে এসেছিল অনেকটা।

১৯৫৪ সালে গান্ধীজিকে নিয়ে এক অহেতুক কিন্তু ক্রুদ্ধ বিতর্কের সূচনা করলেন এক অতি নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন গান্ধীজির অতি বিশ্বাসভাজন সেক্রেটারি নির্মলকুমার বসু। নির্মলবাবু ভারত ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সালে গান্ধীজির সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি গান্ধীজি সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বই My days with Gandhi ১৯৫৩ সালে প্রকাশ করেন। কলকাতা, দিল্লি, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, এলাহাবাদ ও লখনউ-এর ইংরাজি খবরের কাগজগুলিতে সমালোচনা (Book reviews) প্রকাশিত হয়। লখনউয়ের National Herald কাগজে এই বইটির সমালোচনা করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন। ট্যান্ডন দীর্ঘ আড়াই কলমব্যাপী সমালোচনায় গান্ধীজির নোয়াখালি সফরকালীন কয়েকটি ঘটনার বিবরণ নিয়ে নির্মলবাবুর প্রতি তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন। কেবল তাই নয় তিনি বইটির কতগুলি পৃষ্ঠা পরবর্তী মুদ্রণ থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান। অন্যথায় বইটি (My Days with Gandhi) নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে অনুরোধ জানান। যেহেতু National Herald পত্রিকাটি নেহরু পরিবারের 'পত্রিকা' হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিতে চিহ্নিত ছিল, সেহেতু এই বিষয়টিতে জওহরলাল নেহরুকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। এই বিতর্কে জওহরলাল অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নির্মলকুমার বসুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ওই পত্রিকায় এক দীর্ঘ চিঠি লিখে বলেন, নোয়াখালিতে গান্ধী আশ্রমের যে ঘটনাগুলি নির্মল উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সবই ঘটনা। এবং ওইসব ঘটনা নিয়ে নির্মলের মনে যেসব প্রশ্ন উঠেছিল, সেগুলি নিয়ে নির্মল গান্ধীজির সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। কিছু কিছু ঘটনা আমার নিজেরও জানা। আমি বইটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, কারণ যেহেতু বইটির অনেক স্থানে আমার উপস্থিতি রয়েছে। আমার কখনওই এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি যে নির্মল গান্ধীজির চরিত্র

কালিমালিপ্ত করেছে।' এই বিতর্কটি কেবল এক বিস্মৃত অধ্যায়ই নয়, এই ঘটনাটি খুব কম লোকেরই জানা। পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন My days with Gandhi বইটির যে যে অংশ বাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে অন্তত দুটি প্রজন্মের ভারতীয়দের জানিয়ে রাখছি। ওই অংশগুলি হল ঃ

Srirampur, Tuesday, 17-12-1946 :

At 3.20 in the morning, I heard Gandhiji talking aloud to Sushila Nayyar who had stayed over for the night with us. His voice seemed worried.

Some time after prayer, while I was conversing at the door of my cottage with a few friends, suddenly all of us heard a deeply anguished cry proceeding from the main room. It was Gandhiji's voice, and then we heard the sound of two loud slaps given on someone's body. The cry then sank down into a heavy sob. We were all amazed beyond measure and looked at one another. I ran towards the room, and when I reached the doorstep, I saw Gandhiji sitting upon his bed with his back reclining upon the wall, while his eyes were closed and tears were streaming down his face. Sushila was standing near by on the floor. Her face was also bathed in tears, but as she bent forward and tried to say something to Gandhiji, he waved her aside with a strong movement of his arms. This happened more than once.

I did not enter the room but returned to my own and decided that Gandhiji should be left in peace for the rest of the day. The day however proved fairly heavy, for some important matters had to be attended to. But to all those who came, I said that Gandhiji was feeling very much indisposed and it would be best if everyone took as little time as possible.

Gandhiji listened in silence, but expressed no remark.

I noticed that Gandhiji has been slightly absent-minded throughout the day. He sent a long letter to Sushila Nayyar.

Srirampur, Thursday, 19-12-1946 :

This was a very heavy day for Gandhiji. In the morning, Kularanjan Mukherji arrived from Calcutta. He is in charge of the hydro-therapy section of the Marwari Relief Society's Hospital; and, as Gandhiji takes a keen interest in naturecure methods, the Society has sent him here for a short time.

Omprakash Gupta conversed with Gandhiji for several hours during the day, and several times the latter had to remind him that he was feeling exhausted. Omprakash Babu wanted to discuss some personal matters with him. At one time, I heard Gandhiji plainly asking him if he had come to dedicate himself wholly to village work here. The real test was this : Was he prepared to continue the work even if Gandhiji were not there? If not, then he had evidently come because the latter's presence provided a sort of intoxication (*nesha*). It was not his business to provide such sop for anyone.

Others also come on interviews which were unnecessarily prolonged and left Gandhiji in an exhausted condition. Some of these interviews could not be prevented by me as the workers were old associates who had come from long distance.

Manu Gandhi, daughter of Jaisukhlal Gandhi, Gandhiji's nephew, arrived in Srirampur today.

At prayer time, Gandhiji felt too tired to make any speech.

The news had gone round that he was about to begin a tour on foot through the affected villages of Noakhali and Tipperah, and therefore several Press representatives and photographers arrived here today. I met them in a private conference and communicated to them the following instructions from Gandhiji :

1. They should seek the permission of the villagers before staying anywhere. They should not be a burden to anyone.

2. They should help one another and share news without reserve.

3. They would not be allowed to accompany him in the walking tour, as Gandhiji did not want to travel with a large retinue.

4. He wished that the correspondents should make independent observation in the surrounding villages and try to find out if evacuees were returning home or not, and what was the effect of Gandhiji's presence on Muslim villagers.

An important letter was sent today to the Secretary of the Bengal Provincial Congress Committee. Already on the 29th of last month, I had written to the Vice-President of the same body to make a public statement to the effect that the number of persons killed was much lower than what had appeared in the Press in October. The latter had said in a contemporary public statement that the figure was nearly five thousand. But detailed enquiries had shown that it was no more than three hundred, although that was not the worst part of the disturbances. The cause of this exaggeration was easily understandable. If there were ten members in a family, and if only one had been murdered when the disturbances took place, then those who survived, escaped in different directions. And when they reached places of safety, each looked upon himself as the sole survivor and gave a high figure for those who had been killed. There was thus a multiplication of error. Now that the real facts were very nearly known, Gandhiji was anxious that the truth should be publicly stated. The Vice-President of the Congress Committee however felt otherwise. He wrote back to say that the figures in his October statement had been described as approximate. Gandhiji had called for the necessary Press cuttings from the Secretary. After going through them, I wrote to him under authority that it was true the figures were approximate, but there was nothing in the statement to indicate, by way of caution, that there might have also been error in the collection of data. A public worker of the Vice-President's standing had to be much more careful in respect of every word in a public utterance.

In the morning, while I was administering his daily bath, Gandhiji spoke to me of his own accord about the happenings of the 17th. Ever since that day, no word had passed on this subject between him and me.

He wished to learn from me as well as from Parasuram 'if Sushila Nayyar had fallen in our estimation' (*Tumhare nazar me gir gai hai?*), on account of that day's incident. I said, I could speak for myself, not for Parasuram. She had undoubtedly fallen, and the reason was this : No person however great had the right to disturb him as Sushila had apparently done. Gandhiji then said, 'Supposing she did so with a good intention, perhaps to help me in my own work? She may have been suggesting certain steps even for my sake, not for her own; even then, would you say she was wrong?'

I said, 'Yes, even then. If she felt that you were contemplating a wrong step, she might have offered her suggestions and then left you free to decide.'

Gandhiji said, 'She is against my plan of tour on foot in the present condition of my health. She thinks that, at least, one old companion who knows all about my personal needs should accompany me, and she offered her own services. She suggested that it would not be safe to depend on new workers like you and Parasuram, who know so little about my physical requirements.'

I said, 'If I had been in her position, I would have placed my views fully before you and left you free to decide. If the decision had not been favourable, I would have waited patiently until you discovered your error.'

After I spoke, Gandhiji repeated the substance of my views in his own language in order to make sure that he had understood me rightly.

Srirampur, Friday, 20-12-1946 :

The work in Srirampur was becoming heavier and heavier every day. So, when Manu joined us permanently, both Parasuram and myself felt greatly relieved. She has taken charge of the bath and much of the cooking, with the result that we can devote more time to office work.

When I reached Gandhiji's room even before 4 in the morning, I heard him talking to Manu in a low voice in his own bed, where she had gone to sleep at night. After prayer, Gandhiji called me and said that I should get ready a report on recent happenings in Noakhali. Things looked as if he would have to engage in a battle with the League Government in Bengal. He admitted that the non-violence which the whole country had so far evinced was non-violence of the weak. But he had cherished the hope that people would realize from experience that the non-violent method was more effective than violence in actual practice.

This expectation had, however, not materialized. The path which henceforth lay before him was the path which could only be trodden by the brave. Gandhiji mentioned the name of Jesus Christ, and said that Jesus was the 'Prince of passive resisters.' Indeed, there was no passivity in Him and His whole life was an epic of intensely heroic action.

Referring to Manu, he said, that he had been telling her how he personally felt that he had reached the end of one chapter in his old life and a new one was about to begin. He was thinking of a bold and original experiment, whose 'heat will be great'. And only those who realized this, and were prepared to remain at their posts, should be with him. Manu would look after his personal needs, while one more worker would be needed to deal with the Urdu correspondence and that would complete his new staff.

During bath, I said to Gandhiji, 'You have drawn me into your company and given me many liberties. If you pardon me, may I ask you a question? Did you slap Sushila the other day?', for I had not been able to get over the painful recollection of the two sharp sounds which had proceeded from within the room.

Gandhiji's face wore a sad smile and he said, 'No, I did not beat her, I beat my own forehead. When I was twentyfive years old, I once beat my own son; but that was the last time.

'Sushila is a gifted girl, and is of service to me in many ways. When she learnt about my proposed journey on foot, she began to argue against it. We had been talking ever since 2.30 in the night. I explained to her how my mission was going to take me to a lonesome journey through the Muslim villages. Muslims had been taught to regard me as an arch-enemy of Islam. If I was to overcome that feeling, I could only do so by entering into their midst in the most unprotected condition possible. I would have to depend upon them completely for all my needs and they would be free to do with me what they liked. But she was insistent that some old companion who knew about my personal requirements should be in my company. Then I grew impatient. If I could not convince one like her, who has known me for years, that the step was right, how could I hope to convince others? And I beat my own forehead as I wept.'

Srirampur, Sunday, 22-12-1946 :

This being Kasturba Day, Gandhiji was up at 2.30 a.m. and worked till prayer time. Prayer began at 4.15 a.m. Sushila Nayyar, Manu Gandhi and Parasuram did the reading of the *Bhagabad Gita*. While this was going on, Pyarelal dropped in with an English friend. Sushila left at about ten.

The Provincial Muslim League of Bihar has sent a printed report of the riots in that province. I went through a substantial portion of it before Gandhiji's bath, while he has already finished reading the report. Later on, he told me that even if half of what was written in that report were true, and if the Congress Ministers of Bihar had actually concealed anything from him, then it meant that the end of his life had been reached (*meri zindagi chali gai*). He would, in that case, have to go to Bihar and fast unto death. He had already lived a long life and had done more than an average man's share of work; if did not matter if the time had come for him to depart.

I argued with him that as Jawaharlal Nehru was coming soon, there should be no hurry, for he would get all the facts in a few days' time. But Gandhiji was restless. He said, the visit was yet a week away, and that was a long way off. The Muslim League had made conditions hot, and the iron must be struck while it was yet hot. The Congress Ministers of Bihar ought to have taken up the challenge of the League immediately; but them were procrastinating.

He then said that if he left for Bihar, it would mean a great blow to Noakhali. 'I do not know', he continued, 'what the Hindus will do then. Even if it comes to wholesale migration, let them do it. My place is now in Bihar. I shall go there practically as a representative of the Muslims to find out the truth.'

Today, I received a touching letter from Sushila Nayyar in which she tried to explain, from her own point of view, what had happened in the morning of the 17th. The letter is reproduced below in part :

'At night while reading Bapu's diary I read "I had a curious dream". I casually asked him what it was. He did not say and I kept quiet.

'At three o'clock the next morning, I woke up with the noise of Bapu jumping in bed. He said he was very cold and was taking exercise to warm up. After that, he asked me if I was awake and started telling me of his curious dream. After the dream he started explaining how his present step was a *tapascharya* (penance) for him, and how he was going through inconveniences. On the previous day, I had remarked that God did and would send him helpers in whatever he did.....In a short note I asked him if I would be allowed to come with him. I mentioned that what he had said about *tapascharya* and what I had said about God sending him help were not contradictory and tried to explain it. He answered with irritation that he had tried to explain things to me but had not succeeded.....I could see that he was getting worked up. So.....I walked away. Suddenly I heard him slap his forehead. I rushed back and stopped him.....

'I am completely unnerved.....I came yesterday with great trepidation. Bapu had asked me to come for Gita.....He again raised the topic this morning and I found that my self-control has not returned as yet.'

Sushila had left Srirampur in the morning in tears.

Srirampur, Monday, 23-12-1946 :

Early in the morning, at 5 o'clock, Gandhiji handed a note to me. It was Monday, his day of silence. He had written, 'I do not know what God is doing to me or through me. If you have the time and inclination I would like you to walk to Sushila at daybreak and return after passing some time with her and learning all about her requirements and her health. You can give her the whole of our conversation about her without reserve. The rest you will know from her if she cares to tell you. You can show this to her if you wish. If you propose to shoulder this burden, you will act as the spirit moves you. Don't work beyond your capacity.'

I made ready to go. In the meanwhile, Arun Datta a volunteer had come from the Nandigram refugee camp where out of 1,800 evacuees, Government rations had been stopped for 300. The Government were trying to force the evacuees to return home. Gandhiji gave them the following instruction. 'I do not want them to hunger strike at present. Let there be a full cause ready for such a strike. The question therefore is, are those who get their rations prepared to share with those (300) what they get? If they are, these should take their share while the matter is being prosecuted.'

The party then left for Nandigram in order to carry out Gandhiji's instructions.

I started for Changirgaon where Sushila is posted at 7.30 a.m. with some fruits for her and returned at eleven.

Srirampur, Wednesday, 25-12-1946 :

A telegram came from Jawaharlal Nehru in which he said that he would reach Srirampur on the 27th evening.

Members of the Friends' Service Unit have sent a bag of Christmas presents to us. The bag contained cigarettes, playing cards, a pair of canvas slippers, a towel, soap etc. Gandhiji seemed to be in a happy and playful mood today. He asked us to spread our gifts on the mat and then started distributing them among the volunteers here and elsewhere. The packet of cigarettes was a problem; but then suddenly Gandhiji asked me to keep it for Jawaharlal Nehru.

Rabindramohan Sengupta, Trailokya Chakraverty, Ananta De, Santimoy Dutt and Pratul Chaudhuri of the Revolutionary Socialist Party of India paid a visit to Gandhiji and wished to place their services at his disposal. Trailokya Babu confessed that, so far, all of us had failed to find a way out of the terrible fear which held the common man in its grip. It was time therefore to try Gandhiji's method of instilling courage before the country could earn its right to freedom.

I left Srirampur for Ramganj early in the morning and handed over the above letter to the Deputy Superintendent of Police for despatch to Calcutta. Then I went to the officer in charge of relief and rations. We went together with a few representatives of the public to inspect the bags

of rice in the godown. The public representatives were invited to choose the lowest grade of broken rice which could be accepted as an emergency measure for the current fortnight. The Officer was prepared to supply that grade of rice as far as possible from his stock and supplement it with wheat flour. It appears the matter will be set right soon.

While I was away, Parasuram approached Gandhiji and unburdened his mind on certain private matters. It will be remembered that Gandhiji had asked for his opinion regarding the happenings of the 17th morning just as he had done from me.

এরপর নির্মলবাবু নোয়াখালি থেকে গান্ধীজির দীর্ঘদিনের অনুগামী পরশুরামের চলে যাওয়ার ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টিকে 'এক বন্ধুর বিদায়' (A Friend's Parting) বলে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য অধ্যায়টি হল এই :

A FRIEND'S PARTING

Srirampur, Tuesday, 31-12-1946 :

Yesterday, when I was away from the camp, Parasuram had spoken for an hour with Gandhiji on a certain private question. He had also told Gandhiji that I held a similar view to his own, but had refrained from giving expression to it because I did not, in any way, 'wish to disturb him in the work he had undertaken for the sake of Bengal'. At seven in the evening, Gandhiji therefore sent for me and asked me if Parasuram's report was correct. We were together till 8.30. I began to speak as usual in Hindi, but with Gandhiji's permission soon slipped into English. The following is a revised translation of my Bengali diary of that date.

I said to Gandhiji, I have deep reverence for you from a particular point of view. I have always looked upon you as one of the great pathfinders in human history. Men have been groping for ages past for some effective means of bringing about social change without recourse to violence. You are one of the pioneers in this respect. For many years I have read your writings with care and have formed a more or less concrete picture of your thoughts on the subject. I have also tried to observe how it works out in collective practice in which common men are involved.

There are in Bengal numerous workers who try to follow your teachings. They spin regularly, practise all kinds of austerities in personal life, but, instead of being able to conduct experiments in collective non-violence, often settle down into an individualistic practice of a set of non-violent rituals. They thus lose all effectiveness in the social or political field.

Those who thus practise austerities have not often taken to it because it is necessary in the pursuit of an ideal : but, in at least some cases, it springs from a mere love of austerities, or from the desire of finding favour in your eyes. As such, the austerity and humility which they exhibit before you become false. Repression does good only when it is a joyous enterprise undertaken for a noble cause. But under the above circumstances, the end becomes vague and over-shadowed by the means; with the result that such persons try to find compensation through other channels. A morbid hankering after fame and public approval may step in, or the personality may begin to crack under a load which nobody called upon it to bear. Thus, your love for asceticism results in an injury to the personality of those who do not know how to preserve a sense of social responsibility, which you personally never lose sight of.

Secondly, I have seen you lose temper and become sentimental at times; and have felt drawn closer to you on that account. If you had been completely free from all weaknesses, I would have perhaps revered you from a distance but would never have felt drawn close to you as I do today.

Parasuram has a complaint against the way in which you deal with different workers, how you seem to have personal preferences and fail to chastise when necessary. He has made this a cause of complaint against you. I do not do so. I have looked upon this part of your life as a necessary element of play to save you from the influence of the cold and barren atmosphere in which you have to work in the rest of your life. If you had tried to root out every trace of softness from your character and even succeeded in doing so, you would have become more distant from us from the human point of view. So, when you hold

the reins a little loose, and give way to anger, for instance, I do not look upon it as a matter for complaint.

But there is another side of the picture too.

There are many women, who, when they are in love, try to convert their object of love into a plaything. Sometimes they deal hard blows upon the object and sometimes they invite similar blows in return. There is a secret satisfaction in such play and in exclusive possession. That is an expression of our sexual instinct.

Among the women who are associated with you in social work, I have observed an attitude bordering on this kind. When women love men in normal life, a part of their psychological hunger is satisfied by the pleasure which they derive in the physical field. But when women pay their homage of love to you, there can be no such satisfaction, with the result that when they come close to you personally, their mind becomes slightly warped. Of course, all of us are neurotics to a more or less extent. But the effect of your contact has an undoubtedly dangerous influence upon some of your associates, whether male or female.

Parasuram is a simple, straightforward man. He has told you from his own point of view what he considers wrong. Although I do not share his opinion about right or wrong, yet I felt sympathy for his point of view.

Gandhiji listened in silence and when I had finished said, 'Your hint is that—should be sent away from here'. Of course, that was never my intention although that was an important item in Parasuram's demands.

Parasuram broke in by saying that whatever Gandhiji's attitude may be, as a common man he would say that he should give no occasion for any one to misunderstand him. If reflections were cast on Gandhiji's personal character, the cause for which he stood would itself suffer. This was something he could not bear personally. While at school, he had once come to blows with mates when they had cast aspersions against Gandhiji's character. Moreover, had he not himself promised to his co-workers in Sevagram that he would keep women workers away from his immediate company?

In explaining his position, Gandhiji said that it was indeed true that he permitted women workers to use his bed, this being undertaken as a spiritual experiment at times. Even if there were no trace of passion in him of which he was conscious, it was not unlikely that a residue might be left over, and that would make trouble for the girls who took part in his experiment. He had asked them if, even unconsciously, he had been responsible for evoking the least shade of evil sentiment in their heart. This 'experiment', as he called it, had been objected to by distinguished co-workers like Narahari (Parekh) and Kishorlal (Mashruwala); and one of their grounds of complaint had been based on the possible repercussions which the example of a responsible leader like him might have upon other people.

When Gandhiji finished his personal explanation, I ended by saying that unless I had known how great he was, and unless I had a purely objective attitude towards his life, I might have given way to sentimentality and subscribed to some of the charges laid against him by Parasuram.

Gandhiji then asked me to help Parasuram in framing his complaints in writing.

Srirampur, Wednesday, 1-1-1947 :

Parasuram typed out an enormous letter running over ten foolscap pages, in which he expressed his views with great clarity and suggested certain changes in our life here.

As this was the last day of our stay at Srirampur, I got up at two and wrote out my personal diary which has been quoted under yesterday's date. A pretty large amount of correspondence had accumulated, and all through the day, I tried to clear up the arrears of work.

Charu Chandra Chaudhuri of the Khadi Pratisthan came with a statement of accounts in which it appeared that more than one lac of rupees had been subscribed by the public for Gandhiji's work in Noakhali. The expenses incurred up to date, amounted to a little over Rs. 8,000/- in all. This had been advanced by the Khadi Pratisthan of Sodpur. Gandhiji did not

wish to burden the Khadi Pratisthan with these expenses and made arrangements for repaying the advance out of the sum contributed by the public.

Chandipur, Thursday, 2-1-1947 :

Early in the morning about a dozen volunteers arrived in order to carry all over belongings to the next halting station at Chandipur. All the things had already been made up into packages.

Just before Gandhiji left, the members of the household gathered together and bade him farewell. We started at 7.30 a.m., and as Gandhiji walked across the paddy fields recently laid bare after the harvest had been gathered in, he halted for a few minutes at the residence of the Chakraverty family in the southern extremity of Srirampur. In that house, not a single hut had been left standing by the miscreants. Chandipur was reached at about 9 a.m., although the distance was no more than 3 miles.

The day was spent in arranging our things at the residence of the Mazumdars. Prayer was held in the open space north of the tank at 4.30 p.m. Gandhiji took his meals after this, and then proceeded towards Changirgaon where Sushila Nayyar is posted.

Before leaving Srirampur, Gandhiji had written a reply to Parasuram's letter, in which he said :

'I have read your letter with great care. I began it at 3 a.m., finished reading it at 4. a.m. It contains half-truths which are dangerous. You wronged me, the parties you mention, yourself and the cause by suppressing from them and me your opinion about them.

'I cannot concede your demands. The other points you raise do not make much appeal to me.

'Since such is your opinion and there is a conflict of ideals and you yourself wish to be relieved, you are at liberty to leave me today. That will be honourable and truthful. I like your frankness and boldness. My regard for your ability as a typist and shorthand writer remains undiminished and I was looking forward to taking a hand in bringing out your other qualities. I am sorry that it cannot be.

'My advice to you is that you should confer with Pyarelalji and Sushilabehn. You should take Kanubhai's guidance in shaping your future. I shall always be interested in your future and shall be glad to hear from you when you feel like writing to me. Finally let me tell you that you are at liberty to publish whatever wrong you have noticed in me and my surroundings. Needless to say you can take what money you need to cover your expenses'.

A few days later, Gandhiji perhaps did an injustice to Parasuram, when in a letter to another friend, he wrote, 'Parasuram has left..... because he did not believe in my ideals..... The immediate cause I think was that Manu shared the same bed with me. He thought that it was improper not because, as he said, there was anything wrong with me or Manu, because he know that she was in the place of grand-daughter to me, but because it would be a bad example for young men, for example, like himself.....I believe that everybody in the camp knows that Manu is sharing my cot and, in any case, I do not want to do anything in secrecy. I am not advertising the thing. It is a sacred thing to me. But those who want to see everything wrong about me are at liberty at any time they like to advertise the fact and give it what colour they like.'

This was completely unfair to Parasuram, because Parasuram's complaint as summarised in my own diary or in his subsequent letter was quite different and it was inspired by the deepest of loyalty to the cause for which Gandhiji stood. Only, his point of view was the point of view of the common man; he did not realize how contact with men and women on a common level might be a spiritual need for Gandhiji. My belief is that while writing the above letter, Gandhiji did not perhaps have Parasuram's letter before him and was evidently reporting from memory, which did not serve him right at least on this particular occasion.

My Days with Gandhi (by Nirmal Kumar Basu) গ্রন্থের যে যে অংশগুলি আমি এখানে উদ্ধৃত করেছি, সেই অংশগুলি সম্পর্কেই পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের আপত্তি। লখনউয়ের National Herald পত্রিকায় (১৯৫৪ সালে) ট্যান্ডনের ক্রুদ্ধ সমালোচনা এবং নির্মলবাবুর পক্ষে জওহরলাল নেহরুর জোরালো বক্তব্যের পর আমি এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কিছু শুনিনি। নির্মলবাবুর এই

ঐতিহাসিক বইটি আমি অসংখ্যবার পড়েছি এবং এখনও মাঝে মাঝে চোখ বুলাই। ১৯৬৪ সালে গান্ধীজি সম্পর্কে অন্য একটি প্রসঙ্গে কথা বলতে আমি নির্মলকুমার বসুর কাছে যাই। আমি তখন 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করি। নির্মলবাবুর বোসপাড়া লেনের বাড়ি 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিস থেকে মাত্র মিনিট তিনেকের মধ্যে। যে-ঘটনাটি সম্পর্কে প্রথম আমি নির্মলবাবুর সঙ্গে কথা বলি সেটি হল Leonard Mosley-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *Last Days of the British Raj* সম্পর্কে। এই গ্রন্থটির এক জায়গায় এরকম বলা হয়েছে যে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ১৯৪৭ সালের মার্চের শেষের দিকে গান্ধীজি পাটনা থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। তখন রাতে গান্ধীজি যখন ট্রেনে ঘুমিয়েছিলেন, তখন এক চোর গান্ধীজির প্রিয় ট্যাক-ঘড়িটি বালিশের তলা থেকে চুরি করে নিয়ে যায়। আমার ঘটনাটিকে খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। কারণ গান্ধীজির সঙ্গে ওই কামরায় কেবলমাত্র তাঁর নাতনি মনু গান্ধী ছিলেন; আর 'চোর' গান্ধীজির কামরায় কী করে ঢোকার সুযোগ পাবে? নির্মলবাবু আমাকে তারিখ করে বললেন, তুমি ঠিক জায়গায় ধরেছ। ওই ট্যাক ঘড়িটি হারিয়ে যায়া বিহারশরিফের কাছে একটি গ্রামে। নোয়াখালি থেকে পাটনা যাওয়ার পথে মাত্র একটি রাত আমরা সোদপুরে কাটাই। পরদিন সন্ধ্যায় আমরা পাটনায় পৌঁছাই। বিহারের বহু গ্রামে তখন দাঙ্গা চলছে। বিহারশরিফের কাছে গান্ধীজির সঙ্গে আমরা যখন একটি গ্রামে পৌঁছলাম, তখন হাজার হাজার আর্ত মুসলমান গান্ধীজির পায়ের কাছে পড়ে কাঁদতে লাগল। আগের রাতে বেশ বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার মাটি কাদা হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজিকে ঘিরে প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হলে কোমর থেকে গান্ধীজির কাপড় খুলে যাচ্ছিল। আমি অতিকষ্টে গান্ধীজির কোমর জড়িয়ে রাখি। ওই সময়ে গান্ধীজির কোমর থেকে ট্যাক-ঘড়িটি পড়ে যায়। পরে ওই জায়গায় আমরা অনেক খোঁজাখুজি করেছিলাম। কিন্তু ট্যাক ঘড়িটি আর পাওয়া গেল না।' এই আলোচনার সময় আমি নির্মলবাবুর কাছ থেকে একটি দিন ও সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম নোয়াখালি প্রসঙ্গে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করব বলে।

১৯৪৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গান্ধীজি বেলেঘাটা থেকে দিল্লির ট্রেন ধরবার জন্য রওনা হওয়ার সময় নির্মলবাবু তাঁকে শেষবারের জন্য প্রণাম করেছিলেন। ওই বছরেই শেষদিকে সম্ভবত নভেম্বর মাস থেকে নির্মলকুমার বসু 'শনিবারের চিঠি' নামের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'নোয়াখালিতে গান্ধীজি'—এই শিরোনামে ধারাবাহিক লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই ধারাবাহিক লেখার শেষ কিস্তিটি আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারির কোনও একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিল কি না আমার জানা নেই। তবে নির্মলবাবু তাঁর এই রচনার শেষ অংশে বলেছিলেন '...কোন এক বিস্মৃত অতীতে ভারতীয় শিল্প সাধনায় এক সাধকশিল্পী অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। মাটির গড়া দেবতার মূর্তিতে নয়, রক্তে মাংসে গড়া গান্ধীজির মানবচরিত্রে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেকে ধন্য করিয়াছি ধন্য করিয়াছি ধন্য করিয়াছি।' এরপর তিনি ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *My Days with Gandhi* প্রকাশ করেন। ১৯৬৪ সালে নির্মলবাবুর স্থির করে দেওয়া দিন ও সময় অনুযায়ী আমি তাঁর কাছে গেলাম। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর ধারাবাহিক বাংলারচনার কথা তুলে লেখার শেষ কয়েকটি লাইন মুখস্থের মতো বলায় নির্মলবাবু খুবই স্নেহের কণ্ঠে বললেন, 'তুমি একেবারে হৃদয় দিয়ে পড়েছ দেখছি।' এরপর আমি *My Days with Gandhi*-র প্রশ্ন তুলে পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের National Herld পত্রিকার বিরূপ সমালোচনার কথা বললাম। এবার নির্মলবাবু অনেকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই বললেন 'এটাও তোমার নজরে পড়েছে, এতে মনে হচ্ছে গান্ধীজি সম্পর্কে তুমি খুবই আগ্রহী।' অনেকটা সাহস পেয়ে আমি তখন বললাম, ১৯৪৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখে সকালবেলায় নোয়াখালির শ্রীরামপুরের গান্ধী-শিবিরে ডা: সুশীলা নায়ারকে কেন্দ্র করে যে-ঘটনা ঘটেছিল এবং গান্ধীজির স্নেহধন্য পরশুরামের চলে যাওয়া সম্পর্কে আপনি নিজের কথা নিজের অনুভূতি সম্পর্কে একেবারেই নীরবতা পালন করেছেন। আপনি অন্যদের প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির কথাই আমাদের জানিয়েছেন। নির্মলবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'এতদিন পরে আমার অনুভূতির কথা জেনে তুমি কী করবে? তুমি কি কিছু লিখবে? সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আর যদি কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চাও তাহলে আমি তোমাকে আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত কৌতূহল জিইয়ে রাখতে বলব।'

আমি তাঁকে বললাম, আপনার বইতে এবং প্যারেলাল (গান্ধীজির স্থায়ী সেক্রেটারি) তাঁর বই *Gandhi The Last Phase—Vol II*-এ ১৯৪৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের বেলুড় স্টেশনের ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে বেলেঘাটা থেকে গান্ধীজিকে হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে গেল না। কারণ গোয়েন্দাদের খবর ছিল যে কলেজ স্ট্রিটে ও বড়বাজারে গান্ধীজির গাড়ির ওপর উগ্রহিন্দুরা আক্রমণ চালাবে। তাই গোপনে গান্ধীজিকে বি টি রোড-দক্ষিণেশ্বর দিয়ে বেলুড় স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দিল্লিগামী

ট্রেন থামিয়ে গান্ধীজিকে গাড়িতে তোলা হল। সে সময় বেলুড় প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রাজীতিতে গান্ধীজির এক পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষ যিনি গান্ধীজিকে বারংবার নোয়াখালি যেতে বাধা দিয়েছিলেন, সেই হুসেন শাহিদ সুরাবর্দি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'এই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে এভাবে লুকিয়ে বাংলা থেকে যেতে হল।' তাই আপনি বিশ শতাব্দীর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ গান্ধীজি সম্পর্কে আমার কৌতূহল কেন নিবৃত্ত করবেন না? এবার নির্মলবাবু হেসে ফেলে বললেন, 'বিশ্বাসযোগ্যতার দায়ভাগ পুরোটাই তোমার কিন্তু।'

নির্মলবাবু বলতে আরম্ভ করেন, 'তুমি বইটা অনেকবারই পড়েছ। তুমি পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের সমালোচনা এবং আমার সমর্থনে জওহরলাল নেহরুর কথাগুলিও পড়েছ। যেটুকু তোমার জানা নেই সেটা হল, গান্ধীজি রাতের অন্ধকার যথেষ্ট থাকতেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যেতেন। ওই সময় গান্ধীজির কাছাকাছি থাকত একজন শিখ সর্দারজি, তিনি ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর (ই এফ আর) এক বয়স্ক সৈনিক। কিন্তু আগে সরকারিভাবে যখন গান্ধীজির প্রহরার জন্য প্রস্তাব করা হয়, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ওই সময় ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের উক্ত বয়স্ক শিখ সৈনিক নোয়াখালিতে তাঁর ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে ছিলেন। তিনি একদিন এসে গান্ধীজির পা ছুঁয়ে বললেন, তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি গান্ধীজির সেবায় নিযুক্ত থাকতে চান। গান্ধীজি তাঁকে শর্ত দিলেন যে বন্দুক কাঁধে নিয়ে তিনি গান্ধীজির পাশে চলতে পারবেন না। তবে যেহেতু তরবারি বহন করা শিখ ধর্মের অঙ্গ, সেহেতু সেটি বহন করা চলতে পারে। এভাবে গান্ধীজির একা চলাফেরার সময় তাঁর জন্য একরকম প্রহরার ব্যবস্থা করা হল নোয়াখালির গ্রামগুলিতে। ওই সময়কার খবরের কাগজের ছবিতে ওই বয়স্ক শিখ সৈনিককে বিভিন্নভাবে গান্ধীজির পিছনে ও পাশে দেখা গিয়েছে। এছাড়া UNESCO ও Gandhi Peace Foundation তাদের Movie Cameraতে গান্ধীজির নোয়াখালি সফরের যে ছবি সংরক্ষণ করেছে, তাতেও ওই শিখ সৈনিককে খুব ভালভাবেই দেখানো হয়েছে। (১৯৬৮ সালে গান্ধীজির জন্মশতবর্ষের সূচনাতে কলকাতার Globe সিনেমা হলেও ওই ছবিটি দেখানো হয়েছিল। আমি তখনকার রাজ্যপাল ধর্মবীরের পাশে বসে ওই ছবিটি দেখেছিলাম। তখন নির্মলবাবুর কথা বারংবার মনে হয়েছিল। ছবিতে তিনিও ছিলেন। কিন্তু তিনি আর আমাদের মধ্যে ছিলেন না।)

নির্মলবাবু বলছিলেন, আমাদের দেশে উপকূলবর্তী অঞ্চলে শীতের সময় হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়। ১৭ ডিসেম্বর (১৯৪৬) গান্ধীজি যখন আশ্রম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে হাঁটছিলেন, তখন হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ল। শিখ সর্দারজি দৌড়ে গান্ধীজির কাছে এসে তাঁর গায়ের ইউনিফর্ম কোটটি খুলে গান্ধীজির মাথা ঢাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু গান্ধীজি রাজি নন। তখন শিখ সৈনিকটি গান্ধীজিকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটতে চাইলেন। গান্ধীজি তাতেও রাজি হলেন না। তখন অগত্যা গান্ধীজি যাতে পিছলে পড়ে না যান, সেজন্য শিখ সর্দার শক্ত করে গান্ধীজির হাত ধরে তাঁকে আশ্রমে পৌঁছে দিলেন। ৭৯ বছরের গান্ধীজি তখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। নোয়াখালিতে গান্ধীজির ঘরে বেশিরভাগ দিনই নাতনি মনু গান্ধী থাকতেন। কখনও কখনও মনুর সঙ্গে সুশীলা নায়ারও থাকতেন। মনুকে আগের দিন অন্য রিলিফ কেন্দ্রে পাঠানোতে গান্ধীজিকে পরিচর্যার দায়িত্ব সবটাই ছিল সুশীলার উপর। সুশীলা ডাক্তার হওয়ায় এক্ষেত্রে কিছু সুবিধাও ছিল। সুশীলা আপাদমস্তক ভেজা গান্ধীজিকে দেখে হাঁকডাক দিয়ে আমাকে ও হেমপ্রভাদিদিকে ডাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে একা একাই গান্ধীজিকে মুছিয়ে শুকনো কাপড় পরিয়ে গান্ধীজিকে কয়েকটা কম্বল দিয়ে চাপা দিলেন। কিন্তু তাতেও গান্ধীজির কাঁপুনি থামছেনা দেখে সুশীলা নিজে নিজেই একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা আমরা জানি যে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের দেহের উত্তাপ অনেকটাই বেশি। সুশীলা মেয়ে হিসাবে এটা জানেন, ডাক্তার হিসাবে আরও বেশি জানেন। সুশীলা সেই মুহূর্তে গান্ধীজির শরীরের উত্তাপ ফিরিয়ে আনার জন্য কতগুলি কম্বল শুদ্ধ গান্ধীজিকে বুকে জাপটে ধরে ঝাঁকাচ্ছিলেন। গান্ধীজির ঘরের দরজা কখনওই ভিতর থেকে বন্ধ থাকে না, সব সময় ভেজানো থাকে এবং ওই সময় ভেজানো দরজা ঠেলে পরশুরাম গান্ধীজিকে কিছু বলার জন্য ঢোকেন। সুশীলা গান্ধীজিকে যে ঝাঁকাচ্ছিলেন, তা পরশুরাম দেখেন। এই দৃশ্যটা পরশুরামের অনুভূতিতে ভাল লাগেনি। এটাই পরশুরামের গান্ধীজিকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ। সুশীলার এই ব্যবস্থা গান্ধীজিও বিব্রতভাবে গ্রহণ করেছেন। যার জন্য তিনি নিজে কপালে করাঘাত করেছিলেন, যেটা আমি মনে করেছিলাম গান্ধীজি বুঝি সুশীলাকে চড় মেরেছেন। কিন্তু আসলে বিব্রত গান্ধীজি নিজের কপালে করাঘাত করেছেন।'

আমি নির্মলবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ডা. সুশীলা নায়ারের কাছেও ব্যবস্থাছাড়া বিকল্প কিছু ছিল কিনা। নির্মলবাবু জবাব দিয়েছিলেন 'সম্ভবত নয়। সুশীলা যদি গান্ধীজির আত্মজা হতেন, তাহলে হয়ত তিনি ওই ব্যবস্থাই নিতেন। কিন্তু সুশীলার উচিত ছিল হেমপ্রভাদিদিকে ও আমাকে চেঁচিয়ে ডাকা। কিন্তু তিনি তা করলেন না। এটা তাঁর

মাতব্বরি মনোভাব। সুশীলার এই মানসিকতা আমি অন্যভাবে অনেকবার দেখেছি। এটা কিন্তু মনু গান্ধীর মধ্যে আদৌ ছিল না। বিহারে (মার্চ, ১৯৪৭) ও বেলেঘাটায় (আগস্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) মনু ও আমার ওপর গান্ধীজির সব দায়িত্ব ছিল। ফলে নিজেদের মধ্যে কখনওই কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি।' আমার আর একটি বিষয়ে কৌতূহল নির্মলবাবুর কাছে ছিল। সেটি ছিল যে কেন তিনি *My Days with Gandhi* গ্রন্থে ওই ব্যাখ্যাটুকু দিলেন না। এখানে নির্মলবাবু বলেছিলেন, বইটিতে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ব্যাখ্যার জায়গা তিনি রাখেননি। কোথায়ও তিনি 'শোনা কথা' ব্যবহার করেননি। যেমন ১৭ ডিসেম্বর (১৯৪৬) সকালে গান্ধীজির বৃষ্টিতে ভেজার ব্যাপারটা তিনি সবিস্তারে শিখ সর্দারজির কাছ থেকে শুনেছেন। এরপর নোয়াখালিতে গান্ধীজি যাতে ওরকম অবস্থায় না পড়েন, সেজন্য ওইদিন থেকে সর্দারজি একটি ছাতা সঙ্গে রাখতেন। এছাড়া হেমপ্রভা মজুমদার চার-পাঁচটি ছোট হাঁড়িভর্তি তুষ রেখেছিলেন। গান্ধীজি শীতে কাতর বোধ করলে তুষের হাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। পূর্ববাংলায় গরিব গৃহস্থবাড়িতে শীতের মরশুমে এটা ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। ট্যান্ডনের বিরূপ সমালোচনা সম্পর্কে নির্মলবাবু আমাকে জানিয়েছিলেন যে ট্যান্ডন তাঁকে কোনও চিঠি লেখেননি। অথচ ট্যান্ডনের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট আলাপ পরিচয় ছিল। National Herald পত্রিকায় ট্যান্ডনের সমালোচনা প্রকাশের পর নির্মলবাবুর সমর্থনে জওহরলাল নেহরুর বিবৃতিপ্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নেহরুর কাছ থেকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পেয়েছিলেন। নেহরু বইটিকে (*My Days with Gandhi*) গান্ধীজির শেষ জীবনের এক ঐতিহাসিক দলিল বলেছিলেন। এর বছর দু'য়েক পরে ১৯৫৭ সালে নেহরু বেশ কয়েকদিন কলকাতায় থাকার সময় নির্মলবাবুকে দেখা করতে বলেছিলেন। তিনিও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নির্মলবাবু ১৯৬৪ সালে এই বিষয়ে কথা বলার সময় বারংবার আমাকে সাবধান করেছিলেন 'কিছু না লেখার জন্য।' কারণ 'সেক্ষেত্রে তোমার লেখার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। আর আমি তখন তোমার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য বেঁচে থাকব না।' তাঁর এই শেষের উক্তিটি ভীষণ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল মাত্র দু'বছর পরেই। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন তখন।

আমিও ওই বিষয়ে আদৌ কিছু লিখব বলে ভাবিনি। কিন্তু ১৯৯৩ সালে মহাত্মা গান্ধীর জন্মের ১২৫ বছরকে স্মরণ করার জন্য তখনকার প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও একটি জাতীয় কমিটি গঠন করলেন। ওড়িশার বিখ্যাত সমাজবাদী নেতা ও গান্ধীভক্ত সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী ছিলেন ওই কমিটির সভাপতি। গান্ধীজি সম্পর্কে আমার যাবতীয় ইংরাজি ও বাংলা লেখার কপি আমি দ্বিবেদী মহাশয়কে পাঠাই। আমার ওই লেখাগুলির সবই ছিল ১৯৪৬-৪৭ সালের প্রেক্ষাপটে। সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদীর সঙ্গে আমার রিপোর্টার হিসাবে অল্প পরিচয় ছিল। তিনি একসময় লোকসভার ও রাজ্যসভার তীক্ষ্ণ শ্লেষযুক্ত ও নির্ভীক বাগ্মিতার জন্য বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি আমার চিঠি পেয়ে যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে তিনি নির্মলবাবুর *My Days with Gandhi* গ্রন্থটির উল্লেখ করে বেশ কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। উপলক্ষ সেই ডা. সুশীলা নায়ার ও পরশুরামের নোয়াখালি থেকে চলে আসা। পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের মতো দ্বিবেদীমহাশয়েরও ধারণা যে নির্মলবাবু তাঁর বইটিতে গান্ধীজির 'চরিত্রে কালিমা লেপনের' চেষ্টা করেছেন। সেইসঙ্গে সুরেনবাবু আমাকে একথাও জানান যে, মালতী চৌধুরি নোয়াখালির প্রেক্ষাপটে গান্ধীজি সম্পর্কে একটি বই প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। উল্লেখযোগ্য যে এক অসাধারণ নির্ভীক গান্ধীবাদী মহিলা মালতী চৌধুরিও নোয়াখালিতে গান্ধীজির সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলেন। যেহেতু গান্ধীজির শেষের দিনগুলি সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ সেজন্য সুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী আমাকে ওড়িশার অঙ্গুল (Angul) গান্ধী আশ্রমে (যেখানে মালতী চৌধুরি থাকেন) খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন। এই চিঠিটি আমি ১৯৯৩ সালের শেষদিকে পাই। সুরেনবাবুর চিঠি পাওয়ার পর আমি তো কিছুদিন ধরে ভেবেছি অঙ্গুলে যাওয়ার কথা। কারণ মালতী চৌধুরি সম্পর্কে আমি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করি। তাছাড়া আমি তাঁকে আন্দোলনের কর্মী হিসাবে কলকাতায় জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে অনেকবার দেখেছি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুনের মধ্যরাতে দেশে জরুরি অবস্থা জারির বিরুদ্ধে যে মহিলার প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছিল তিনি ছিলেন মালতী চৌধুরি। পরের দিন বিজু পট্টনায়কের হাত ধরে ভুবনেশ্বরের পথে পথে বিক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেফতার বরণ করেছিলেন মালতী চৌধুরি। ১৯৮৭ কিংবা ১৯৮৮ সালে ভারত সরকারের গান্ধী শান্তি পুরস্কার তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ ওই পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হাত থেকে গ্রহণ করতে হবে বলে। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে অঙ্গুল যাব মনস্থ করে আমি ভুবনেশ্বর গেলাম। ভুবনেশ্বর থেকে অঙ্গুল আশ্রমে ফোন করে খবর নিলাম যে মালতী চৌধুরি এতই অসুস্থ যে তিনি অর্ধচেতনায় আচ্ছন্ন। তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এভাবে ভুগতে মালতী চৌধুরি ১৯৯৮ সালে চিরবিদায় নিলেন।

(ক্রমশ)

উপনিবেশের প্রতিপ্রবাহ : দীন মহম্মদ

সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত

The power to narrate, or to block other narratives from forming and emerging...constitutes one of the main connections between culture and imperialism...From the begining of Western speculation about the orient, the one thing the orient could not do was to represent itself.

—Edward Said

এশিয়া মহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পর্বে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত ভারত থেকে বিলাতে যাওয়া মানুষেরা কীভাবে ব্রিটিশ-সমাজে যুক্ত হয়েছেন তা বেশ কিছুকাল ধরে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। উপনিবেশবাদী ও উপনিবেশবাসীর সম্পর্কের বিবর্তন, বিভিন্ন কালপর্যায়ে এই সম্পর্কের রূপ, প্রাক্তন উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটেনে অভিবাসন—গবেষণার প্রেক্ষাপটটি বিপুল। সমসাময়িক গবেষকদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত নাম অধ্যাপক মাইকেল ফিশার। তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে ১৭৯৪ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রকাশিত *The Travels of Dean Mahomet* গ্রন্থটি দু'শো বছর পরে বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে এসেছে এবং দীন মহম্মদ স্বীকৃতি পেয়েছেন ইংরাজি ভাষার প্রথম এশীয়, ভারতীয় তথা বাঙালি (দীন আত্মপরিচয়ে নিজেকে বাংলার মানুষ বলেছেন) লেখক হিসাবে।

ভারতীয়দের বিলাতে যাওয়া এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া শুরু হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায়। প্রথম দিকের অভিবাসীরা বিলাতে গিয়েছিলেন ভারত-প্রত্যাগত ইংরাজ রাজপুরুষদের ভৃত্য হিসাবে কিংবা জাহাজের নাবিক হয়ে। রাজকীয় দূত বা অতিথি এবং ভ্রমণকারী হিসাবে বিলাতে গেছেন ও ফিরে এসেছেন এমন ভারতীয়ের সংখ্যাও কম নয়। দীন মহম্মদ এদের থেকে আলাদা। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি বিলাতে গিয়ে পেশাদার হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাধীন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিচিত্র সব পেশায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি। কফি হাউস ও ভেপার বাথ হাউসের পরিচালনা, ভারতীয় দাঁতেরমাজন ও কলপের বিপণন ইত্যাদি। সবকিছু ছাপিয়ে এত বছর পর তাঁর নাম আলোচিত হচ্ছে পূর্বোক্ত গ্রন্থটির জন্য।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত দীন মহম্মদের নাম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে ছিল। ওহিও-র ওবারলিন কলেজের ইতিহাস বিভাগের ড্যানফোর্থ-অধ্যাপক মাইকেল এইচ ফিশার হঠাৎ দীন মহম্মদকে আবিষ্কার করেন। ফিশারের অধ্যয়নের বিষয় বিলাতে আদিভারতীয় অভিবাসীদের জীবনচর্যা। আঠারো শতকের একটি গ্রন্থতালিকায় দীন মহম্মদের নাম তাঁর চোখে পড়ে। ওই দীর্ঘ তালিকায় আর কোনও ভারতীয় লেখকের নাম ছিল না। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আয়ারল্যান্ডের কর্ক শহরের একটি সন্ন্যাসিনীদের মঠে তিনি বইটি খুঁজে পান। এরপর ছ'বছর গবেষণা চালিয়ে ফিশার দীনের জীবনের অনেক অজানা অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত উদ্ধার করেন। তাঁর সম্পাদনায় ১৯৯৬ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে—*The First Indian Author in English : Dean Mahomed (1759-1851) in India, Ireland and England* বইটি। ১৯৯৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিশারের ভূমিকাসহ *'The Travels of Dean Mohamet : An Eighteenth century Journey through India'*, প্রকাশিত হয়।

দীন মহম্মদের শৈশব, বেঙ্গল আর্মির কর্মজীবন এবং আয়ারল্যান্ড পৌঁছনোর কাহিনি Travel-এর উপজীব্য। তাঁর জীবনের বাকি অংশ ছ'বছরের গবেষণায় পূর্ণ করেছেন ফিশার। বিদেশের সম্পূর্ণ অচেনা সমাজে জীবনধারণের জন্য তীব্র ও দীর্ঘ লড়াই ফুটে উঠেছে এই প্রবাসী ভারতীয়র জীবনকথায়। অন্যদিকে তাঁর জীবনের বিভিন্ন কালপর্বের ঘটনাপ্রবাহ, দীনের রচনার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও রচনাশৈলী থেকে ফিশারের অনুসন্ধিৎসায় উন্মোচিত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সূচনা-পর্বের দান ও প্রতিদানের জটিল সম্পর্কের হারিয়ে যাওয়া সূত্র।

(২)

শেখ দীন মহম্মদের জন্ম পাটনাতে, ১৭৫৯ সালে। দীন লিখেছেন, তাঁদের এবং মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবার ছিল একই বংশগৌরবের অধিকারী। তাঁর বাবা ছিলেন বেঙ্গল আর্মির সুবাদার। ১৭৬৯ সালে বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে দীন বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দেন।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে যখন বাংলায় ও অন্যত্র কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব বাড়তে থাকে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তিনটি প্রেসিডেন্সির জন্য পৃথক সেনাবাহিনী গঠন করে। আয়তনে সব থেকে বড় ছিল বেঙ্গল আর্মি। ক্রমক্ষয়িষ্ণু মুসলমান শাসন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বেকার সামরিক পেশাদারের জন্ম দিয়ে চলেছিল। এই সামরিক বাজার থেকেই পেশাদার ও অপেশাদার সৈন্য সংগ্রহ করে তৈরি হয় বেঙ্গল আর্মি। অভিজাত মুসলমান পরিবারের সদস্যরা বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দিলে প্রায় সরাসরি ইউরোপীয় অফিসারদের ঠিক নীচে, উচ্চমর্যাদার পদ লাভ করতেন। বাংলার নবাব এবং অন্যান্য স্থানীয় মুসলমান শাসকদের ক্ষমতা যত খর্ব হয় সমরকুশল মুসলমানেরা তত বেশি সংখ্যায় যুক্ত হতে থাকে কোম্পানির বাহিনীতে।

দীন মহম্মদের বাবা ছিলেন বেঙ্গল আর্মির সুবাদার। একজন ভারতীয় তখন কোম্পানির বাহিনীতে এর থেকে উঁচুর কোনও পদে যেতে পারত না। সেটা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মাটিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর্ব। বিহারের নায়েব দেওয়ান সিতাব রায় ও পাটনা রেভিনিউ কাউন্সিলের প্রধান টমাস রামবোল্ডকে রাজস্ব আদায়ের কাজে সাহায্য করত যে সেনাদলগুলি, তার একটির সুবাদার ছিলেন দীন মহম্মদের বাবা। ১৭৬৯ সালে যখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শুরু হয়েছে, দুর্ভিক্ষপীড়িত বিহারের তাজপুরে রাজস্ব আদায় অভিযানে স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। হত্যাকারী জমিদারদের ধরা হয়। অচিরেই তারা প্রদেয় রাজস্বের থেকে আরও বেশি অর্থ কোষাগারে জমা দেওয়ার শর্তে মুক্তিও পেয়ে যায়।

দীন মহম্মদ বেঙ্গল আর্মিতে যোগ দিলেন ১১ বছর বয়সে। পাটনাতে সিতাব রায়ের প্রাসাদে টেনিস পার্টিতে ক্যাপটেন গডফ্রে ইভান বেকারের চোখে পড়ে দীন মহম্মদকে। এই আইরিশ যুবক তখন বেঙ্গল আর্মিতে সদ্যনিযুক্ত হয়ে ভারতে এসেছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন থার্ড ব্রিগেডে 'ক্যাম্প ফলোয়ার' পদে ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানের কাজ পেলেন দীন।

১৭৭১-১৭৮৩ কালপর্বে দীন মহম্মদের Travel-এ পাওয়া যায় ইংরেজ শাসন সংহত হওয়ার পর্বের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। ১৭৭১ সালে বেকারের ব্রিগেডকে যেতে হয় উত্তর ভারতে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন বেশ জটিল। বিহারের পশ্চিম সীমানা দিয়ে কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলে মারাঠা আক্রমণ শুরু হয়েছে। থার্ড ব্রিগেডকে পাঠানো হয় কর্মনাশা নদীর তীরে বকসারে। কোম্পানি বাহিনীর লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে এই এলাকার মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটে কোম্পানির শাসনের সঙ্গে। গ্রীষ্মকালে মারাঠা আক্রমণ কমে গেলে সম্ভাব্য ফরাসি আক্রমণ প্রতিরোধে তারা রওয়ানা হন কলকাতার পথে। রাজমহল গিরিশ্রেণি ও গঙ্গার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ দিয়ে যখন তাদের বাহিনী বিহার থেকে বাংলায় প্রবেশ করে তখন বারবার সংঘর্ষ হয় পাহাড়ি উপজাতিগুলির সঙ্গে। পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী গ্রামগুলির শান্তি বিঘ্নিত করত মাল পাহাড়িয়ারা। এদের নির্মমভাবে দমন করার চেষ্টা করা হয়। ইংরেজ বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে তাদের মেরে পথের পাশে আধমাইল পরপর গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হত সঙ্গীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য। কলকাতা যাওয়ার পথে এমন বহু ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখেছেন দীন।

থার্ড ব্রিগেড কলকাতায় পৌঁছয় ১৭৭২ সালের মে মাসে। পরের ছ'মাস তাঁরা ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। তখনকার কলকাতার মুগ্ধ বর্ণনা আছে ট্রাভেলস-এ। আছে চিনাবাজার, লালবাজার, ধর্মতলা, চৌরঙ্গি, বৈঠকখানা, খিদিরপুর, মেছুয়াবাজার, চাঁদপালঘাট ইত্যাদির প্রসঙ্গ।

১৭৭৩-৭৪ এই দু'বছর বেকারের বাহিনী অবস্থান করে বহরমপুরে। কিছুকাল আগে কোম্পানি সেখানে বড় সেনা ছাউনি বানিয়েছিল। পাশেই নবাবি শাসনকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ। এখানে দীন পুনরাবিষ্কার করলেন তাঁর আত্মপরিচয়। নবাব পরিবার ও অভিজাত মুসলমান শাসকবর্গের সমমর্যাদার বংশ-পরিচয় যে তিনি বহন করেন তা উল্লেখ করতে ভোলেননি দীন মহম্মদ। তাঁর ট্রাভেলস-এর অনেকগুলি চিঠিই মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অভিজাতর বর্ণনা। কোনওটা মুর্শিদাবাদবাসী আত্মীয়ের বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কাহিনি, কোনওটা বা বিবাহ অনুষ্ঠানের, নবাবি শোভাযাত্রার বিবরণ।

দীন মহম্মদের কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ নগরীর বর্ণনা পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় কীভাবে ভবিষ্যতের রাজধানী মহানগর হিসাবে কলকাতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। মুর্শিদাবাদ তখনও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী। কিন্তু ক্রমক্ষয়িষ্ণু। ধীরে ধীরে তার গৌরবচ্ছটা ফিকে হয়ে

আসছে। নবাব পেনশনভোগী। নবাবের কর্মচারীদের হাত থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতা ক্রমশই সরে যাচ্ছে কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে। নবাবি আমলের অভিজাতদের উপার্জন কমছে। দীন মহম্মদের পরিবার এককালে পরিণত হয়েছিল নবাব বংশের হৃতগৌরব শাখায়। যেন সেই দৃশ্যের পুনরভিনয় দেখছেন দীন।

বহরমপুর থেকে অযোধ্যা। ১৭৭৫ সালে অযোধ্যার কাছে বিলগ্রামে শিবির স্থাপন করল থার্ড ব্রিগেড, রোহিলা আফগানদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লাকে সাহায্য করার জন্য। দু'বছর পর অযোধ্যার পাট চুকিয়ে আটশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা ফিরলেন কলকাতায়। এই কালপর্বের বর্ণনায় পাওয়া যায় অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস, দিল্লির কথা। মুঘল সম্রাট তখন মারাঠাদের হাতে প্রায়সবন্দি। মধ্য-গাঙ্গেয় সমভূমির বহু গ্রাম, বহু মানুষ, তাদের জীবনের টুকরো ছবি ভেসে ওঠে দীন মহম্মদের বর্ণনায়। বারাণসী তাঁকে মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা। হিন্দু-মুসলিম ভেদের ঊর্ধ্বে তার চমৎকার বর্ণনা ফুটিয়ে তোলেন তিনি।

১৭৭৮-৭৯ সারা সময়টা কলকাতায় কাটান এবং ১৭৭৯-৮০ কালপর্ব কাটে বহরমপুরে। ১৭৮১ সালে বেকারের পদোন্নতি হয়। বেকারের দাক্ষিণ্যে পদোন্নতি হয় দীন মহম্মদেরও। দীনের কর্মজীবনের শেষ সামরিক অভিযান হয় বেনারসে। মিত্রতার শর্ত লঙ্ঘন করায় বেনারসের রাজা চৈত সিংহকে দমন করতে অগ্রসর হয় কোম্পানির বাহিনী। শেষ পর্যন্ত মেজর পপহ্যামের বাহিনীর হাতে চৈত সিংহের চূড়ান্ত পরাজয় হয় এবং রাজা বেনারস ছেড়ে পালিয়ে যান। রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে জমিদার করে প্রকৃত শাসন নিজের হাতে তুলে নেয় কোম্পানি। রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো হয়। চৈত শাসন যে অসন্তোষের জন্ম দেয় তা প্রশমনে বেনারসের গ্রামাঞ্চলে অভিযান চালায় বেঙ্গল আর্মি। এ সময় বেকার ও তার বাহিনী গ্রামে কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নামে ব্যাপক অত্যাচার চালাচ্ছে ও জোর করে প্রচুর অর্থ আদায় করছে—এই অভিযোগে বেকারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। তাঁকে সক্রিয় দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তদন্তে নির্দোষ প্রতিপন্ন হলেও বেকার পদত্যাগ করেন। তত্তদিনে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য যে পর্যাপ্ত সঞ্চয় করে নিয়েছিলেন বেকার, তা সহজেই অনুমেয়।

পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার আগে বেনারস থেকে ফিরে বেকার ও দীন মহম্মদ ঢাকা ও সুন্দরবন ভ্রমণে যান। কেবল পর্যটন নয়, বাণিজ্যিক স্বার্থ ছিল। বিশেষত ঢাকা তখন মসলিন ও আরও কিছু পণ্যের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। দীন মহম্মদ তখন কর্মহীন। ফলে ক্যাপ্টেন বেকারের সঙ্গী ও আশ্রিত হয়ে দিন কাটে তাঁর। বেকার এই সময়টাকে কাজে লাগান তাঁর ব্যবসাপত্র গোছাতে। ১৭৮৩ সালের ২৭শে নভেম্বর বেকারের কর্মজীবন শেষ হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কের শেষ সুতোটি ছিঁড়ে ফেলে বেকার ও দীন মহম্মদ বিলেতে পাড়ি জমান। কোম্পানির জাহাজ নয়, তাঁরা বিলাতযাত্রা করেন ডেনিস জাহাজে। কোনও সন্দেহ নেই বে-আইনি পথে পণ্য নিয়ে যাওয়া ও শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে শত্রুজাহাজ ছদ্দ করা হয়েছিল। সেকালে স্মাগলিঙের জন্য কুখ্যাত ডার্টমাউথ বন্দর হয়ে কর্ক বন্দরে যায় জাহাজটি এবং সেখানেই আয়ারল্যান্ডের মাটিতে পা রাখেন তাঁরা। প্রসঙ্গত কর্ক বন্দরের হারবার মাস্টার ছিলেন বেকারের বাবা।

(৩)

১৭৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁরা পৌঁছন ডার্টমাউথ বন্দরে। এখানেই তাঁর 'Travels' শেষ করেছেন দীন মহম্মদ।

বেকার-পরিবার ছিল কর্কের অভিজাত ভূম্যধিকারী শ্রেণির অংশ। তাঁদের সৌজন্যে কর্কের অভিজাত অ্যাংলো-আইরিশ-প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজে প্রবেশাধিকার পেলেন দীন মহম্মদও। এসময় বেকারের পরামর্শ ও সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরাজি ভাষাশিক্ষা শুরু হয় তাঁর। ১৭৮৬ সালে হঠাৎই বেকারের মৃত্যু হল। ওই বছরেই দীন বিয়ে করলেন জেন ভ্যালি নামে এক প্রোটেস্ট্যান্ট তরুণীকে। চার্চের কাগজপত্র থেকে মনে হয় ইতিমধ্যে দীন আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করেছিলেন।

আয়ারল্যান্ডে বসবাসের দশ বছরের মাথায়, ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হল তাঁর *The Travels of Dean Mahomet A Native of Patna in Bengal*। বইটি প্রকাশের আগে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তিনি। তেমনই রেওয়াজ ছিল তখন। গ্রাহকমূল্য ছিল দু'শিলিং ছয় পেন্স। অগ্রিম মূল্য দিয়ে গ্রাহক হয়েছিলেন ৩২০ জন।

পরিচিতজনকে চিঠি লেখার আঙ্গিকে লেখা এই বইয়ের প্রথম চিঠিতে বইটি লেখার দু'টি উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন দীন। প্রথম তাঁর দেশ ও দেশবাসীর পরিচয় তুলে ধরা এবং দ্বিতীয় তাঁর নিজের কথা, কর্মজীবন ও সেই সূত্রে তাঁর দেখা জায়গাগুলির বিবরণ দেওয়া। মূল উদ্দেশ্য ভারত তথা প্রাচ্য সম্পর্কে সেদেশের মানুষের কৌতূহল-নিবৃত্তি।

ধরে নেওয়া যায় এই লেখার পিছনে দীন মহম্মদের সামাজিক আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নও কাজ করেছিল। কর্কের

অ্যাংলা-আইরিশ প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজে, বিশেষত অভিজাতদের সঙ্গে মেশার সুযোগ ও সম্মান পেলেও নানা দিক থেকে দীন মহম্মদ একক ছিলেন। জন্মসূত্রে, গাত্রবর্ণে, সংস্কৃতিতে তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গদের থেকে আলাদা। অন্যদিকে পরিচারিকা, ভৃত্য বা কর্মচারী শ্রেণির যে ভারতীয়রা কর্কে বাস করত তাদের সঙ্গেও তিনি একাত্ম হতে পারতেন না। বেকার-পরিবারের আনুকূল্যে এবং ভারতে থাকাকালীন চাকরির সূত্রে তাঁর কিছু ধনসম্পত্তি ছিল। কর্কে তাঁর নিজের একটি বাড়িও বানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বেকারের ছোটভাই উইলিয়াম বেকারের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি। ১৮০০-০৬ সাল ভারতে কাটিয়ে উইলিয়াম স্থায়ীভাবে কর্কে ফিরে আসেন। ১৮০৭ সালেই দীন কর্ক ছেড়ে, আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন লন্ডনে, শুরু করেন বিলাত প্রবাসের দ্বিতীয় ইনিংস। লক্ষণীয় আয়ারল্যান্ড বাসের ২৩ বছরের (১৭৮৭-১৮০৭) ঘটনা সম্পর্কে দীন মহম্মদ বাকি জীবন নীরবতা পালন করেছেন। অনুমান করা যায় প্রথমাবধি দীন আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকটে গ্রস্ত ছিলেন। হয়ত ওই স্বজনহীন সমাজে নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠার বাসনা তাঁকে প্রণোদিত করেছিল বইটি লিখতে।

দীন মহম্মদ যখন প্রবাসজীবন শুরু করেন তখন ভারত তথা পূর্বদেশ নিয়ে বিলেতে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ভারত-প্রত্যাগত কোম্পানি কর্মচারীর ও অন্যান্যদের কিছু বিবরণ প্রকাশিত হলে তা নিয়ে উৎসাহ দেখা যেত। সে ধরনের লেখাতে থাকত বিপুল তথ্য-বিভ্রান্তি। রেভারেন্ড জেম্‌স লঙ তাঁর সুবিখ্যাত On the Banks of River Bhagirathi প্রবন্ধে এ ধরনের লেখার উল্লেখ করেছেন : Beside Haber's Journal there are scarcely any journal of travellers worth notice on Bengal, in a recent work. 'Bacon's First impressions'. It is stated, that after leaving Barrackpore 'a few hours trecking brought us to Serampore'! The author gives a drawing of a Fakir's serai on the banks of the river near Hugly with a hill in the vicinity!' তথ্যগত ভ্রান্তির থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে, এ ধরনের রচনায় কাজ করত দৃষ্টিভঙ্গি। ঔপনিবেশিকদের চোখে দেখা ভারত ও তার জনগণের ছবি ফুটে উঠত এতে। উপনিবেশের দেশ-কাল-মানুষকে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন সাম্রাজ্যবাদের, ঔপনিবেশিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে (Mary Louise Pratt এর ভাষায় imperial eyes বা imperian gaze) এবং সেভাবেই তাদের হাজির করেছেন প্রতীচ্যের পাঠকের সামনে। ইংরাজি তথা কোনও ইউরোপীয় ভাষায় ভারতীয়র চোখে ভারতবর্ণনায় দীন মহম্মদই পথিকৃৎ। সে অর্থে Travel যেন এক প্রতিস্পর্ধী সৃষ্টি। ইউরোপের পাঠকের কাছে ভারতবর্ণনা ইংরাজ তথা ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার নয়। উপনিবেশের মানুষেরও ভাষা আছে, স্বপ্রকাশের সাহস আছে।

এই প্রসঙ্গে ফিশার টেনে আনেন ওলাউদা ইকিয়ানোর কথা। আফ্রিকান, প্রাক্তন দাস ইকিয়ানো দীন মহম্মদের সমকালের দাসবিরোধী সংগ্রামী। ১৭৮৯ সালে, অর্থাৎ Travel-এর পাঁচ বছর আগে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *'The Interesting Narrative of the life of Olaudah Equiano...The African, Written by Himself'*। এই বইটি সোচ্চারে ঘোষণা করে আফ্রিকানরাও মানুষ, সম্পত্তির মতো তাদের যথেচ্ছ কেনাবেচা অনৈতিক, অমানবিক। ১৭৯১ সালে, অর্থাৎ দীন মহম্মদ যখন কর্কে বাস করছেন, ইকিয়ানো তাঁর বই ও বক্তব্যের প্রচারে কর্ক তথা আয়ারল্যান্ড ঘুরে গেছেন। অর্থাৎ অ-ইউরোপীয় উৎসের সাহিত্যের একটা প্রেক্ষাপট সেখানে তৈরি হচ্ছিল।

দীন মহম্মদের ট্রাভেলস লেখা হয়েছিল পত্রাবলির আকারে। সেসময় লেখকদের মধ্যে এটা ছিল সবথেকে জনপ্রিয় স্টাইল। এই স্টাইলে খোলাখুলি, অন্তরঙ্গভাবে লেখার ভাব ফুটে উঠত। যেন পাঠকদের সঙ্গে সরাসরি পত্রালাপ করছেন লেখক। এছাড়া দীন তাঁর লেখার মধ্যে অনুবাদ না করেই বহু ল্যাটিন উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এভাবে যেন উচ্চবর্গীয় পাঠককুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ একাত্ম করেছেন নিজেকে। বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে দীন যথাযথ তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন ১৭৬৯-৮৪ সময়কালের ভারতবর্ষের কথা। রচনাকাল ১৭৯৩। তা সত্ত্বেও দীন মহম্মদ তাঁর লেখায় বিভিন্ন স্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের যে বর্ণনা দিয়েছেন দু'-একটি ক্ষেত্র ছাড়া তা প্রায় নির্ভুল। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় সমকালে প্রকাশিত অন্য বই ও লেখা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি। সাহিত্যগুণান্বিত ইংরাজিতে, আধুনিক আঙ্গিকে, নির্ভুল স্থানিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনার পিছনে তাই গবেষকদের অনেকেই অন্য কোনও ইংরাজ লেখকের ভূমিকা খুঁজেছেন। উপনিবেশের এক নেটিভ কর্মচারী তথা ব্রিটিশ ভক্তের সৃজন ক্ষমতা স্বীকার করতে বর্তমানকালের গবেষকদের অনীহা থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর সমকালে দীন মহম্মদের রচনা ইংরাজিভাষী ঔপনিবেশিক সমাজে কতটা আদৃত হয়েছিল। মাইকেল ফিশার তাঁর শ্রমসাধ্য গবেষণায় প্রমাণ করেছেন ট্রাভেলস দীনের স্বকীয় সৃষ্টি। সমসাময়িক অন্য

লেখা তিনি গ্রহণ করেছেন, অনেক সময় সেই গ্রহণ 'প্লেগিয়ারিজম'-এর পর্যায়েও গেছে তথাপি তা হয়ে উঠেছে দীনের নিজেরই লেখা, উচ্চারিত হয়েছে তাঁরই কণ্ঠস্বরে।

কিন্তু তা কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদা অধিকৃত ভারতীয় উপনিবেশের কোনও মানুষের কণ্ঠস্বর? ইউরোপীয়দের ভারতবর্ণনার থেকে তা কি মৌলিকভাবে আলাদা? সমসাময়িক গবেষকদের অনেকে এ প্রশ্নও তুলেছেন। দীন মহম্মদের বাবা ছিলেন কোম্পানির বেঙ্গল আর্মির দেশীয় অফিসার। দীন মহম্মদ পাটনাতে যে পরিবেশে বড় হয়েছেন তাও এক ব্রিটিশ-অনুগত পরিমণ্ডল। নিজে মাত্র এগারো বছর বয়সে যোগ দিয়েছেন বেঙ্গল আর্মিতে। যে 'ভ্রমণ' কাহিনি তিনি লিখেছেন, তা সবই বেঙ্গল আর্মির কর্মচারী হিসাবে বিভিন্ন সামরিক অভিযানে যুক্ত থাকার বা বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে বসবাসের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত! এছাড়াও জন্মসূত্রে শাসক অভিজাত সম্প্রদায়ের শরিক হওয়ায় তাঁর দেখার চোখ খুব ভিন্ন ছিল না। মুঘল শাসন থেকে ব্রিটিশ শাসনে পরিবর্তনের সেই তরল কালপর্বে দীন মহম্মদ ভারতকে শাসকের চোখে দেখবেন না —এ আশা বাতুলতা, বিশারের ভাষায় anachronistic expectation। ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম অনেক পরে। উপনিবেশবাদী ও উপনিবেশবাসী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পরিচয়ের সংঘাত তখনও তীব্র হয়নি। গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া সদ্য শুরু হয়েছে মাত্র। আর দীন মহম্মদ লিখেছেনও তো এলিট ও আইরিশ পাঠকের জন্য।

আসলে দীন মহম্মদ তাঁর ট্রাভেলস লিখছেন সাংস্কৃতিক উত্তরণের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে। আশিশেরর ভারতীয় পরিবেশ ও সংস্কৃতি এবং কর্মজীবনের ব্রিটিশ সঙ্গের দু'য়ের প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত। তাঁর অবস্থান মধ্যবর্তী। এ যেন কিছুটা তাঁর লেখার ভাষা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মতো। ইংরাজিভাষী সমাজের জন্য বিলেতি আঙ্গিকে আত্মজীবনীমূলক ভারতবর্ণনা। দীনও ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের মানুষ। বিদেশে এসে বাস করেছেন ইংল্যান্ডের আর এক উপনিবেশ আয়ারল্যান্ডে, শাসনক্ষমতার অংশীদার প্রোটেস্ট্যান্ট সমাজে। সেখানেও তিনি শাসিত-কাথলিক-সমাজ ও শাসক-প্রোটেস্ট্যান্টদের থেকে আলাদা একটা অবস্থান খুঁজেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় কীভাবে একটা Social space তৈরি হয় যেখানে ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির মিলন, সংঘাত, জমির লড়াই চলে, উপনিবেশবাসীর নিজস্ব কণ্ঠস্বর ভাষা পায়, দীন মহম্মদের লেখা, এবং তারও বেশি, দীন মহম্মদের জীবনসংগ্রাম তার বড় উদাহরণ। আয়ারল্যান্ড ও ব্রিটেনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াই আসলে ভারতীয় উপনিবেশের এক মানুষের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াই। তাই, কী প্রক্রিয়ায় উপনিবেশের গতিপ্রবাহ বাধিত হয় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে, তা বোঝার জন্য দীন মহম্মদের প্রবাসজীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হবে।

(৪)

১৮০৭ সালে আয়ারল্যান্ড ছেড়ে দীন মহম্মদ চলে আসেন লন্ডনে। লন্ডন তখনই কসমোপলিটান, দ্রুত বিকশিত হচ্ছে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যের রাজধানী-নগর হিসাবে। শিল্প-বিপ্লবোত্তর অর্থনীতি ও ঔপনিবেশিক শোষণের বলে সম্পদ ও প্রাচুর্যে বলীয়ান লন্ডনে তখন আয়ারল্যান্ড ভারত ও সাম্রাজ্যের অন্য দেশগুলি থেকে আসা শ্রমিক, বণিক, আধিকারিকদের ভিড়। ভারতীয় নাবিক বা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক আছে এমন বণিকদের মহল্লায় নয়, দীন ঘর বাঁধলেন লন্ডনের অভিজাত পল্লি পোর্টম্যান স্কোয়ারে।

দীন চাকরি নিলেন ভারত-ফেরত 'নবাব' বেসিল কচরেনের ভেপার বাথ থেরাপি কেন্দ্রে। অভিজাত মানুষদের স্বাস্থ্যোদ্ধার স্পৃহায় অচিরেই জনপ্রিয় হল ভেপার বাথ। কচরেন প্রচার করেছিলেন ভারতে থাকাকালীন এই ভেপার বাথ তিনি আবিষ্কার করেন। টাকার জোরে লন্ডনের ডাক্তারদের স্বীকৃতিও আদায় করে নিয়েছিলেন তিনি। ভেপার বাথ থেরাপি প্রয়োগে দীনের অবদান স্বীকার করেননি কচরেন। যাইহোক ভেপার বাথের সঙ্গে দীন যুক্ত করেন shampooing বা মালিশ। দীন তাঁর ট্রাভেলস্-এ লিখেছেন, ১৭৮৪ সাল থেকেই shampooing শুরু করেন তিনি। এর জনপ্রিয়তার ফলে আরও কয়েকটি বাণিজ্যিক হাউস চালু হয়ে গেল। ততদিনে দীন মহম্মদ ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি দিক লন্ডনবাসীদের চেনাতে মনস্থ করেছেন—তা হল ভারতীয় রন্ধনশৈলী।

১৮০৯ সালে দীন মহম্মদ লন্ডনে তাঁর রেস্তোরাঁ চালু করলেন। হিন্দুস্তান কফি হাউস ছিল পোর্টম্যান স্কোয়ারের কাছেই। দীনের লক্ষ্য ছিল মূলত ভারতপ্রত্যাগত অভিজাতরা। তাঁর কফি হাউসে আদৌ কফি পাওয়া যেত না। তাঁরা পরিবেশন করতেন ভারতীয় পদ্ধতিতে রান্না করা মশলাদার আমিষ ও নিরামিষ পদ। প্রথম দিকে হিন্দুস্তান কফি হাউস বেশ সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু লন্ডনের অভিজাত পল্লিতে একটি বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয়ভার ছিল খুব বেশি। দীন মহম্মদের হিন্দুস্তান কফি হাউস শেষ পর্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠতে পারেনি। ১৮৪২ তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণার আবেদন করেছেন।

এবার ব্রাইটনে একটি ভেপার বাথ-এ কাজ নেন দীন মহম্মদ। ব্রাইটন সে সময় সমুদ্রসৈকত হিসাবে খ্যাতিলাভ

করছে। যুবরাজ চতুর্থ জর্জ নিয়মিত ছুটি কাটাতে আসেন সেখানে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়েছে মেরিন প্যাভিলিয়ন। প্যাভিলিয়ন সাজানো হয়েছে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মুকুট ভারতবর্ষের আবহে। এ সময়েই ব্রাইটনে এসে পড়লেন দীন মহম্মদ এবং দ্রুত তাঁর বিবিধ ভারতীয় পণ্য ও সেবার বিপণন নজর কাড়ল ব্রাইটনের। দীনের পণ্যের মধ্যে ছিল ভারতীয় দাঁতের মাজন এবং চুল কালো করার কলপ।

তখনকার অন্য ভেপার বাথ থেকে নিজেদের আলাদা করতে নানা ভারতীয় ভেষজের ব্যবহার শুরু করলেন দীন। নাম দিলেন 'The Indian Medicated Vapour Bath'। ভেপার বাথ দেওয়ার যন্ত্রের নকশা পালটালেন তিনি। ভারতীয় তেল দিয়ে মালিশও চালু হল তাঁর বাথ হাউসে। ১৮১৮ সাল নাগাদ দীন তাঁর নতুন উপাধি প্রচারের আলোয় আনলেন—Shampooing Surgeon। এ বিষয়ের একটি বইও প্রকাশ করলেন ১৮২০ সালে *'The cases cured by Sake Dean Mohamed, Shampooing Surgeon, and Inventor of the Indian Medicated Vapour and Sea-Water Bath'*। এ সময় নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটল ভেপার বাথ শিক্সের, তা ছড়িয়ে পড়ল সারা ব্রিটেনে। ১৮১২ সালে ব্রাইটনে আরও ভাল অবস্থানে নতুন বাথ হাউস করলেন দীন।

Mahomed's Bath দীনের পেশাদার জীবনের সেরা সাফল্য। এ-সময় Cases Cured বইটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির তৃতীয় সংস্করণ হয় ১৮৩৮ সালে। দীন ইংল্যান্ডের দুই রাজা চতুর্থ জর্জ (১৮২০-৩০) এবং চতুর্থ উইলিয়ামের (১৮৩০-৩৭) Shampooing Surgeon হিসাবে নিয়োগপত্র পান। রাজকীয় নিয়োগপত্র অনুযায়ী প্রতি ভিজিটে তাঁর ফিজ ছিল এক গিনি। তিনি রাজদরবারে যেতেন দরবারি পোশাক পরে। রাজপুরুষরাও ছিলেন তাঁর অনুরাগী। রাজা ব্রাইটনে কবে আসবেন সে খবরও আসত দীনের কাছে। সুতরাং তখনকার ব্রাইটনে দীন মহম্মদের সামাজিক মর্যাদা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু ১৮৩০ দশকের শেষে তিনি রাজা উইলিয়ামের পৃষ্ঠপোষকতা হারান। ভিক্টোরিয়া রানি হওয়ার পর পরিস্থিতি একেবারে পালটে যায়। তিনি ব্রাইটনের রাজকীয় দরবার মেরিন প্যাভিলিয়ন গুটিয়ে ফেলেন।

জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত দীন মহম্মদকে পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। ১৮৫১ সালে ৯২ বছর বয়সে দীন মারা যান। মাহোমেডস বাথ তাঁর হস্তচ্যুত হয়। লন্ডনের বাথ হাউসগুলি অন্যের মালিকানায় দীনের খ্যাতিকে মূলধন করেই চলতে থাকে। কিন্তু দীন ততদিনে আবার নিঃস্বপ্রায়।

দীন মহম্মদ যে খুব মহান বা বড় মাপের মানুষ ছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাঁর ট্রাভেলস বা পরবর্তী জীবনের আলোচনায় ভারত তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের ও জনজীবনের সবচেয়ে জটিল কালপর্বের ছবি পাওয়া যায়। দীনের শৈশবে ভারতে মুঘলশাসন শেষ হয়ে আসছে। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘাতের পরিণতিতে ক্রমশ প্রধান শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ক্ষয়িষ্ণু মুঘল দরবারের সামরিক ও অভিজাত পরিবারের সদস্যরা নাম লেখাচ্ছে কোম্পানির সেনাবাহিনীতে। বেঙ্গল আর্মির সাহায্যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বাইরেও কোম্পানি প্রশাসনিক ক্ষমতাবিস্তার করছে। দীনের লেখায় উঠে এসেছে প্রান্তবাসী পাহাড়িয়া বা বৃহত্তর ভারতের গ্রামজনতার কথাও যারা ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে অবহিত নয়। অচেনা শাসকদের সঙ্গে যারা সংঘাতে লিপ্ত হয়। রাজমহল থেকে বেনারস একই চিত্র। দীনের অবস্থান মাঝামাঝি। তিনি ব্রিটিশরাজের অনুগত মুগ্ধসেবক। কিন্তু দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন নন। বিলাতে যে সমাজে তিনি মেলামেশা করেন সেখানেও তিনি একাকী। মাঝে মাঝে এই সংঘাতের ছায়া পড়েছে তাঁর লেখায়।

এই মধ্য-মনস্কতা আর একাকিত্ব থেকেই সূচনা তাঁর সংগ্রামের। তাঁর জীবনসংগ্রামের পর্বে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির সীমা ক্রমশ কঠোর, দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। সাম্রাজ্যের স্বদেশে ভারতীয় বা অ-ইউরোপীয়দের পরিচয়ের গণ্ডি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে। সাম্রাজ্যের বিস্তার, ঔপনিবেশিক আত্মবিশ্বাসের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে সাংস্কৃতিক আধিপত্য। তার মাঝে আত্মপরিচয় খুঁজছেন দীন কিংবা তাঁর মতো উপনিবেশ থেকে আসা প্রবাসী মানুষজন। এ-প্রসঙ্গে সমসাময়িক কিছু ঘটনাক্রমের দিকে চোখ রাখা যায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় লশকরেরা ব্রিটিশ নাবিকদের সমান মজুরি দাবি করে। কোনও জাহাজের ক্যাপ্টেন অবিচার করলে, মজুরি বন্ধ করলে প্রতিবাদপত্র পাঠাচ্ছে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে। দেশে ফিরতে না পারা লশকরেরা ক্ষোভ জানাচ্ছে রাজদরবারে। ফিশার অন্যত্র লিখেছেন জোসেফ আমিন নামে ভারত থেকে ব্রিটেনে যাওয়া এক আর্মেনিয়ানের আত্মজীবনীর কথা। তিনিও প্রচেষ্ট আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় যাতে ব্রিটিশ-সমাজ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। এডমান্ড বার্কের সঙ্গে বন্ধুত্ব হচ্ছে পেশোয়ার দূত হনুমন্তরাও-এর (১৭৮১)। তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছেন বার্কের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণে তাঁর ভূমিকার

জন্য নন্দকুমারের ফাঁসি ও হেস্টিংসের বিচার তখন তুমুলভাবে আলোচিত।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত ব্রিটেনে ভারতীয়দের অবস্থান কেমন! তাঁরা বঞ্চনার শিকার, কিন্তু সামাজিক পরিচয়-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁরা সম্পূর্ণ পরাজিত নয়। ব্রিটেনের সমাজ ও শ্রেণি-কাঠামোর মধ্যে তাঁরা উপনিবেশের কণ্ঠস্বর তৈরি করেছেন। উপনিবেশের ভাষাকে উচ্চারিত হওয়ার space তৈরি করে দিয়েছেন। এদেরই একজন দীন। পঁচিশ বছর বয়সে বিলাতে এসে সচ্ছলতা, দারিদ্র, সুনাম, ব্যর্থতাকে সঙ্গী করে পঞ্চান্ন বছর কাটিয়েছেন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে। ভারত-দর্শক দীন মহম্মদের থেকে প্রবাসী দীন যেন ক্রমশ আলাদা হয়ে যান। বেঙ্গল আর্মির সেনানী দীন ব্রিটিশ-রাজভক্ত, তিনি প্রবাসজীবন শুরু করেন সাম্রাজ্যের স্বদেশে তাদের একজন হওয়ার স্বপ্নে; কিন্তু ক্রমশ তাঁর লড়াই হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় হয়ে ওঠার লক্ষ্য। তাঁর লেখায় ও জীবিকার সংগ্রামে উপনিবেশের ভাষা প্রাণ পায়। সূচনা হয় সাম্রাজ্যের স্বদেশাভিমুখে উপনিবেশের প্রতিপ্রবাহের। দীন মহম্মদের সমগ্র প্রবাসী-জীবনের সৃজন, সংগ্রাম ও পেশার লড়াইয়ের একটাই ব্র্যান্ড নেম—ভারতীয়ত্ব।

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় 'স্বদেশি আন্দোলনে ভদ্রলোক নেতৃত্ব : সাফল্য ও ব্যর্থতা' সন্দর্ভটির শেষ কিস্তি প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় (জানুয়ারি '০৭) বেরবে। —স: চ:

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

মুজতবা আলী, দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা এবং এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব

প্রসাদরঞ্জন রায় ও শিখা রায়

সৈয়দ মুজতবা আলীর (১৯০৪-১৯৭৪) নাম আজ পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। বাংলাসাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয় রসরচনার স্রষ্টা—'দেশে বিদেশে', 'চাচাকাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী' ইত্যাদি অসামান্য গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়াও ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্পকলা, সংগীত, সভ্যতা, রাজনীতি, ধর্মশাস্ত্র এবং ভোজন ও রন্ধন শিল্প—সর্বক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। বিশ্বভারতীতে উচ্চশিক্ষা শেষ করে তিনি বছর দুয়েক কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৮ সালে হুমবোল্ড বৃত্তির অধিকারী হয়ে বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময়ে গোটা ইউরোপে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ঘুরেছেন অনেক। প্রায় বছর খানেক কায়রোর বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যয়ন করেছেন। দেশে ফিরে এসে বরোদায় তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হবার পর বছর তিনেক বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫০ সালে সাময়িকভাবে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের দায়িত্ব নেন। কর্মজীবন শেষ করেন বিশ্বভারতীতে। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, গুণীজনের মতে ১৫টি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। বাংলা সংস্কৃত, হিন্দি, মারাঠি, গুজরাতি, উর্দু, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা ছাড়াও ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। অসীম জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য তাঁর অগাধ জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করলেও, কখনও পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত হয়নি। গভীর জ্ঞানের কথাও তাঁর কলমে কৌতুকে সরস হয়ে পরিবেশিত হয়েছে এবং তাঁর সৃষ্ট রম্যরচনার এইসব কাহিনিকে উপজীব্য করে বাঙালির কয়েক পুরুষ কেটে যাবে বলেই মনে হয়।

তাঁর সরস, অমায়িক ও মিশুকে স্বভাবের জন্য তিনি ছোট-বড় সব মানুষের সঙ্গেই সহজে মিশে যেতে পারতেন। বহু বিদগ্ধ গুণীজন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আলী সাহেবের এরকমই এক অসমবয়সি বন্ধু ছিলেন স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ও কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র নিশীথচন্দ্র সেন। নিশীথচন্দ্র সেনের প্রয়াণের পরেই মুজতবা আলীসাহেব 'নিশীথদা' নামে একটি ছোট স্মৃতিচিত্র প্রকাশ করেন, পরে সেটি 'ময়ূরকণ্ঠী' বইতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এঁদের দু'জনকে এক অসামান্য বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে আলীসাহেবের সৃষ্ট দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা এবং সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এখানে নিশীথচন্দ্র সেনের কিছুটা পরিচয় দেওয়া দরকার, কারণ আজকের যুগে তিনি প্রায় অপরিচিত। নিশীথচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৮০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি, কলকাতার এক সুপরিচিত ব্রাহ্ম পরিবারে। অবশ্য তাঁদের পরিবারের আদি বাসস্থান বরিশাল জেলার বাসন্ডা গ্রাম। তিনি ছিলেন চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) ও বামাসুন্দরী দেবীর দ্বিতীয় পুত্র ও চতুর্থ সন্তান। চণ্ডীচরণ সেন বরিশালে ওকালতি করতেন এবং পরে বিচারবিভাগে যোগ দিয়ে মুনসেফ ও সাব-জজ হিসাবে কাজ করেছিলেন দীর্ঘদিন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। 'টম কাকার কুটির' তাঁর এক বিখ্যাত অনুবাদগ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝাঁসির রাণী', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'মহারাজ নন্দকুমার' সেকালে শিক্ষিত বাঙালির মনে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। ইংরাজ সরকার এইসব বইয়ে স্বদেশচিন্তার অনুরণন ভালভাবে নেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিচারবিভাগের সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র-কন্যাদের উচ্চশিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমী করে মানুষ করতে। তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিকের মহিলা স্নাতকদের মধ্যে একজন এবং বিখ্যাত মহিলা কবি। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা যামিনী ছিলেন সেকালের প্রথম শ্রেণির মহিলা ডাক্তার, দীর্ঘদিন তিনি নেপাল-রাজদরবারে চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করেছেন। কনিষ্ঠপুত্র সুধীরচন্দ্র সেন (১৮৮৮-১৯৫৯) ছিলেন প্রথমে সেন-পণ্ডিত কোম্পানি এবং পরে সেন-র‍্যালে সাইকেল কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। আর দুই পুত্র ব্যারিস্টার ও ইঞ্জিনিয়ার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নিশীথচন্দ্র সেন ১৯০০ সালে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক হন। এরপর ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে ছিলেন। কলকাতায় ফিরে

১৯০৬ সালের শেষ দিকে তিনি হাইকোর্টের বার-এ যোগদান করেন এবং যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১২ সালের ২৪ জুলাই হালিসহর নিবাসী নরেশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা শোভনা মজুমদারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হাইকোর্টে যুক্ত থাকাকালীন তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং গোড়া থেকেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। বিপ্লবীদের জন্য বহু রাজনৈতিক মামলায় তিনি বিনা পারিশ্রমিকে লড়াই করে বহুক্ষেত্রে তাঁদের কারাবাস ও আরও কঠোর শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিতে পেরেছিলেন। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। অর্থে, সামর্থে, বিপদে-আপদে এবং অন্যান্য নানান প্রয়োজনে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেন এবং কোনও দিন নিজের নাম জাহির করেননি। এই প্রসঙ্গে মুজতবা আলী লিখেছেন, 'একথা বললে ভুল বলা হবে না যে, দেশসেবা করেছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত নিশীথ সেনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি, এরকম লোক বাংলাদেশ দেখেনি। ...খবর নিয়ে জানতে পারলুম, নিশীথদা কত বড় ডাকসাইটে ব্যারিস্টার এবং তার চাইতেও বড় কথা, সেই আলিপুরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচজনের জানা-অজানাতে কত অসংখ্যবার ফীজ না নিয়ে বিপ্লবীদের জন্য লড়েছেন।' বরাবরই তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুগামী। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি কর্পোরেশনের মেয়র পদে বৃত হন। তার আগে এই পদটিকে অলঙ্কৃত করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৯২৪-১৯২৫), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৯২৫, ১৯২৭, ১৯৩০-১৯৩১), নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৯৩০) এবং বিধানচন্দ্র রায় (১৯৩১-১৯৩২)। এর থেকেই কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে তিনি কতটা বড় মাপের মানুষ ছিলেন এবং সেকালের কলকাতায় তাঁর নাম কতটা সুপরিচিত ছিল। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালের ১৫ মে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

বয়সে বড় হলেও তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিকে তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যাঁকে আলী সাহেব ডাকতেন 'নিশীথদা' বলে। ১৯৫০ সালে নিশীথ সেনের ৭০ বছর বয়স পূর্ণ হয় এবং সেই বছরেই মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি এই বইটিতে স্বহস্তে দুটি কবিতা লিখে তাঁর নিশীথদাকে জন্মদিনে উপহার দেন। কবিতা দুটি রসে, ছন্দে ও রচনাশৈলীতে অপূর্ব। প্রথম কবিতাটিতে গুণমুগ্ধ কবি তাঁর নিশীথদার গুণবর্ণনা করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। কবিতাটি নীচে তুলে দেওয়া হল।

নিশীথদা,
বিস্ময় মেনেছি বারম্বার
সপ্ততি বর্ষে তুমি খর্ব করো মোর অহঙ্কার।
মোর কেন, দেখি যবে এযুগের তরুণের দল—
তিমিত জীবন-দীপ, নিরুৎসাহ, ক্ষীণ, হীনবল—
তার মাঝে আছো তুমি, নিয়ে তব joie de vivre
বাসব-আসব আছে, আর আছে যবে তরুণীর
নর্মদিঠি স্পর্শে হিয়া সাড়া দিতে অপ্রমত্ত চিতে
তরুণ হৃদয় তব। বলো দেখি কোথায় নিভৃতে
কি কৌশলে করিয়াছ কার আরাধনা? যে রুদ্রের
কল্যাণ-বয়ান খুঁজে সর্বজন—দক্ষিণ মুখের
প্রসাদ পেয়েছো তাঁর? অথবা কি পিতা নোসি-জ্ঞান
—বিশ্বজন পিতা যিনি—পেয়ে গেছ তাঁহার সন্ধান
গোপনে গোপনে? যাঁহার কৃপায় করিয়াছ জয়
বাসব মদন, লক্ষ্মী-সরস্বতী।
অথবা কোন সে দেবী—মোর কাছে অজানা-'শোভনা'
এ জীবনে করিয়াছ একমাত্র তাঁরে আরাধনা?
তাঁর-ই বরে লভিয়াছ সুস্থ এই জীবনভঙ্গীরে?
বহু নারী ঈর্ষে, শুনি তব পুণ্য জীবন-সঙ্গীরে।
এ আনন্দ দিনে, হে পুষণ
নিশীথে-শোভনে করো হিরণ্ময় পাত্র উন্মোচন।
শান্তি শান্তি
২.২.০০ প্রীতিমুগ্ধ আলী।

মুজতবা আলীসাহেব তাঁর 'নিশীথদা' প্রবন্ধে লিখেছেন যে তাঁরা দু'জনে একবার শিলঙে বেড়াতে গিয়েছিলেন, উঠেছিলেন প্যারীমোহন মুখার্জির (স্বনামধন্য ব্যারিস্টার) বাড়িতে। সেখানে একদিন সকালের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলীসাহেব সকৌতুকে বলছেন ঃ 'তার বয়স তখন সত্তর। সেই শিলঙে একদিন সকালবেলা দেখি, ড্রেসিং গাউনে পকেটে হাত পুরে বারান্দায় ঘন ঘন পাইচারি করছেন, মুখে সিগার নেই। কথা কয়ে ভালো করে উত্তর পাই নে। "কি হয়েছে, ব্যাপার কি নিশীথদা?" সেই জ্বলজ্বলে চোখ—সে চোখ দুটি কেউ কখনও ভুলতে পারে—দিয়ে বললেন, "কবি, সব জানো, সব বোঝো, কিন্তু বিয়ে তো করো নি, তাহলে এটাও বুঝতে"।' এই ঘটনাটি নিয়েই আলীসাহেবের দ্বিতীয় সরস কবিতাটি।

একাত্তর।
সত্তর হ'ল একি কথা বলো
বিশ্বাস নাহি হয়
চ্যাংড়ার মত তড়পাও দেখি
বিশ্বভুবনময়।
ক্যালকাটা ক্লাব থিরি হানড্রেড

চষিয়া করিলে শেষ
তারপর দেখি নূতনের খোঁজে
ছাড়িলে গৌড়-দেশ।
পুষ্পক রথ চড়ি নটবর
নিশীথ চলিল হের
চাঁদমুখ যেথা মঙ্গোলিয়ান
একিরে আজব গেরো!
নিশীথ ধাইছে চাঁদের পিছনে
বিশ্বাস নাহি হয়
নিশীথ-বুকেতে শোভনা-চন্দ্র
এ কিছু নতুন নয়।
আমি ছিনু সাথে পিয়ারীও ছিল
হক কথা মোরা জানি
চাঁদের দেশেতে পৌঁছে নিশীথ
বুঝিল তত্ত্বখানি।
হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে,
"চাইনে এসব চাঁদ
আমার শোভনা হৃদয় জোছনা
নিশীথ-হৃদয়-সাধ।
ছেড়ে দাও মোরে যাব আমি ফিরে
পাইনি দুদিন চিঠি,
পারী বেরসিক আলীটাও জ্যাঠা
জানেনা শোভনা-দিঠি।"
ব্যারিস্টারের মুখেতে আছে
স্বয়ং ভারতী দেবী
শোনায় মোদের অষ্টপ্রহর
কি করে শোভনা সেবি—
জলুস রেখেছে জোয়ানি বাঁচায়ে,
আহা সে প্রেমের গান—
শোনালে নিশীথ ঝাড়া দশদিন
যেন সে মেশিনগান।
তারপর দেখি শিহরিত আমি
প্যারীও বাক্যহারা,
নিশীথ তাকায় মেঘের পানেতে
যেন সে পাগল-পারা।
দুই বাহু তুলি বিড়বিড় করে
কি কয় আপন মনে,
সোনালী রোদেতে রূপালি সে কেশ
শিরীষ চাঁপার বনে।
নিশীথের ডাকে নামিল বরষা
নব-মল্লার গানে
এ নিশীথ সেন মিয়া তানসেন
নবীন জোয়ার প্রাণে
ছাড়িল হুইস্কি যেন ভিশিনিস্কি
ইউ এন-এ জলসা ছাড়ে।
চাঁদের আলোতে মরে ঘুরে ঘুরে
শীত কি লাগে না হাড়ে?
মুখুটি বামুন কুটিল অতীব
কহিল আমারে ধরে—
"বুঝিলে হে আলী, তুমি আমি খালি
কি করে ঠেকাবো ওরে?
যদি যায় ক্ষেপে কি করিতে পারো
ছাড়ো যে কেবল বুলি।
বিপ্লবী ছিল এ নিশীথ সেন
ছুঁড়িতে জানে ও গুলি।"
লাইমুখরার মুখরার দল
শিলঙ চাঁদের হাট
তুচ্ছ করিয়া তাদের গর্ব
উড়িল নিশীথ-লাট
কলকাতা পানে মনের ধেয়ানে
আঁকিয়া শোভন ছবি
আড়ালে আছেন চুপ চুপ চুপ
নিশীথ রাতের রবি।
শোভনা সে দেবী শোভন এ ঘর
কি আর আশিষ দিব
হউক শোভন নিশীথ জীবন
শতম শতম জীব।

মুজতবা আলী
২.২.৫০

এ দুটি কবিতা মুজতবা আলীসাহেবের স্বহস্তে লেখা 'দেশে বিদেশে' বইটির মধ্যে রাখা ছিল। নিশীথচন্দ্র সেনের পৌত্রকন্যা সেনের সৌজন্যে কবিতাদুটি পাওয়া গেছে। ১লা ফেব্রুয়ারি নিশীথচন্দ্র সেনের জন্মদিন হলেও সম্ভবত ২রা ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিন উদযাপিত হয়েছিল সে বছর। দুর্ভাগ্যবশত মুজতবা আলীসাহেবের শুভকামনা সার্থক হয়নি, এই অনুষ্ঠানের কয়েক মাস বাদেই নিশীথ সেনের সহধর্মিণী শোভনার প্রয়াণ ঘটে এবং তার কয়েক মাস পরেই নিশীথ সেনও মুজতবা আলীর মতন সুহৃদদের ছেড়ে চলে যান। এ প্রসঙ্গে মুজতবা আলীসাহেব লিখেছেন, 'নিশীথদা বউদিকে বড্ড ভালবাসতেন। আমি জানি নিশীথদা আরও কিছুদিন কেন এ সংসারে থাকলেন না। ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ড সৌভাগ্যবতী শ্রীমতী শোভনা ইহলোক ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিশীথদার জীবনের জ্যোতি যেন নিভে গিয়েছিল।'

এই প্রবন্ধের যৌথ রচয়িতা শিখা রায় প্রয়াত নিশীথচন্দ্র সেনের পৌত্রী।

শিক্ষকতার সেকাল

চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল

সেকালের সন্ধানে

'অনেক আগেকার শিক্ষকদের ওপর আমার পক্ষপাত আছে; হয়তো সেটা আমার মনের ভুল,'[১] এই দ্বিধাদীর্ণ মন্তব্য এক শিক্ষকেরই। তিনি জীবনানন্দ দাশ। আগেকার যুগের শিক্ষকদের প্রতি পক্ষপাত, বস্তুত এক সর্বজনীন দুর্মর প্রবণতা। কিন্তু সেই পক্ষপাত নিয়ে দোটানা জীবনানন্দের মতো আর কারুর বোধহয় নেই। তাঁর এই দোলাচল সম্ভবত এই কারণে যে এই বৃত্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে তিনি মুগ্ধতায় বিবশ ছিলেন না।

শিক্ষকতার ওপর চিরাচরিতভাবে কিছু বিরল বৈশিষ্ট্য চিরকাল আরোপিত। শিক্ষাদানের বৃত্তিকে সমাজ চিরকাল রাখতে চেয়েছে উপার্জনমুখী কর্মের তুচ্ছ জগৎ থেকে অনেক উঁচুতে। কারণ দেখানো হয়েছে এ রকম—বিদ্যাদান কোনও সাধারণ কাজ নয়, একটি মহান ব্রত। শিক্ষক হবেন আদর্শ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি সদ্‌গুণের সমাহার। শিক্ষকতার জন্য সমাজ-নির্ধারিত যোগ্যতা এ রকমই। যোগ্যতার এই রূপরেখা কীভাবে তৈরি হয়েছিল বলা মুশকিল। বস্তুত শিক্ষকতা যে একটি পেশা, সেই সত্যটিকে পাশ কাটিয়ে সমাজ ভাববাদী রূপকল্পের আশ্রয় নিয়েছে। শিক্ষকের অবস্থান শিক্ষার সেই উৎসমুখে যেখান থেকে তাবৎ শিক্ষার্থীসমাজ আহরণ করবে ভবিষ্যতের জন্য যাবতীয় মানসিক উপাদান। শুধু বিদ্যাদাতা হিসাবে নয়, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ তথা জীবনধারার নিরিখেও আদর্শ শিক্ষাগুরু বিরাজ করবেন শিক্ষার্থীর জীবন ও মননে। তাঁর জীবন সমর্পিত পেশায় নয়, আদর্শে। শিক্ষক হবেন একটি পেশার প্রতিনিধি নয়, এক মহৎ ব্যক্তিচরিত্র, বাস্তবের রোদ-জলে উদাসীন এক দেশজ সক্রেতিস। কিন্তু যা তাঁর কর্তব্যের মূলাধার সেখানে তাঁর ভূমিকা ঠিক কী হবে? একজন ইতিহাসবিদ বলছেন, 'কী দিয়ে মাপা হবে এক মহান শিক্ষককে? ক্লাসে নিয়মিত পড়াচ্ছেন, পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ক্লাসের লাস্টবয়ও সব বুঝতে পারছে। কিংবা প্রশ্ন উশকে দেওয়াটাই তাঁর কাজ। বা ফ্যালফ্যাল দৃষ্টির সামনে অকুতোভয়ে তিনি কি বলবেন যে উত্তরটা তাঁর জানা নেই। কেউ হয়তো ক্লাসে পড়ানোয় তত দড় নন। অথচ ছাত্রদরদী, সবার মিতা, সুখদুঃখের ভাগীদার। সত্যি কীভাবে তৈরি হয় প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে না বাচনভঙ্গিতে, সহমর্মিতায় না খামখেয়ালিপনায়। হয়তো সবকিছুরই দরকার পড়ে।'[২] যাঁরা মহান বা প্রবাদপ্রতিম নন, সাধারণ শিক্ষক তাঁদের মাপার পদ্ধতিটা কী? আবার শিক্ষকদের এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিলে কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের জন্য সমাজ-নির্ধারিত মানদণ্ডটি আর ধোপে টেঁকে না। তাঁদের সাধারণ বৃত্তিজীবী হিসাবে মেনে নিতে হয়। কিন্তু সমাজ চিরকাল সাবেক আমলের শিক্ষকসমাজকে মহত্ত্বের নামাবলি পরিয়ে রেখেছে। এবং আশ্চর্য, কোনও সমাজই সমকালে যথার্থ শিক্ষাব্রতীর সন্ধান পায়নি। নিজের কালে তীব্র সমালোচনাই জুটেছে শিক্ষকদের বরাতে চিরদিন। আর প্রকৃত শিক্ষকের উদাহরণ খুঁজতে সমাজ অনিবার্যভাবে ফিরে ফিরে তাকিয়েছে এক দুর্নিরীক্ষ্য অতীতের দিকে, যার পোশাকি নাম—সেকাল। পূর্ববর্তীকালের শিক্ষকদের ব্রত আর ন্যায়নিষ্ঠার কষ্টিপাথরে মূল্যায়নের পর সমকালীন শিক্ষক সম্প্রদায়কে ফেল করিয়ে দেওয়াই চিরাচরিত রীতি।

আজকের ভোগবাদী সমাজে 'প্রফেশনালিজম' একটি প্রিয় শব্দ। আর সব বৃত্তিকে এই মানদণ্ডে পরিমাপ করা হলেও শিক্ষকতার ক্ষেত্রে একে মেনে নিতে আমাদের সমাজ আজও তৈরি নয়। পেশাদার নয়, ছাত্র-বাৎসল্যে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, দরদী, উচ্চচিন্তার ধারক—শিক্ষকের এই ভাবমূর্তিই অভিপ্রেত। বৃত্তি বা পেশার ওপর যদি আদর্শ ও মহত্ত্বের প্রলেপ দেওয়া যায় তবে উপার্জনের জরুরি প্রশ্নটি অনেকটাই অবান্তর হয়ে পড়ে। তার খেসারত দিতে দিতে ন্যুব্জ হয়ে পড়া শিক্ষককুল যখন একালে এসে বৃত্তির সঙ্গে জড়িত দাবি নিয়ে সরব, তখন তার শরীর থেকে একে একে খুলে নেওয়া হয় যাবতীয় বিরল পালক।

শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্দশার জন্য অভিযুক্ত আজকের শিক্ষক সমাজকে ঘায়েল করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সেকালের শিক্ষকদের মহিমাকীর্তন। একালের সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচারে সেকালের শিক্ষাগুরুরা কত ন্যায়নিষ্ঠ, শিক্ষার্থীঅন্তপ্রাণ ও আদর্শবাদী তা প্রতিপন্ন করাটাই মূল অভীষ্ট। আজ যারা প্রবীণ তাদের কাছে নিজেদের শৈশব-কৈশোরের শিক্ষাগুরুরা সোনালি স্মৃতি। তাদের পিতৃপিতামহের ছাত্রজীবন যাদের আশ্রয়ে যাপিত তারাও স্মৃতির আলোয় সমান উজ্জ্বল। এইভাবে যতই পিছিয়ে যাওয়া যাক স্মৃতির ছবিটা পালটায় না। পালটায় না মানসিকতার ধারাবাহিকতাও। এ একান্তই নস্টালজিয়া-আক্রান্ত সমাজের চিরন্তন আত্মপ্রবঞ্চনা। সেকালের সঙ্গে তুলনায় একাল চির-ভূলুণ্ঠিত, ধরাশায়ী। পরাজয় তার ললাট-লিখন। কিন্তু সেই সেকালটা কবে শেষ হয়ে একালকে স্থান করে দিল? প্রচলিত মতে, সেকালটা ছিল

শিক্ষার্থী-অন্তপ্রাণ, ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শবাদী জ্ঞানতাপসদের নিয়ে এক স্বর্ণযুগ, একালের মতো দায়সারা নয়। ১৮৭৩ সালে রাজনারায়ণ বসু সেকাল আর একালের মাঝখানে একটি বিভাজনরেখা নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষা শুরুর সময়টিই সেই সন্ধিক্ষণ। এবং মজার ব্যাপার, নিজে নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সংস্কারপন্থী ও আধুনিকমনস্ক হয়েও তিনি সেকালের পক্ষেই জোরালো সওয়াল করে গেছেন। হেয়ারসাহেবের স্কুলে শিক্ষক উমাচরণ মিত্রকে স্মরণ করে রাজনারায়ণ বলেছেন, 'যে সকল গদ্য পদ্য কাব্য তিনি আমাদিগের নিকট পড়িতেন তাহা ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া। একালের কোনও শিক্ষক কি এরূপ করিয়া থাকেন?'[৩] ১৯১৭ সাল নাগাদ বাল্য স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'আমাদের সৌভাগ্যগতিকে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র সেন, দীননাথ সেন প্রভৃতি মহোদয়ের মত শিক্ষাগুরু আমরা পাইয়াছিলাম। এক্ষণে জানিতে পাই অনেক শিক্ষক মহাশয়রাই ছাত্রদের সহিত সেরূপ স্নেহ-মমতা রাখেন না।'[৪] মন্তব্য দুটির মধ্যে ব্যবধান আশি বছরের, কিন্তু মর্মবাণী অভিন্ন—সমসময় সম্পর্কে হতাশা। লক্ষণীয় এই, রাজনারায়ণ স্মরণ করেন শিক্ষকের ক্লাসরুম পারফরম্যান্স আর দীনেশচন্দ্র দরদ। এর পাশাপাশি ১৯৯৬ সালে এক যশস্বী শিক্ষাবিদের বক্তব্য স্মরণীয়, 'In my life, I have seen more problem-teachers than problem-children'।[৫] মন্তব্যটি যদি এক শতাব্দী আগেও উচ্চারিত হত, তাহলেও অ্যানাক্রনিজম-এর দোষে দুষ্ট হবার কোনও কারণ থাকত বলে মনে হয় না। নিজের কালের প্রব্লেম সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা খুব স্বাভাবিক একটি প্রবণতা। এবং তাতে সমসাময়িক শিক্ষকদের আধিক্য পরিলক্ষিত হওয়ার মধ্যেও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কারণ তেমনটাই প্রথাসিদ্ধ।

'মাস্টার অবতারে বধ্য ছাত্র'

দীনেশচন্দ্রের দাবি যাই হোক, ছাত্রদের প্রতি স্নেহ-মমতা বিষয়ে উনিশ শতকের গুরুমশায়দের বড় সুনাম ছিল না। তিনি যে শৈশবে দু'একজন শিক্ষকের বাৎসল্য লাভ করেছিলেন তা ব্যতিক্রমী ঘটনা। কারণ সাধারণ ছবিটা মোটেই সেরকম ছিল না। সেকালের পাঠশালায় কচিকাঁচাদের জন্য মায়ামমতার ভাঁড়ারে ছিল নিদারুণ অনটন। দীনেশচন্দ্রের শৈশবেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' (১৮৭২) রচনাটি 'বঙ্গদর্শন'-এ ছাপা হয়। বাবুসম্প্রদায়ের উদ্দেশে নিঃক্ষিপ্ত তাঁর বিদ্রূপের ফুলকি থেকে শিক্ষক সম্প্রদায়ও রেহাই পায়নি। তাঁর মতে, বিষ্ণুর মতো বাবুদেরও দশটি অবতার। একটিতে শিক্ষক। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ভাষায়, 'মাস্টার অবতারে বধ্য ছাত্র।'

দীনেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে ছ-সাত বছরের ছোট। শৈশবের শিক্ষকদের যে স্নেহ-মমতার কথা তিনি আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তার গতিপ্রকৃতি হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিলেন বালক রবীন্দ্রনাথ। স্কুলের ওপর তাঁর বীতরাগের অন্যতম কারণ যে শিক্ষকদের নির্মমতা 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে তার অকপট উল্লেখ। সাত বছর বয়সে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হয়ে শারীরিক শাস্তির ভয়াবহতা দেখে স্কুল সম্পর্কে তাঁর আজীবনের ভীতির সঞ্চার। নর্মাল স্কুলে এসেও তাঁর অভিজ্ঞতা পালটায়নি। তাঁরই পরবর্তীকালের এক ছাত্রের কথায়, 'এখানকার শিক্ষকগণ কথায় কথায় ছেলেদের মা-বাপ তুলিয়া কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ দেন। একটু ভুল হইলেই পিঠের উপর সপাং সপাং করিয়া বেতের বাড়ি মারেন। এখানে ইংরাজি, বাংলা, শুভঙ্করী সমস্ত জিনিসই ভয় দেখাইয়া মুখস্ত করাইয়া দেওয়া হয়। কোনও জিনিষেরই অর্থ মিষ্ট কথায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া কিংবা বালকদের বয়স ও বোধশক্তির বিচার করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা হয় না।'[৬] নিষ্ঠুরতায় ওই স্কুলের সব শিক্ষককে ছাপিয়ে যান হরনাথ পণ্ডিত। বালক রবি বিত্তশালী পরিবারের সন্তান। হয়ত বা অভাবি শিক্ষকের আক্রোশের কারণ সেটাও। ঠাকুর পরিবারের ছেলেটি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য ফল করলে ক্ষিপ্ত হরনাথ ক্লাস টিচার মধুসূদন পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করেন।

১৯০০ সালে 'প্রদীপ' পত্রিকায় 'সেকালের ছাত্র' নামে একটি স্মৃতিকথায় এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ শিক্ষকের ছাত্রসংহার বৃত্তান্ত রয়েছে। তখন সবে পল্লিগ্রামের পাঠশালায় ইংরাজি শিক্ষা শুরু হয়েছে। লেখক চল্লিশ বছরের পুরনো স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'এখনও যদি কেহ বলে মনের মধ্যে যমের একটি চেহারা কল্পনা কর, কেন বলিতে পারি না, তৎক্ষণাৎ বেণী চক্রবর্তী মহাশয়ের মূর্তি চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া উঠে। আমাদের মনোরাজ্য হইতে যমকে নির্বাসিত করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় সেখানে এমনই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন।'[৭] শুধু বেত বৃষ্টি নয়, আরও ভয়ানক নানা পদ্ধতি তিনি শাস্তি হিসাবে প্রয়োগ করতেন। মদনমোহন নামে একটি ছাত্রের দুরন্তপনাও সেই অত্যাচারের কাছে নত। ছেলেটি বাড়িতে নালিশ করে। তার বাবা স্কুলের সেক্রেটারির ঘনিষ্ঠ। সুতরাং চরম পরিস্থিতিতে ছেলেটির বাবা এসে হেডমাস্টারকে ডেকে শাসান, 'আপনি মশাই আপনার বেণী মাষ্টারকে সাবধান করে দেবেন, যদি তিনি এভাবে ছেলে ঠ্যাঙান, ত তাঁকে এ মুল্লুক ছেড়ে পালাতে হবে, পেয়াদা পাড়ার দুটো মুসলমান পাইককে লেলিয়ে দেব, তারা তাঁর হাড় ক'খানা হাউলের জলে রেখে আসবে।'[৮] এবংবিধ হুঁশিয়ারিতে সংবিত ফিরে পেয়ে বেণী মাস্টার মদনমোহনের গৃহশিক্ষকের পদে নিজেকে সঁপে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল

দেন। হিন্দু কলেজের এক মারমুখী শিক্ষক বিশ্বাস করতেন, 'চকমকি পাথরে ইস্পাতের আঘাত করিলে যেমন তাহাতে অগ্নির প্রকাশ হয়, সেইরূপ বালকদিগকে প্রহার করিলে তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে।'[৯] যে-তালপাতার পাখার অস্ত্রে তিনি ছাত্রদের ধরাশায়ী করতেন, ডেভিড হেয়ার সাহেব ক্লাসে এসে ছাত্রদের সামনেই সেই পাখার বাঁটটি ছুরি দিয়ে কেটে শিক্ষকের হাতেই ফিরিয়ে দেন। এক প্রহার-প্রবণ শিক্ষককে মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সুকুমার রায়ের ছড়াতেও সেই বঙ্কিমচন্দ্র-বর্ণিত ছাত্রবধের ছবিটিই অবিকল আঁকা—'ডাক্তার ফস্টার ইস্কুল মাস্টার, বেত তার চটপট ছাত্রেরা ছটফট—ভয়ে সব পস্তায়, গ্রাম ছেড়ে শহরে, গয়া কাশী লাহোরে।' প্রহার-প্রীতিতেই ছিল শিক্ষকের পরিচয় ও স্বীকৃতি, আজ যেমন কোচিং-কূজনে। শারীরিক নির্যাতনের একটি মর্মান্তিক ছবি পাওয়া যায় ১৮৯৫ সালে 'দাসী' পত্রিকায় ছাপা একটি চিঠিতে। ঘটনাটি পত্রলেখকের শৈশব স্মৃতি, 'আমাদের গুরুমহাশয় একপ্রকার নতূন শাস্তির বিধান করিতেন। অপরাধী বালককে একটা চাউলের বস্তার ভিতর পুরিয়া তন্মধ্যে একপ্রকার পোকা ভরিয়া দিতেন। ঐ পোকার কামড়ে বালকের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইত। অথবা ঐ প্রকারে বস্তার মধ্যে ভরিয়া, মুখমাত্র বাহিরে রাখিয়া সমস্ত দিবসের জন্য জলের ভিতর বসিয়া থাকিতে হইত। বলা বাহুল্য, এবম্বিধ দুই প্রকার অবস্থাতেই বস্তার ভিতর বালকের হাত-পা বাঁধা থাকিত। পৃষ্ঠোপরি তৈলমর্দন করিয়া তদুপরি বেত্রাঘাত করাই আমাদের গুরুমহাশয়ের রীতি ছিল।'[১০]

নিষ্ঠুরতায় সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন ঋষি আয়োদধৌম্য। গুরুগৃহে শিক্ষালাভরত তাঁর তিন শিষ্য উপমন্যু, বেদ ও আরুণি ঋষিবাক্যের অন্যথা করে না। আরুণি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে খেতের আল বাঁধে। উপমন্যু তার সমস্ত ভিক্ষান্ন গুরুকে দান করে অনাহারে থাকতে থাকতে অর্কপত্র ভক্ষণ করে অন্ধ হয়ে যায়। বেদ-এর বরাতেও জোটে অসীম দুর্ভোগ। শিক্ষান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করার পর বেদ নিজে যখন গুরুর আসনে, তখন তিনি সদা সচেতন থাকতেন যাতে নিজের শিষ্যদের সঙ্গে অমানবিক, নির্মম আচরণ না করেন, কারণ 'গুরুকুল বাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরুক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পরান্মুখ হইলেন।'[১১] সন্দীপন মুনির শিষ্য হিসাবে প্রায় একই অভিজ্ঞতার শরিক শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা। গুরুপত্নীর আদেশে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কুশ ও কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বনের মধ্যে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেন তাঁরা। আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যথেচ্ছ নির্দয় আচরণ করাই আচার্যদের রীতি ছিল। আর এই নির্মমতা সহ্য করার নাম কৃচ্ছ্রসাধন। প্রচলিত নিয়ম ছিল, ছাত্রেরা গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করবে। ব্যয় বহনে অক্ষম ছাত্রদের ক্ষেত্রে আচার্যের ঘর সংসার ও খেতখামারের কাজকর্ম ছিল বাধ্যতামূলক। যে ছাত্ররা আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার সব খরচ দিত, তাদের ক্ষেত্রে গুরুগৃহে কাজ বাধ্যতামূলক ছিল না। গুরুদেবকে খুশি রাখার জন্য তাদের কেউ কেউ স্বেচ্ছায় সেবা করত।

বস্তুতপক্ষে, পাঠশালার গুরুমশাইদের প্রহার-প্রবণতার সঙ্গে লেখাপড়ার কার্যকারণ সম্পর্ক যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের। সেই চাহিদা কতটা সঙ্গত তা নিয়ে ভাবিত হবার অবকাশ তাঁদের ছিল না। নিত্যকার সাংসারিক অনটনই তার মূল কারণ। পুঁথিপাঠের আনুষঙ্গিক এমন ক্রিয়াকর্মে তাদের বাধ্য করা হত যাতে গুরুমশায়ের সংসারে আর্থিক সুরাহা হয় এবং তা নৈতিকতার মূল্যে। বইপত্রের সঙ্গে কলাপাতার ঠোঙায় ভরে পাঠশালায় তামাক নিয়ে আসা ছিল প্রচলিত রীতি। তাতে গুরুমশায়ের নেশার তৃপ্তি ও সেই বাবদ আর্থিক সাশ্রয় দুই-ই হত। যে পড়ুয়া এই নিয়মের অন্যথা করবে শারীরিক নিগ্রহ তার বরাতে নিশ্চিত। পরবর্তীকালে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ছিল ঘুঁটে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। এই অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ এক ছাত্রের খেদোক্তি, 'ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বর্তমান সময়ে আমরা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছি বটে, কিন্তু পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ এখনও ছাত্রদিগকে চুরিবিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। কারণ, বাবার অথবা কাকার তহবিল হইতে চুরি না করিলে তাহারা তামাক কোথায় পাইবে? কেহ কেহ বাড়ি হইতে পয়সা চুরি করিয়া তদ্দারা তামাক কিনিয়া আনিয়া গুরুমহাশয়ের দারুণ প্রহারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে।'[১২] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' (১৯২৯) উপন্যাসে গুরুমশায়ের কার্যকলাপের বর্ণনা এরকম: 'সর্দার পোড়ো পুরন্দর এতক্ষণ হাঁকিয়া হাঁকিয়া মহামহিম লিখিতেছিল, এবং বোসেদের বড়বাবুর নাম ফাঁদিয়া কর্জ করিবার কায়দাটা শিখিতেছিল। যেমন সে বুঝিল, গুরুমহাশয়ের রাগ একটু কমিয়াছে, অমনি কাছে আসিয়া তামাক সাজিতে চাহিল। রামধন ভট্টাচার্যের মুখে হাসি আর ধরে না। বলিলেন, ভাল তামাক সেজে আনিস রে ব্যাটাহু তোর বাপের তামাক একটু চুরি করেই না হয় আন, আর দেখিস যেন খেয়ে পুড়িয়ে শেষ করে আনিস নে।' এই রামধনবাবুর পড়ুয়ারা 'সদসৎ উপায়ে অভিভাবক বা অভিভাবিকাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার জন্য যে ঘুঁটে, চাউল, তরকারিরাশির সমাবেশ' করে তা তিনি উৎফুল্ল হয়ে দেখেন।

ছাত্রদের সেবা লাভ করার আরও পন্থা ছিল। গুরুমশায়ের বাজারের সওদা কাঁধে বয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থাকত প্রতিদিন দু'তিনজনের এক-একটি দলের ওপর। এরকম এক দলের সদস্যের জবানিতে, 'দুই-তিনজন বাদ্যকরের ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। গুরুমশায়ের বাড়িতে কোনও শুভকার্যের অনুষ্ঠান হইলেই ইহাদের

আত্মীয়-স্বজনকে যাইয়া বিনা পয়সায় গুরুমহাশয়ের বাড়িতে বাজাইয়া দিয়া আসিতে হইত। জন ছয়েক ঘরামির ছেলেও আমাদের সঙ্গে পড়িত। বর্ষাকালে গুরুমহাশয়ের ঘরের খড় উড়িয়া গেলে ইহাদের আত্মীয় স্বজনকে যাইয়া ঐ ঘর মেরামত করিয়া দিয়া আসিতে হইত। এইরূপে ধোপাকে বিনা পয়সায় কাপড় কাচিতে হইত, নাপিতকে কামাইতে হইত।'[১৩] এইভাবে গত্যন্তরহীন দরিদ্র ছাত্ররা দিব্যি গুরুমশায়ের দারিদ্রমোচনে নিয়োজিত থাকত। অবস্থাপন্ন ছাত্রদের কথা আলাদা। মনোমোহন বসু লিখেছেন, 'সেকালে চারিআনা মাসিক বেতন এত অল্প শ্রুত হইত যে যদি কখনও কখনও ছাত্রের মা-বাপ তত দিতেন তবে তাঁহাদের কাছে গুরুর মাথা কেনা থাকিত।'[১৪] ব্যতিক্রমও ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রমী শিক্ষকদের বরাত চিরকালই মন্দ। 'কেঁড়েলের জীবনচরিত' (১২৮০)-এ মনোমোহন বসু হরিশমাস্টার-এর স্মৃতিচারণ করেছেন যিনি সেই যুগেও এই বিশ্বাসে থিতু ছিলেন যে মারধোর করলে ছেলেরা লেখাপড়া শেখে না। তিনি অন্য গুরুদের মতো কঠোরহৃদয় ছিলেন না। বিশেষ দোষ না পেলে কাউকে মারতেন না। শিক্ষাগুরুর ভূমিকা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অভিভাবকদের ধারনার বিস্তর ব্যবধান ছিল। পাঠাভ্যাসের চেয়ে শৃঙ্খলারক্ষা, বিদ্যার্জনের চেয়ে কঠোর শাসনই অভিভাবকদের বেশি পছন্দ। যে-শিক্ষক নির্মম হতে নারাজ, তাঁর ওপর অভিভাবকেরা আস্থাশীল হতেও নারাজ। স্নেহার্দ্র শিক্ষকের পাঠশালায় সন্তান পাঠানো নিরর্থক। হরিশমাস্টারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যদি ভাল করে শাসন করতে না পারেন, তবে তাঁরা ছেলে পাঠাবেন না। ফলত হরিশমাস্টারের পাঠশালায় ছাত্রের অনটন। নির্মমতা যেহেতু যোগ্যতার মাপকাঠি, সুতরাং অভিভাবকদের অনুগত হওয়াই গুরুমশাইরা শ্রেয় জ্ঞান করতেন জীবিকার তাগিদে। যে গুরুমশাইয়ের ব্যাখ্যায় 'দুঃখ বিনা সুখলাভ হয়কি মহীতে' মানে হল, 'হে মহীতে, দুঃখ বিনা কি সুখ লাভ হয়'?[১৫] কিংবা 'দুষ্কর্ম' শব্দের অর্থ 'যে কর্ম বহু দূরে সাধিত হয়,' তাঁর স্কুলে ছাত্রের জোয়ার। শুধু এই বহরের জ্ঞান বিতরণই নয়, নিজের পড়ানোর দায়িত্বটি অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেবার দিব্যি চল ছিল। অর্থাৎ উঁচু ক্লাসের মাতব্বর ছাত্রদের দিয়ে নিচু ক্লাসে পড়ানো। এদের বলা হত 'সর্দার পোড়ো'। শিক্ষকের প্রশ্রয়েই এরা ক্ষুদে গুরুমশাই সেজে নিরীহ পড়ুয়াদের ওপর যথেচ্ছ গুরুমশায়গিরি করত।

১৮২০ সাল নাগাদ কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি শহর ও শহরতলির দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে উদ্যোগী হয়। পাঠশালা পরিদর্শন, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, গুরুমশাইদের মানোন্নয়ন, ছাত্রদের যথোপযুক্তভাবে পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি কর্মসূচি নেয়। অনেক পাঠশালাই সহজবোধ্য কারণে এর আওতায় আসতে অনিচ্ছুক ছিল। বিদ্যালয় পরিদর্শক পাঠশালায় এলে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিতেন গুরুমশাইরা। সেসব কৌশল মহাত্মা গান্ধীর ছাত্রজীবনে স্কুল পরিদর্শকের সামনে ভুল বানানে 'কেটল' শব্দটি লেখার গল্পটি স্মরণ করিয়ে দেয়। এক ছাত্রের অভিজ্ঞতা এরকম, 'সব ইন্সপেক্টরবাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া আমাদিগকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে গুরুমহাশয় দূরে দাঁড়াইয়া বিবিধ প্রকারের ভাবভঙ্গি করিয়া আমাদিগকে ঐ প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতেন। যথা—প্রশ্ন ২ × ৪ কত? গুরুমহাশয় দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার এক হস্তের পাঁচটি ও অপর হস্তের তিনটি অঙ্গুলি দেখাইতেন। ...আমরা গুরুমহাশয়ের এরূপ ভাবভঙ্গির তাৎপর্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত ছিলাম। এবং আমাদের উপর গুরুমহাশয়ের এরূপ কড়া হুকুম ছিল যে কেহ স্কুল পরীক্ষা করিতে আসিয়া কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ গুরুমহাশয়ের পানে তাকাইতে হইবে।'[১৬] অন্যথা গুরুমশায় তথা পাঠশালার মান বাঁচে না। অতএব, বিদ্যাশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা দুই-ই সমান বেপথু। অভিভাবকদের সন্তোষবিধানের জন্য শৃঙ্খলারক্ষাই পরম কর্তব্য। এ দস্তুর শুধু পুরনো যুগের পাঠশালায় সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরাজি শিক্ষার যুগেও বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। বিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ লেখক মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসে মহিম মাস্টারের হাহাকার, 'অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেছি। ফিফথ ক্লাসের উপরে পড়াবার বিদ্যে কি নেই আমার, বলুন?' ক্লাস রুটিন তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক চিত্ত গুপ্ত জবাব দেন, 'বিদ্যে নিয়ে কথা নয়। পড়ানো চায় না তো স্কুলে। মুস্কিল কি জানেন, আপনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না মোটে। ফিফ্থ ক্লাসেও তো গণ্ডগোল'। পড়ানো নয়, ক্লাস ম্যানেজ করাটাই আসল কথা। হুতোমি সতর্কীকরণ যথার্থ, 'পাঠক, পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাস্টার যেন বাগ (বাঘ) বিবেচনা হচ্ছে'।[১৭]

আদর্শের বিড়ম্বনা

যাঁরা 'বাঘ' বিবেচিত হননি, আবার দীনেশচন্দ্রের দয়ার্দ্র শিক্ষকদের দলেও ছিলেন না, এমন শিক্ষকদের ছবিটা একেবারেই আলাদা। ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে কলকাতা শহরের ঘটনাবলির পটভূমিকায় লেখা 'সচিত্র গুলজারনগর' (১৮৭১) নামে ব্যঙ্গধর্মী বইটিতে লেখক 'ভাঁড়' ওরফে কেদারনাথ দত্ত সেকালের স্কুলের হালচাল সম্পর্কে লিখেছেন, কীভাবে এক ছাত্রকে যৎসামান্য শাস্তি দিতে গিয়ে চাকরি খোয়াতে বসেছিলেন শিক্ষক হাবুবাবু। 'খুদে মঙ্গলবারে হাবুবাবু ফক্‌কড়িধরের গলা টিপেছিলেন, তাতে কেউ শিশ, কেউ জুতর ঠকঠকি, কেউ নাকে কাঠি দিয়ে হাঁস্য আরম্ভ করলে, হাবুবাবু রেগে টাই, হেডমাষ্টারের কাছে রিপোট কত্তে

যান, ছোকরারা অমনি নেচে হাততালি দিয়ে হোহো হরিবোল করে উঠল, টেবিল চাপড়ান আরম্ভ হল, হুড়দুম শব্দ হল, হেডমাষ্টার নেউলের মত ফুলতে ফুলতে এসে আস্ফালন কল্লেন, হাবুবাবু বাছাই কোরে বিচ্ছুদের ধরিয়ে দিলেন, হেডবাবু তাদের নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেন এমন সময় চতুরঙ্গের গাওনা উঠল, ঘুঘু ঘুরবুলি বেরল, শিসের হিসহিসে ঘর ফেটে গেল, ক্লাসের তামাম ছোকরা 'ধিনিকেষ্ট তিনি তা' কোরে স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়, হেডবাবুর আককেল গুড়ুম, হেড্‌বাবু বেহেড হলেন, ছেলেছোকরাদের বোঝালেন, হাতে ধরলেন, শেষ তাদের কাছে মাপ চেয়ে উল্টে হাবুবাবুকে ধমকে বিদেয় হলেন। হাবুবাবু ছাদনাতলায় বরের মতন ফ্যালফ্যাল কোরে চেয়ে রইলেন।' অবশেষে ছাত্রের কাছে হেডমাস্টার ক্ষমা চেয়ে তাদের সামনেই সহকারী শিক্ষককে ধমকধামক দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। এই ঘটনাটি সেকালের দুটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ কিংবা ওরিয়েন্টাল সেমিনারির। ছাত্রদের দৌরাত্ম্যে শিক্ষকরা কতদূর বিপর্যস্ত তার নমুনা অন্তহীন। ১৯০০ সালের কথা। হেয়ার স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের আচরণে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে আক্ষেপ করেছিলেন, 'বাপু, আজকাল আমি ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় সর্বশ্রেষ্ঠ গভর্ণমেন্টের বিদ্যালয় আমার অধীনে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি হুগলিতে অথবা অন্য কোনও পল্লিগ্রামে থাকিলে ভাল হইত। এখানকার ছেলেদের কথা বলিও না, কাহাকেও কিছু বলিতে ভয় করে, পাছে রাস্তায় ছুরি মারে। আমার ছাত্রেরা পথে আমার সম্মুখে বার্ডসাই খায়, লজ্জায় আমি ছাতা আড়াল দিয়া চলিয়া যাই।'[১৮] ব্যথিত, বিধ্বস্ত প্রধান শিক্ষকের এই জবানির কোনও জবাব সমকালের কাছে ছিল কি না আজ তা জানবার উপায় নেই। ছুরি মারার কথাটি নেহাৎ কথার কথা নয়। ছাত্রের হাতে শিক্ষকের ছুরিকাহত হবার ঘটনা রয়েছে বিশিষ্ট গায়ক অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে। ১৯৩০-এর দশকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ছিলেন তিনি। সেই সময়ে ওই স্কুলের এক প্রবীণ শিক্ষক গঙ্গায় স্নান করতে যাবার পথে নিজের স্কুলের ছাত্রের হাতে আক্রান্ত হন। কারণটি অবশ্য জানা যায়নি।[১৯]

কলকাতার খেলাতচন্দ্র ইন্সটিটুশনে ১৯২৯ থেকে ১৯৪১ সাল অবধি পড়িয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্লাসরুমে প্রায়শই তিনি ছাত্রদের কাছে উপহাসের পাত্র। সদাই একটু আনমনা, উদাসীন মানুষটির কাছে ওই চারদেয়াল হয়ত অস্বস্তিকর ছিল। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সেই স্কুলে পড়া এক ছাত্রের কথায়, 'আদর্শ শিক্ষক বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। চাকরির খাতিরে ক্লাসে এসে বসতেন, মামুলিভাবে সামান্য কিছু পড়াতেন—ব্যস ওই পর্যন্ত। তাঁর ক্লাসে হৈ-হট্টগোল লেগে থাকত।'[২০] কখনও কখনও গোলমাল থামাতে হেডমাস্টার নিজেই আবির্ভূত হতেন। ছাত্ররা তাঁর অন্যমনস্কতা নিয়ে সামনেই বিশ্রী রসিকতা করত। মাস্টারমশায়ের ভ্রমণের নেশা নিয়ে ক্লাসের মধ্যেই এক ছাত্রের বিদ্রূপ, 'মুরগি যতটুকু উড়তে পারে, আকাশের খবর ততটুকুই সে রাখে।' শিক্ষককে সরাসরি এই ভাষায় আক্রমণ কী ধরনের মানসিকতার প্রতিফলন তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। অথচ বিভূতিভূষণ পাঠ্যসূচির বাইরে জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে সহজ গল্পগুজবের ভঙ্গিতে ছাত্রদের কৌতূহলী করে তুলতেন। চিড়িয়াখানায় গিয়ে আড্ডার ছলে সাহিত্য, ইতিহাস-ভূগোলের বিচিত্র কাহিনি শোনাতেন। তাঁর অবস্থা বস্তুত মনোজ বসুর সেই মহিমমাস্টারের মতো। ক্লাসকে স্তব্ধ রাখতে অক্ষম বলেই তিনি ছাত্রের চোখে 'আদর্শ শিক্ষক' নন। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রটি মন্তব্য করেছেন, বিভূতিভূষণ 'আর যাই হোক, নিছক স্কুল মাস্টার হবার যোগ্য নন'। বহুদিন পর মাঝরাস্তায় সেই ছাত্র যখন 'স্কুলের এক সাধারণ মাস্টার' বিভূতিভূষণকে প্রণাম করে লজ্জিত বোধ করেন, তখন বোঝা যায় তাঁর শ্রদ্ধা লেখক বিভূতিভূষণের খ্যাতির জন্য, শিক্ষকের জন্য নয়। শিক্ষকতাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি বিভূতিভূষণকে হেয় করেন, আবার লেখক বিভূতিভূষণকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে শিক্ষকতাকে হেয় করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অস্বাভাবিক নয়। সেই চিরাচরিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরই ব্যক্তিগত প্রকাশ।

শিক্ষক সম্পর্কে এই মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রকে পাওয়া যায় বিভূতিভূষণেরই 'অনুবর্তন' উপন্যাসে। চুনি নামে ছাত্রটিকে বাড়িতে পড়াতে এসে তার স্কুলেরই শিক্ষক নারাণবাবু তার মুখেই শোনেন, 'মাস্টার বাড়িতে রাখা ঐ জন্যই তো। এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয় আমাদের ফি মাসে শুধু প্রাইভেট মাস্টারদের।' একাধারে সাহিত্যিক ও শিক্ষক ছিলেন বলেই রোমান্টিক মানুষ হয়েও বিভূতিভূষণ তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎটাকে নিয়ে সমসাময়িক শিক্ষক সমাজের একটি দলিল রচনা করতে পেরেছিলেন। সেখানে সাহেব-হেডমাস্টার, ও তার বশংবদ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের বেতন নিয়মিত বাড়ে। অথচ সহকারী শিক্ষকদের সামান্য বেতন থেমে থাকে একই জায়গায়। তাদের বেশিরভাগ ফাঁকিবাজ, টিউশানি-সর্বস্ব। অনেকের শিক্ষার মান কহতব্য নয়। পড়ানোয় অনীহা, ঘনঘন ছাত্রদের অফিসে পাঠানো হয় কটা বাজে দেখে আসার জন্য। সেকালের এই আদর্শবাদী শিক্ষককুল সাহেব-হেডমাস্টারকে সাত-পাঁচ বুঝিয়ে ছুটি আদায় করেন। ক্লাসে ক্লাসে নোটিস যায়, The school will remain closed tomorrow, the 9th inst. for the great Hindu festival Ghantakaran Puja. পরীক্ষার হলে চেয়ারে বসে ঢুলতে থাকা, ছেলেদের দেওয়া পয়সা থেকে লুকিয়ে ভালমন্দ খাওয়া, মিথ্যে হিসেব দিয়ে টাকা নেওয়া যদুবাবু আরও পুরনো যুগের শিক্ষক! ভাল করে পরীক্ষার খাতা দেখার বালাই নেই শিক্ষকদের। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রবীণ নারাণবাবু। স্কুল এবং ছেলেদের উন্নতি নিয়ে তিনি সদা ভাবিত। অথচ তাঁর আদর্শবাদের মূল্য কোথায়? তিনি যে বাড়িতে দিনের শেষে পড়াতে যান সেখানে অভিভাবক, এমনকী চুনি নামে ছাত্রটির কাছেও প্রতিনিয়ত অপমানিত। নতুন মাস্টার রামেন্দুবাবু এই অভাবি শিক্ষকদের দলে নেই, কারণ তিনি অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে আসা। বাকি শিক্ষকদের কাছে আদর্শ রক্ষার চেয়ে বেশি জরুরি জীবন ধারনের প্রাণান্তকর প্রয়াস।

বৈশম্পায়ন-পরীক্ষিৎ

পশ্চিমী শিক্ষার তাগিদ উনিশ শতকের প্রথম দিকে যে সব প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিল, সেগুলিতে পাঠশালা থেকে কলেজি শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। পাঠশালার শিক্ষকরা উঁচু ক্লাসে পড়াতেন না। তবে মুখস্থ করার রীতিটা স্কুল-কলেজ সর্বত্রই সমান। ১৮৯০ সাল নাগাদ প্রবীণ রাজনারায়ণ বসুর খেদোক্তি, 'কলেজে ছাত্রেরা কেবল শ্রোতা। শিক্ষক ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেছেন, বালকেরা কেবল নোট লিখিতেছে। বৈশম্পায়ন বক্তা, পরীক্ষিত শ্রোতা। না আছে বালক কর্তৃক শিক্ষককে জিজ্ঞাসা, না আছে শিক্ষক কর্তৃক বালককে জিজ্ঞাসা। আমি এই শিক্ষা প্রণালী ঘৃণা করি।'[২১] তারপর এক শতাব্দী অতিক্রান্ত। রাজনারায়ণের ঘৃণা সেই ট্র্যাডিশনকে বেপথু করতে পারেনি। রাজনারায়ণের ভাবনায় হয়ত ছিল শিক্ষা সম্পর্কে গীতায় উচ্চারিত সেই শ্লোক ঃ

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানম্ জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন॥ (৪।৩৪)

অর্থাৎ, আচার্যদের কাছে গিয়ে প্রণাম এবং তাঁদের সেবা করে তুষ্ট করতে হবে। তোমার সেবা ও নম্রতায় খুশি হয়ে তাঁরা তোমার জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করবেন। কিন্তু কার্যত, জিজ্ঞাসার প্রশ্নটিই অবান্তর। বিদ্যার্জনের পন্থা হিসাবে কণ্ঠস্থ করার রীতিটিই সনাতন ঐতিহ্য। গুরুমশাইদের অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাগত মান যেমন সন্তোষজনক ছিল না, কেউ কেউ বুঝিয়ে দেবার ঝুঁকিই নিতেন না। আবার কেউ নির্দ্বিধায় ভুল পড়িয়ে যেতেন। তাছাড়া পাঠশালার পাশাপাশি অন্যান্য কাজেও ব্যস্ত থাকতেন গুরুমশাইরা। সুতরাং পড়ুয়াদের দেবার মতো বেশি অবকাশ কোথায়? সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা'য় (১৯১৫) পণ্ডিতমশায়ের কাছে সংস্কৃতশিক্ষার কথা বলতে গিয়ে বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের কাছে প্রাপ্ত শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। বিদ্যালংকার বলতেন, 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী। আবৃত্তি বোধের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সর্বশাস্ত্রের সার, বোঝো আর না-ই বোঝো, কিছু এসে যায় না।'[২২] বিশিষ্ট পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ছাত্রজীবনের প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমাদের হেডমাস্টারমশাই ইংরেজি গদ্যও মুখস্থ করিতে বলিতেন। আমাদের বুঝাইতেন ইংরাজি রচনা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি না করিলে ঐ ভাষা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিবে না'।[২৩] মুখস্থ করার মাধ্যমে বিদ্যার্জনের পরম্পরায় নোট-সংস্কৃতির আবির্ভাব। এই ধারাবাহিকতার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে বোঝাবুঝির জটিলতা এড়িয়ে মুখস্থবিদ্যার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা। আর জ্ঞানলাভের চেয়ে শৃঙ্খলারক্ষা চিরকালই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাসে পড়াশোনার চেয়ে বেশি জরুরি নিস্তব্ধতা, যা নিশ্চিত করতে একটি রক্তচক্ষু পেয়াদাই যথেষ্ট, শিক্ষক নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে হেড পণ্ডিত ও থার্ড পণ্ডিতের মধ্যে ক্লাসে পড়ানো নয়, ডিসিপ্লিন রাখার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ছেলেরা পাংশু মুখে সভয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

দেশীয় পাঠশালায় গুরুমশায়দের প্রহার-প্রবণতার অন্যতম কারণ ছিল অভিভাবকদের সন্তোষবিধান। যে গুরুমশাই যত ভয়ঙ্কর, তাঁর স্বীকৃতি তত বেশি। অবশ্যই রুদ্রমূর্তি গুরুমশাইদের যুগ শেষ হবার পর সেই স্বীকৃতির পালক শোভা পায় কোচিং-ক্লান্ত শিক্ষকদের উষ্ণীষে। যে নোট-সংস্কৃতি সম্পর্কে রাজনারায়ণের তীব্র বিষোদ্‌গার, তার উত্থানের মূলেও একই কারণ—অভিভাবকদের সন্তোষ বিধান। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকদের বলেছেন, 'নোটের বোঝার বাহন'। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় নোট-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই উপসর্গের কারণটি শিক্ষক হিসাবে তাঁর অজানা নয়। 'পরীক্ষার ভাল ফল দেখাতে না পারলে অভিভাবকেরা অসন্তুষ্ট হন, কাজেই শিক্ষকের ভাল ফল করার চেষ্টায় নোট দেওয়া, বাইরের বই পড়া রহিত করা প্রভৃতি দুষ্কার্য করিতে হয়। এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে ছেলেরা কীরূপ দিগগজ হয় সে তো সবাই দেখতেই পাচ্ছি।'[২৪] এই 'দুষ্কার্য' না করার পরিণাম কী হয় তার একটি নজির উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৭৬ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার একটি সংখ্যা থেকে। ছাত্রেরা যাতে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে এই বাসনায় এক ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক পরীক্ষায় বাঁধা ছকের প্রশ্ন দেওয়া থেকে বিরত হলে ক্ষিপ্ত ছাত্রেরা তাঁর বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ করে। অধ্যক্ষ সেই অধ্যাপককে ডেকে প্রাজ্ঞ পরামর্শ দেন, অন্যান্য কলেজে সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত তা-ই অনুসরণ করা কর্তব্য। অর্থাৎ 'শিক্ষক শিক্ষক নহেন, কেবল ব্যাখ্যাতা মাত্র, ছাত্ররাও ছাত্র নহে, কেবল শ্রোতা মাত্র।'[২৫] রাজনারায়ণের ভাষায়, বৈশম্পায়ন-পরীক্ষিৎ। এই গতানুগতিকতার অন্যথা করলে শিক্ষক গুরুত্বহীন হয়ে পড়বেন।

ছাত্রজীবনের কথা বলতে গিয়ে নোটবইয়ের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দেন রেভ. লালবিহারি দে। ১৮৭৩ সালে

তিনি নোট রচয়িতাদের দ্বীপান্তর দাবি করেছিলেন : '[They] are the greatest pests in the country and the sooner they are deported to Botany Bay, the better for the education of the rising generation.'[২৬] শিক্ষক এবং শিক্ষিত মহলে নোটবইকে দৃশ্যত শাপশাপান্ত করার আদত খুব পুরনো। নোটবই অনেকের মতে একটি সাম্প্রতিক উপসর্গ। 'শিক্ষার কথা'য় জীবনানন্দ অনুমানের বশে ভ্রান্ত মন্তব্য করেছেন, পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে কোনও অভিজ্ঞ শিক্ষক বা অধ্যাপক ইস্কুলের ছেলেদের জন্য নোট লিখতেন না। প্রকৃতপক্ষে, অন্যান্যদের সঙ্গে শিক্ষকরাও নোটবই রচনার সঙ্গে যথেষ্ট যুক্ত ছিলেন। প্যারিচরণ সরকারের সুযোগ্য সন্তান শৈলেন্দ্রনাথ সরকার বিশ শতকের প্রথম চার দশকে কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করে যশস্বী হন। তাঁর নামাঙ্কিত একটি স্কুলও রয়েছে উত্তর কলকাতায়। শৈলেন্দ্রনাথ ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নোট-প্রণেতা। অসচ্ছলতা যে বৃত্তিজীবীর নিয়তি, তাকে উপার্জনের একাধিক পথের সন্ধান করতেই হয়। আবার নোট প্রণয়নের সঙ্গে জুড়ে থাকে শিক্ষক হিসাবে সাধারণ্যে বিস্তর স্বীকৃতিও। প্রকাশকদের সৌজন্যে অনেক প্রয়াত শিক্ষক-নোটপ্রণেতা অমরত্ব পেয়েছেন আজকের পড়ুয়াদের পড়ার টেবিলে।

চাকরি ও বিয়ের বাজারে বিকোতে হলে পাশ চাই-ই। ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় 'আমাদের উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক একটি রচনায় জীবিকা অর্জনের উপায় সম্পর্কে শ্রীমতী সরলা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে আশুতোষ চৌধুরীর জবাব, 'আমরা বি.এ, এম.এ পড়ি উকিল, ব্যারিষ্টার হইবার জন্য, ইউনিভারসিটিতে যাই চাকুরির চেষ্টায়। শিক্ষা পথে যতটুকু হয়, তাহার পরে প্রায় কিছুই করি না। গরীব আমরা আহার চেষ্টায় দিনরাত থাকি। বি.এ. পাশ করিলে খাইবার সংস্থান হইবে বলিয়াই তো বি.এ পড়ি। চাকুরি না পাইলে আইন ব্যবসায়ী হই।'[২৭] সুতরাং নোটের সামাজিক চাহিদা অপ্রতিরোধ্য। তা রুদ্ধ করার ক্ষমতা ও দায় কোনওটিই শিক্ষকের নেই। বরং স্বল্প বেতন সংসারে যে অনটন জিইয়ে রাখে, ব্যক্তিগত কুশলতায় ছাত্রদের পাশ করাতে পারলে তা খানিকটা লাঘব করা সম্ভবপর। শিক্ষকের মূল্য ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ে কৌতূহল চরিতার্থ করায় নয়। কারণ তাদের কৌতূহল জ্ঞান আহরণে নয়, প্রতিযোগিতার বাজারে নামার জন্য পরীক্ষা পাশের সহায়ক 'নোট' সংগ্রহে। সামাজিক চাহিদা যত অসঙ্গতই হোক, তাকে রোধ করা শিক্ষকের সাধ্যাতীত। ব্যবস্থার নির্ধারক তিনি নন, সমাজের নিয়ামকও নন। সমাজই তাঁর নিয়ামক।

প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁদের গুণমুগ্ধ ছাত্র ও সহকর্মী যশস্বী অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন '...not one of them may be said to have made any contribution to the making of history.'[২৮] শিক্ষক ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন না। সেই সৃষ্টির দায় পেয়ে বসলে পরিণাম কী হয় তার উদাহরণ ডিরোজিও সাহেব, যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভগীরথ', উত্তরকাল বলেছে কিংবদন্তি শিক্ষক। হিন্দু কলেজের অমন ডাকসাইটে শিক্ষাগুরুর বরাতে কী দুর্ভোগ জুটেছিল? কলেজের শিক্ষানুরাগী পরিচালকমণ্ডলী ১৮২৮ সালে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করে। এই বিতাড়নে নেতৃত্ব দেন বিদগ্ধ পণ্ডিত রামকমল সেন, যিনি আবার ওই কলেজে শিক্ষকপদে নিয়োগ করেন তাঁর নিজেরই পাচকঠাকুরকে। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'আমাদিগের কলেজে (হিন্দু কলেজ) যিনি বাঙলা পণ্ডিত ছিলেন তিনি একসময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন।'[২৯] রামকমল ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সম্পাদক ও হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তাঁর মতো বিশিষ্টজনের মূল্যায়নে শিক্ষকের মর্যাদার যে পরিচয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর নিযুক্ত শিক্ষকের দক্ষতার কথায় রাজনারায়ণ লিখেছেন, 'তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম'। এই পাচক থেকে পণ্ডিত হয়ে ওঠা ব্যক্তিটির প্রসঙ্গ ব্যঙ্গ ও স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় মুড়ে দিয়েছেন হুতোমও, 'পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড়মানুষের বাড়ি রাঁধুনি বামুন ছিলেন, এডুকেশন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেনবাবুর সুপারিশে ও প্রিন্সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন।'[৩০] রাজনারায়ণের ক্লাসের ছেলেরা পাচক-পণ্ডিতের সঙ্গে রান্নার গল্প করত। হুতোমের সহপাঠীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক তথৈবচ। হুতোমের নিজের জবানিতে, 'পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভালবাসতেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্টু কত্তে ত্রুটি কত্তো না। পণ্ডিত মহাশয় মাঠে আসবামাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে। আমরাও একদোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম'। শিক্ষক-সুলভ নয়, ইয়ারদোস্তের প্রগলভতায় ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর আড্ডা চলত। আর, তাঁর ক্লাস থেকে নিস্তার পাবার জন্য ছাত্ররা মুখিয়ে থাকত। হিন্দু কলেজের ছাত্র কালিপ্রসন্ন ওরফে হুতোমের অবশেষে স্বস্তি, 'আর এক কেলাস উঠলেম, রাঁধুনি বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গ্যালো।' হিন্দু কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানের বিদগ্ধ পরিচালকদের দৃষ্টিতেই যদি পাচকঠাকুর ডিরোজিওর চেয়ে যোগ্যতর শিক্ষক গণ্য হন, তাহলে সাধারণ

মানসিকতায় শিক্ষকতার মান-মর্যাদার চেহারা সহজেই অনুমেয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের শিক্ষানুরাগের নমুনা হাতড়ে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। দীনেশচন্দ্র সেন কুমিল্লার শম্ভুনাথ ইন্সটিটুশনে পঞ্চাশ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা বিলক্ষণ স্মরণযোগ্য। ক্লাস চলাকালীন শিক্ষকদের ওপর নজরদারি করতে বেরিয়ে তিনি দেখেন, 'একজন একটি ছাত্রকে দাঁড় হইবার জন্য বারংবার বলিতেছিলেন, stood up, stood up, আর একজন ইতিহাস পড়াইবার সময় একটি ছত্র পাইলেন Babur founded the Mughal Empire, অমনই চিৎকার করিয়া টিপ্পনি করিতে লাগিলেন, find, found, found, এই তিনরকম পদ ব্যাকরণশুদ্ধ, কিন্তু এখানে লেখক founded লিখিয়াছেন, সাহেব কিনা, যাহা ইচ্ছা লিখিয়া পার পাইলেন, বাঙ্গালি হইলেই তাহার টিকিতে হাত পড়িত।'[৩১] এ হল দুটি ক্লাসের ভেতরকার দৃশ্য। আর ক্লাসরুমের বাইরের দৃশ্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্রের বিবরণ, 'দেখিলাম মাস্টাররা যখন ইচ্ছা আসেন, যখন ইচ্ছা যান, আমি কৈফিয়ৎ চাহিলে মুচকি হাসিয়া পাশ কাটাইয়া যান। কেহ একটায় আসেন, দুইটায় যান, কলেজের প্রফেসারদের মতো—গুণপনাও সেইরূপ।' অনুমোদনপ্রত্যাশী একটি স্কুলের পক্ষে এই বিলাসিতা বিস্ময়কর। ১৯৫৪ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পত্রে একটি প্রশ্ন ছিল, 'State what illness may result from eating unboiled milk।'[৩২] প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছনোর আগেই অবশ্য নজরে পড়ে যাওয়ায় মান রক্ষা হয়।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

সূত্রনির্দেশ

১। জীবনানন্দ দাশ—শিক্ষার কথা, বিভাব জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, (সম্পাঃ ভূমেন্দ্র গুহ) ১৯৯৮, পৃ. ১৫৩

২। গৌতম ভদ্র—শিক্ষকচরিত, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জুলাই, ১৯৯৬

৩। রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৯

৪। দীনেশচন্দ্র সেন—ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৫

৫। Jyoti Bhattacharya, The Teacher—Baulmon Prakashan, 1999, p. 81

৬। নৃপেন্দ্রকুমার বসু—আমাদের বিশ্বকবি, ১৩৪৯, পৃ. ২১

৭। সেকালের ছাত্র—(প্রদীপ পত্রিকা, পৌষ ১৩০৭) থির বিজুরি, আশ্বিন ১৪১০ সংখ্যায় সংকলিত, পৃ. ১৯

৮। তদেব

৯। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার—(প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৭) থির বিজুরি, আশ্বিন ১৪১০ সংখ্যায় সংকলিত, পৃ. ৩০

১০। সেকালের পাঠশালা—রাসবিহারি সেন (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত) পৃ. ১৭

১১। কালীপ্রসন্ন সিংহ (সম্পা), মহাভারত (১ম খণ্ড), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ২৪

১২। রাসবিহারি সেন—সেকালের পাঠশালা (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত), পৃ. ১৫

১৩। তদেব, পৃ. ১৬

১৪। মনোমোহন বসু—গুরুমহাশয় (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত), পৃ. ১৫৮

১৫। রাসবিহারি সেন—সেকালের পাঠশালা (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭

১৬। তদেব

১৭। হুতোমপ্যাঁচার নকশা—(সম্পা), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৯১ পৃ. ৪৯

১৮। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—স্কুলের স্মৃতি (থির বিজুরি, প্রাগুক্ত), পৃ. ১৭১

১৯। প্রবীণ শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় গত শতকের তিনের দশকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ছিলেন। তাঁর এখনো অপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'আমার সেই দিনগুলি'-র পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেখানে এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ রয়েছে। তাঁর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গেও তিনি এ বিষয়টির অবতারণা করেন।

২০। বৈদ্যনাথ ধর—মাস্টারমশাই বিভূতিভূষণ, ('এবং এই সময়' বিভূতি সংখ্যা, সম্পা, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়), ১৯৯৪, পৃ. ৪৮২

২১। আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

২২। পুলক চন্দ—ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র, লেখনী প্রকাশনা, ২০০১, পৃ. ১২৬

২৩। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত—সেকালের কথা, শারদীয় পরিচয় ১৪১১, পৃ. ৪

২৪। Annual Report of The Oriental Seminary 1921

২৫। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১৬

২৬। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা ষড়যন্ত্র (রেভা. লালবিহারি দে-র রিকালেক্‌শনস অফ মাই চাইল্ডহুড থেকে উদ্ধৃত), পৃ. ১২০

২৭। আমাদের উচ্চশিক্ষা, (ভারতী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩১১) থির বিজুরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২৮। Subodh Chandra Sengupta—Portraits & Memoirs, Jijnasa, 1975, preface

২৯। আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩০। হুতোম প্যাঁচার নকশা, পৃ. ৫১

৩১। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃ. ১০৫

৩২। খায় না পান করে—আনন্দবাজার পত্রিকা (২৭ এপ্রিল, ১৯৫৪) ২৭ এপ্রিল, ২০০৪ পুনর্মুদ্রিত

বিজ্ঞানের জগতে অনায়াস বিচরণ

প্রসাদরঞ্জন রায়

চতুরঙ্গের সম্পাদকের অনুরোধে এই সমালোচনা। বইটি নেড়েচেড়ে অমলেন্দু দাশগুপ্তের পড়াশুনো আর চিন্তার ব্যাপ্তি দেখে মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই বইয়ের সমালোচনা করার জন্য আমি যোগ্য ব্যক্তি কি না। পরবর্তীকালে ইন্টারনেট ঘাঁটতে গিয়ে দেখলাম টেলিগ্রাফ কাগজে বইটির সমালোচনা করেছিলেন ড. অশোক মিত্র। এতেই যে কোনও সমালোচকের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে মনের মধ্যে যে সংশয়টা ছিল সেটা কেটে গেল, স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে এই বইটির প্রকৃত সমালোচনা করা প্রায় আমার সাধ্যাতীত। তবু সম্পাদকের অনুরোধে দু'চার কথা লিখতে হচ্ছে।

প্রথমেই নবীন পাঠকদের জন্য অমলেন্দু দাশগুপ্তের একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা উচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির ডাকসাইটে ছাত্র ছিলেন তিনি। কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন। তারপর প্রশাসনিক কাজে যোগ না দিয়ে সাংবাদিক হিসাবেই নিজের জীবন গড়ে তোলেন। মাঝখানে কয়েক বছর ভিয়েনাতে International Atomic Energy Agency (IAEA) সংস্থাতে কাজ করেছিলেন। আবার ফিরে আসেন খবরের কাগজের জগতে। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৮৬ সালে সম্পাদক হিসাবে কর্মজীবন শেষ করেন। অবশ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় তাঁর লেখা আরম্ভ হয়েছিল ওই কাগজে যোগ দেবার আগেই এবং অবসরগ্রহণের পরেও তিনি নিয়মিত লিখে গেছেন। সাংবাদিক জীবনে তাঁর নাম দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র এবং অধ্যাপক হিসাবে তাঁর ইংরাজি লেখার মুনসিয়ানা ও প্রসাদগুণ হয়ত আমাদের খুব একটা আশ্চর্য করে না, কিন্তু যা আশ্চর্য করে দেয় তা হল বিজ্ঞানের জগতে তাঁর অনায়াস বিচরণ। সম্ভবত ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম কোনও খবরের কাগজের বিজ্ঞান সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেন এবং সেই সূত্রে তাঁর লেখা প্রবন্ধ থেকেই তাঁকে বেছে নিয়ে যায় IAEA।

এই প্রবন্ধ-সংকলনটিতে প্রায় ৫০ বছর ধরে লেখা ৩১টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই কিন্তু তাদের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগটির নাম Hastening the End—যাতে আলোচিত হয়েছে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চিন্তার কিছু অংশ। দ্বিতীয় ভাগের নাম—Politics of the Bomb। এতে আলোচিত হয়েছে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে সারা পৃথিবীর পরিস্থিতির কথা এবং অবশ্যই এর জন্য তিনি নির্ভর করেছেন IAEA-তে তাঁর অভিজ্ঞতার ওপর। তৃতীয় ভাগটি—Science and Beyond তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারার ফসল। আর শেষ ভাগটিতে আছে ভিন্ন স্বাদের কিছু লেখা, কোনওটির উপজীব্য নগর জীবন, কোনওটির ইংরাজিসাহিত্য আবার কোনওটি ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর আলোচনা। স্বাভাবিকভাবেই এই ভাগের নাম A Miscellany। এখানে স্বল্প পরিসরে কেবল কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবকাশ আছে।

প্রথম প্রবন্ধটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। নাম Life after the End of History. অবশ্যই ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার The End of History প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা। ১৯৮৯ সালে এই প্রবন্ধে ফুকুয়ামা আলোচনা করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দ্বিতীয় বিশ্ব এবং ঠান্ডা লড়াই শেষ হয়ে গেলে তার কী প্রভাব পড়বে পৃথিবীর ওপর। তিনি বলেছিলেন, 'What we may be witnessing is not just the end of the Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such : that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalisation of Western liberal democracy as the final form of human government'। অবশ্যই প্রবন্ধটি বহু চর্চিত হয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর বিরোধিতা করেছেন অনেকেই, স্বয়ং দেরিদা বেশ কড়া ভাষাতেই এর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ফুকুয়ামা রাশিবিজ্ঞান ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে গত ১০০ বছরে সারা পৃথিবীতে উদারপন্থী গণতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে সর্বত্রই। এও বলতে চেয়েছেন যে উদারপন্থী গণতন্ত্র বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ এবং দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দুইই কমবে। এই প্রবন্ধে অবশ্য শ্রীদাশগুপ্ত আলোচনা করতে চেয়েছেন যে ভারতের ওপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে। প্রবন্ধটি যখন শ্রীদাশগুপ্ত লেখেন তার বছর দু'য়েক বাদে ফুকুয়ামা তাঁর তত্ত্বটি আরও

বিস্তারিত করে 'The End of History and the Last Man' বইটি লেখেন। আজ এই প্রবন্ধটি লেখা হলে ফুকুয়ামার বই এবং হান্টিংটনের *'Clash of Civilisations'* বইটি অবলম্বনে নিশ্চয়ই আরও কিছু কথা বলার সুযোগ থাকত। সারা বিশ্বে সাম্প্রতিক উগ্রপন্থী কার্যকলাপ এবং ভারত-মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে বামপন্থী সমালোচনা হয়ত এই নির্দেশই দেয় যে ফুকুয়ামার বিশ্লেষণ কিছুটা সরলপন্থী এবং শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা লড়াইয়ের পরবর্তীকালের পৃথিবী কোন দিকে যায় তা নিয়ে কিছুটা সংশয় থেকেই যাবে।

প্রথম পর্বে আরও তিনটি প্রবন্ধে গর্বাচভের *'গ্লাসনস্ত'* ও *'পেরেস্ত্রইকা'* নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে শ্রীদাশগুপ্ত স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন, 'The Indian Left used to be chastised for blind subservience to Soviet policies; for well over a year, it is the Right which has insisted that we must follow Mr. Gorbachov's example regardless of the appalling problems thrown up by the Soviet and East European reforms'। কোনও অজ্ঞাত কারণে লেখক বরাবরই গর্বাচেভকে Gorbachov বলে উল্লেখ করে গেছেন, যদিও প্রায় সর্বত্রই আমি Gorbachev বানানটি পেয়েছি। অবশ্যই রাশিয়ান বানান বা উচ্চারণ নিয়ে আমার তেমন কোনও জ্ঞান নেই। একটি প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে চীনের সাম্প্রতিক নীতিপরিবর্তন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের উদাহরণ এনেছেন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত কেমনভাবে চলবে তা নিয়ে এমন সব প্রশ্ন তুলেছেন যার উত্তর আজও আমাদের সঠিক জানা নেই। প্রথম পর্বের যে প্রবন্ধটি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তা হল Fuchs and the Soviet Bomb। ১৯৫০-এর দশকে *Brighter than a thousand Suns* বইটি থেকে আরম্ভ করে নারায়ণ সান্যালের *'বিশ্বাসঘাতক'* বই পর্যন্ত বহু আলোচিত হয়েছে রবার্ট ওপেনহাইমারের বামপন্থী (কমিউনিস্ট) চিন্তাধারা এবং তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ। তুলনায় অনেকটা আড়ালে চলে গেছে ক্লাউস ফুখস্-এর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি। ফুখস্ (১৯১১-১৯৮৮) জন্মেছিলেন জার্মানিতে এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ১৯৩০-এর দশকে। নাৎসি আমলে তিনি আশ্রয় নেন প্রথমে ফ্রান্সে এবং পরে ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডেই তিনি ডি এসসি ডিগ্রি লাভ করে সেখানেই পড়াচ্ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর অন্যান্য জার্মানদের মতন তিনিও অন্তরীণ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাকস বর্নের সুপারিশে তিনি মুক্তি পান, ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পান এবং আমেকিায় লস আলামস-এ অ্যাটম বোমার গোপন গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ওপেনহাইমার নয়, অ্যাটম বোমার গুপ্ত সংবাদ পাচার করার ব্যাপারে প্রধান হোতা ছিলেন ফুখস্। কিন্তু তখন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে যখন হাইড্রোজেন বোমার গবেষণার কাজ চলছিল তখন ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ফুখস্ কোনও সোভিয়েত এজেন্টকে (আলেকজান্ডার ফেকলিসভ) এই তথ্য পাচার করেন এবং ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পর ১৯৫০ সালে তিনি দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত হন। তিনি এ দায় স্বীকারও করেছিলেন, ইন্টারনেটে তাঁর সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। এর জন্য তাঁর ১৪ বছরের সাজা হয়েছিল, অবশ্য ১৯৫৯ সালে তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ফুখস্-এর পাচার করা এই তথ্যের ভিত্তিতেই সোভিয়েত হাইড্রোজেন বোমা তৈরির কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। মুক্তি পেয়ে ফুখস্ চলে যান পূর্ব জার্মানিতে, সেখানেই নাগরিকত্ব নেন এবং রসেনডর্ফে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেন আরও ২০ বছর। ১৯৮৮ সালে ড্রেসডেনে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেই ফুখস্ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখেন শ্রীদাশগুপ্ত এবং এই প্রবন্ধের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছেন এক প্রায়-বিস্মৃত 'ট্রাজিক হিরো' (অথবা বিশ্বাসঘাতক)। প্রবন্ধের শেষে শ্রীদাশগুপ্ত লিখেছিলেন, 'There is no defence of what Fuchs did, only a reminder of deception and guilt of other kinds and at other levels'। অত্যন্ত কম কথায় লেখক ফুখসের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়েছেন এই বাক্যাংশে।

বইটির দ্বিতীয় ভাগে শ্রীদাশগুপ্ত অবশ্যই তাঁর IAEA যুগের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেছেন। এই অংশে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সারা বিশ্ব মেতে উঠেছে পারমাণবিক প্রতিযোগিতায়। তিনি এই আলোচনায় সোভিয়েত রাশিয়া বা আমেরিকা কাউকেই ছেড়ে কথা বলেননি। বলেছেন Strategic Defence Initiative (SDI) এবং Mutually Assured Destruction (MAD) নিয়ে আমেরিকান চিন্তার কথা যা সারা পৃথিবীকে নিয়ে গেছে ধ্বংসের মুখে। বলেছেন পাকিস্তানি বোমার কথা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে পরমাণু প্রতিযোগিতার কথা। পোখরান-প্রসঙ্গে সরাসরি বলেছেন যে ভারতীয় নীতি যাঁরা প্রণয়ন করেছেন (অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী থেকে নরসিংহ রাও পর্যন্ত) তাঁরা সমস্যাটা পুরো না বুঝেই তাঁদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে Complete Test Ban Treaty (CTBT), Non-Proliferation Treaty (NPT), Strategic Arms Limitation Treaty (SALT) এবং

Strategic Arms Reduction Treaty (SART) আর সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় নীতি। স্পষ্টতই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের সঙ্গে অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় নীতির সামৃজ্য সবসময় ছিল না। এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'Besides, Delhi cannot deny Pakistan's right to make the bomb without undermining its own stand against the NPT. The entire Indian case against the non-proliferation doctrine has been based on the argument that it entails unacceptable discrimination. Should India try to limit Pakistan's freedom of choice by use of force, it would have no grounds for complaint in the event of similar intervention in its own nuclear programme'। অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পরিস্থিতিটা অনেক পালটে গেছে, তবু এই অংশের প্রত্যেকটি প্রবন্ধই আজও যথেষ্ট সময়োচিত।

তৃতীয় অংশে লেখক আলোচনা করেছেন সাধারণভাবে বিজ্ঞান নিয়ে এবং বিজ্ঞান ছাড়িয়ে ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে। প্রথম প্রবন্ধটি আইনস্টাইন শতবর্ষ উপলক্ষে লেখা, ১৯৭৯ সালে আইনস্টাইনের জন্মশতবর্ষে এটি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। গত বছর আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের শতবর্ষ উপলক্ষে সারা দুনিয়া জুড়ে তাঁকে নিয়ে হই চই হয়েছে, লেখা হয়েছে বহু প্রবন্ধ এবং কয়েকটি বই, কিন্তু এই লেখাটির ২৭ বছর পরেও শ্রীদাশগুপ্তর অনবদ্য ভাষায় আইনস্টাইনের ভূমিকার আলোচনা অত্যন্ত যুগোপযোগী। বাকি কয়েকটি প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেছেন যে নিউটনীয় গতিবিদ্যার মডেলের ওপর ভিত্তি করে সারা মহাবিশ্ব কীভাবে চলছে তা বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অনেক বিজ্ঞানী, তাঁদের কারুর মতে মহাবিশ্বের তত্ত্বে ঈশ্বরের কোনও ভূমিকা থাকতে পারে না। অথচ স্বয়ং নিউটন বলেছিলেন তাঁর বিখ্যাত সূত্রগুলি 'laws impressed upon nature by God'। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় অবশ্যই এসেছে আইনস্টাইনের কথা, যাঁর গভীর ঈশ্বরে বিশ্বাস আজ প্রবাদপ্রতিম। আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'I believe in Spinoza's God, who reveals himself in the orderly harmony of all that exists, not in the God who concenrs himself with the fates and actions of human beings'। এই আইনস্টাইনই কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনায় নিলস বোহরকে বলেছিলেন, 'God does not play dice'। কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তাবাদ (indeterminism) তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। অথচ হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ তত্ত্বের বিষয়ে এডিংটন বলেছিলেন, 'Religion first became possible for a reasonable scientific man about the year 1927'। ওই ১৯২৭ সালেই হাইসেনবার্গের তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে লেখক হাইসেনবার্গ, ডিরাক, ম্যাকস প্ল্যাঙ্ক, লুই দ্য ব্রগি প্রমুখ অনেকেরই ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। অবশ্যই হাইসেনবার্গের বিখ্যাত বই '*Physics and Philosophy*' তাঁর আলোচনার পরিধি থেকে বাদ যায়নি। সবশেষে তিনি আলোচনা করেছেন হকিংয়ের ঈশ্বরচিন্তা বা তার প্রভাব নিয়ে। স্টিফেন হকিং অবশ্য বলেছিলেন ঠিক এর উলটো কথা : 'In effect, God was confined to the areas that nineteenth-century science did not understand'। অর্থাৎ হকিং-এর মতে বিশ শতকের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে ঈশ্বরের ধারণার আর কোনও প্রয়োজন নেই। বার বার পড়েও আমার মনে হয়েছে এই খণ্ডের প্রবন্ধগুলি যখন লেখা হয়েছিল তখন যেমন আকর্ষণীয় ছিল, আজও তাই রয়ে গেছে।

শেষ খণ্ডের প্রবন্ধগুলি কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে Two Cities নামে তাঁর যে প্রবন্ধটি এই বইয়ের সবচেয়ে পুরনো, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে লেখা। এই প্রবন্ধে তিনি পঞ্চাশ বছর আগেকার কলকাতার সঙ্গে দিল্লির তুলনা করেছেন এবং যদিও পঞ্চাশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে তবু দুই শহরের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েই গেছে। কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'Calcutta tempts you with all its wiles until you are completely seduced. The charms are many and diverse. Can one forget the old Bengal pathos and filth of Baghbazar behind the facade of a senile culture, the new world snobbery of Rashbehari Avenue, the decadent fascination of old Ballygunge, the squalid Rajabazar and Colootollah, the book shops on College Street, and the care-worn girls in the university corridors?'। এ কলকাতা অবশ্যই আর নেই কিন্তু সেই দিল্লিও কি আছে? দিল্লির প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, "New Delhi may take a fairly long time to change, but one can meanwhile be happy with the imperial glory of Old Delhi where the Jumma Masjid glimmers in the morning light and the Red Fort casts a majestic spell in the twilight glow, and where you can hear the dead voices of emperors and courtesans in the non-stop chorus of Chandni Chowk. ... So long as this charm of Old Delhi remains and so long as the lonely and undulating roads of Civil Lines are not swamped by refugees, I would not think of returning to Calcutta. ... Life in New Delhi is peaceful, nothing disturbs you except cases of supersession. ... you can even afford to be a little poetical at the sight of the dried-up stream of the Jumna and dream Shahjahan's tragic dreams'। দিল্লি সম্পর্কে তাঁর তখনকার ধারণার সঙ্গে *দৃষ্টিপাত*-এ 'যাযাবর'-এর ধারণার সাযুজ্য বেশ স্পষ্ট কিন্তু ভাবতে ইচ্ছা করে আজকের দিল্লি দেখলে লেখক কী বলতেন? অন্য প্রবন্ধটি টি এস এলিয়টের মৃত্যুর পরে (১৯৮৮) তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন—Mr. Eliot and us। এই এলিয়টকে নিয়ে ১৯৪৮ সালে তিনি স্টেটসম্যানে আর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'By the 1960's Eliot may have ceased to be a fashionable cult, but he was an important part of our cultural awareness. Apparently, he still is.'। আবার অন্যত্র এলিয়টের জনপ্রিয়তার সন্ধান করেছেন, যদিও তাঁকে obscure বলতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। সেই কলেজের প্রথম যুগে যখন 'The Waste Land' পড়েছি, একটা অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছি পড়ে কিন্তু একটা আলো-আঁধারি ধোঁয়াশার ভাব থেকেই গিয়েছিল। সত্যিই কি এর মানে ঠিকভাবে বুঝেছি? একেই বোধহয় লেখক obscure বলেছেন। তবে একথা ঠিক যে আশি বছরের পুরনো হলেও এ বই পুরনো হবে না। এই প্রসঙ্গে শুধু বলি যে এলিয়টের ওপরে লেখা বেশ বড় আকারের প্রবন্ধেও আমার প্রিয় লেখাটি নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। যদি 'Murder in the Cathedral' আলোচিত হত তবে আরও আনন্দ পেতাম সন্দেহ নেই।

সবশেষে অশোক মিত্র এই বইটিকে বলেছিলেন a civilisable volume এবং এও বলেছেন যে আজকের পাঠকদের কতজন এসব বই পড়ে সভ্য হতে চায় তা তাঁর জানা নেই। আমার শুধু এটুকুই যোগ করা দরকার যে যাঁরা পুরনো আমলের লিবারাল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তাঁরা এ বইটি পড়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন, যদিও সবকটি প্রবন্ধ খুব সহজবোধ্য নয়।

থিমস অ্যান্ড ভ্যারিয়েশনস—অমলেন্দু দাশগুপ্ত/ প্যাপিরাস, কলকাতা-৪/২৫০.০০

প্রসঙ্গ আনিসুজ্জামান

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একটি বিশিষ্ট নাম। পুরো নাম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। জন্ম ১৯৩৭ আদি নিবাস উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট। ১৯৪৭-এ খুলনায় চলে যান। বাঙালি বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর পরিচিতি শুধুমাত্র বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দেশে-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর বিপুল কর্মধারার ফল। পরিচিতি বেড়েছে উত্তরোত্তর। তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে *আনিসুজ্জামান : সংবর্ধনা স্মারক* শ্রদ্ধাজ্ঞাপক গ্রন্থ। আটত্রিশ জন লেখক এই বইতে 'প্রীতি', 'স্মৃতি' ও 'কৃতি' এই তিন পর্যায়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন। এঁরা তাঁর দেশ-বিদেশের গুণমুগ্ধ সুহৃদ ও ছাত্র-ছাত্রী। বইটির সম্পাদকের নিবেদনে আছে, '২৩ জুন ২০০৫ চট্টগ্রামে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।' এইটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেরই গ্রন্থরূপ। তবে 'অধ্যাপক সালাহউদ্দীন আহমেদের লেখাটি পুনর্মুদ্রিত; অন্য সব লেখাই এই সংকলনের জন্য রচিত।'

'প্রীতি' পর্যায়ে বাংলাদেশের তিনজন কবির তিনটি কবিতা রয়েছে। শামসুর রাহমান 'গুণী বন্ধু আনিসুজ্জামানের উদ্দেশে' বলেন, 'আত্মভোলা নন তিনি, নন অচেতন সমাজের কল্যাণ কি অকল্যাণ বিষয়ে কখনো যতদূর/জানি দৃষ্টি তার সদা মানবের প্রগতির দিকে/প্রসারিত। কী প্রবীণ, কী নবীন সকলের বরেণ্য নিয়ত।' এমন একটি মানুষের 'খ্যাতির শিখরে পদার্পণ/কোরেও সাধনা তার থামেনি।' সৈয়দ শামসুল হক যথার্থই বলেন যে, আনিসুজ্জামানের মধ্যে বিদ্যা ও মূল্যবোধ এই দুটি অভিন্ন সত্য মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই 'প্রতিদিনের চিত্রলেখা দিনের শেষে মুছে' গেলেও কালের চলমান হাত সবটা মুছতে পারে না—এই 'আমোচ্য যে নামগুলো তার একটি আনিসুজ্জামান।'

'স্মৃতি' পর্যায়ের লেখাগুলির মধ্যে দু'টি ইংরাজি লেখা ১. ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের 'কনগ্র্যাচুলেশনস' এবং ২. ক্লিন্টন বি. সিলির 'এ ট্রুলি গুড ম্যান অ্যান্ড স্কলার এক্সট্রাঅর্ডিনারি।' শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জীবনানন্দ-জীবনীকার সিলি তাঁর নাতিদীর্ঘ আন্তরিক রচনায়

আনিসুজ্জামানের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু পাণ্ডিত্যের নয়, তাঁর হৃদয়বত্তা, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহৃদয়তার কথা লিখেছেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের বিখ্যাত মানুষেরা—তাঁদেরই মধ্যে কেউ তাঁর ছাত্র, কেউ বা তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, বা বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ। শিক্ষক হিসাবে তিনি যে কতটা সম্মানিত ছিলেন তা আবুল মাল আবদুল মুহিতের রচনায় প্রতিফলিত। তিনি লিখছেন, 'একদিন আনিসের সঙ্গে কলাভবনের অভ্যন্তরে ঘুরছি। শুনেছি ছাত্রেরা শিক্ষকদের তোয়াক্কা করে না। খুব বেয়াড়া তাদের ব্যবহার। গুরুজন বা বয়োজ্যেষ্ঠরা তেমন সম্মান আশা করতে পারেন না। আনিসের সঙ্গে সেদিনের চক্কর কিন্তু আমার ধারণা একেবারে পাল্টে দিল। প্রকৃত শিক্ষক এখনও ছাত্রদের আকর্ষণ করেন। ছাত্রেরা এবং জুনিয়র শিক্ষকরা তাঁদের সম্মান করেন।' মোজাফ্ফর আহমদ আনিসুজ্জামানকে নিয়ে কিছু কথা বলতে গিয়ে রাজ-অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সঙ্গত কারণেই তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের প্রজন্ম সম্মুখীন হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের নানা মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্নের—যা নিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক অঙ্গন নানাভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এ সমস্ত চঞ্চলতার কেন্দ্র ছিল ঢাকাতেই। আনিস অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই অধিকার-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং পরেও যুক্ত থেকেছেন।' কিন্তু আনিসুজ্জামান কখনওই রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে নিজেকে সংস্থাপিত করেননি। তিনি শিক্ষাজীবনকেই গভীরভাবে গ্রহণ করেছেন। সেই ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনে ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকীর লেখা 'সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করল আনিস। সতেরো বছরের কিশোর কিন্তু ব্যবহারে আচরণে অত্যন্ত উপযুক্ত একজন গুণীজন যেন।' সেখানে ড. শহিদুল্লাহও উপস্থিত ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে আনিসের শিক্ষাজীবনকে প্রভাবিত করেছিলেন। প্রভাবিত করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ। অনেকেরই ধারণা, আনিসুজ্জামানের কাজের ধারা শুধুমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়, তাঁর কাজে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, নৃতত্ত্ব এ সমস্তই নানা বিচারে যুক্ত হয়েছে। তিনি নিজে যেমন বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন, তেমনই গবেষণা করিয়েছেনও। তাঁর নানা বিষয়ের গবেষণার মূল ভিত্তি যে সমাজ তা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সরদার ফজলুল করিম যথার্থই বলেছেন, জীবনযাপনে ও বিদ্যাচর্চায় তিনি একটি 'অনবদ্য অননুকরণীয় আনিসীয় স্টাইল' গড়ে তুলেছেন। তাঁর ছাত্র বা ছাত্রপ্রতিমদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিদ্যার জগতে উভয় পক্ষেরই লাভ হয়েছে সন্দেহ নেই। তাঁর ছাত্র সহকর্মীদের মধ্যে হায়াৎ মামুদ, গোলাম মুরশীদ, সিকান্দার খান, মামুদ আল জামান, মালেকা বেগম, সেলিনা হোসেন, মাহবুবুল হক প্রমুখ আনিসুজ্জামান সম্পর্কে যে তদ্নিষ্ঠ স্মৃতিচারণ করেছেন তাতে তাঁর মনুষ্যত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় গভীরভাবে ফুটে উঠেছে।

উনিশ জন লেখক আনিসুজ্জামানের ভাষা-সাহিত্য বিষয়ক কাজকর্মের বিশ্লেষণ করেছেন। সালাহউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, 'মুক্তবুদ্ধির অধিকারী, মানবতাবাদী মূল্যবোধের ধারক গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিত আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের গৌরব। বাংলা সাহিত্য ও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপর মৌলিক গবেষণা করে তিনি তরুণ বয়সেই প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।' সারা জীবনের কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর খ্যাতি ক্রমাগত বৃদ্ধিই পেয়েছে। কিন্তু শুধুই বইয়ে মুখ গুঁজে সারস্বত সাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছেন এমন বলা যাবে না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভাষায়, 'তিনি বলা যায়, দু' হাতে দু'দিক সামলেছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গবেষণায় নিষ্ঠ থেকেছেন, আবার রাষ্ট্রীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাঁরা দেশের সংস্কৃতিকে সরল ও সৃষ্টিশীল রাখার কঠিন ব্রত পালন করেছেন, তাঁদের পুরোভাগে থেকেছেন।' কিন্তু কোনও সরকারি পদের প্রলোভনে তিনি আদর্শচ্যুত হননি, যেমন 'একাত্তরে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে এসে তাঁরা অনেকেই পুরস্কৃত হয়েছিলেন বা হতে চেয়েছিলেন। আনিসুজ্জামান সে দলে পড়েন না।' তিনি তাঁর সুকৃতির জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকবেন।

আনিসুজ্জামানের গবেষণাকর্ম ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখির যে একটা বিশেষ জগৎ তৈরি হয়েছে তা খোন্দকার সিরাজুল হক, আহমদ কবির, ভূঁইয়া ইকবাল, শান্তনু কায়সার, গোলাম মুস্তাফা, মহীবুল আজিজ প্রমুখ আলোচকদের নিপুণ বিশ্লেষণাত্মক রচনায় ফুটে উঠেছে। তাঁর 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' বাঙালির চিন্তনের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই গবেষণাগ্রন্থ পরবর্তীকালের ভাষা ও সাহিত্য গবেষকদের পথপ্রদর্শন করেছে। সেদিক থেকে তিনি পথিকৃৎ। তাঁর অন্যান্য গবেষণাও গবেষকদের নতুন আলো দেখিয়েছে। বর্তমান বইটিতে আনিসুজ্জামানের একটি গ্রন্থপঞ্জি সংকলিত হয়েছে, তাতে দেখি, তাঁর নিজের লেখা বইয়ের সংখ্যা ২৪ এবং সম্পাদিত (একক ও অন্যান্যদের সঙ্গে) বইয়ের সংখ্যা ৩৭। তবে এই বইগুলি ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে তাঁর অসংখ্য লেখা ছড়িয়ে আছে তারও একটা পঞ্জি তৈরি হওয়া প্রয়োজন। বইটিতে আছে আনিসুজ্জামানের জীবনপঞ্জি ও ৪১টি আলোকচিত্র।

এই সুমুদ্রিত শ্রদ্ধাঞ্জাপক স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ।

□ **আনিসুজ্জামান সংবর্ধনা স্মারক—সম্পাদক, ভূঁইয়া ইকবাল/ মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা/২৫০.০০**

থিয়েটারের চেখভ

মেঘ মুখোপাধ্যায়

মাত্র পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটক আর গোটা কয়েক একাঙ্ক লিখে নাট্যকার হিসাবে জগদ্বিখ্যাত আন্তন পাভলোভিচ চেখভ। কয়েকজন মহৎ শিল্পস্রষ্টা বা বিজ্ঞানীর জীবন আর কর্ম নিয়ে আমাদের নিরন্তরচর্চা প্রয়োজন। চেখভ সেই গোত্রের একজন। বিশ্বসাহিত্যে চেখভের স্থান অসামান্য ছোটগল্পকার রূপে। ছোটগল্পে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পাঠকের কাছে তাঁর এই পরিচয়টাই বড়। ছোটগল্পের শিল্পকে তিনি তাঁর কলমে এক বিরল উচ্চতায় স্থাপন করেছেন। তাঁর অনেক গল্প অসামান্য কবিতা বা অপূর্ব সংগীতের মতো। একবার পড়ে ফেলার পর বহুকাল মনের গহনে অনুরণিত হতে থাকে। একজন পাঠক সারা জীবনভর তাঁর গল্পগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার পড়তে পারেন। সাধারণ মানুষের রোজকার চিরচেনা জীবনকেই তিনি এমনভাবে দেখিয়েছেন যে তার মধ্যে থেকে এতাবৎ অনাবিষ্কৃত অনেক দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন লেভস্তোয়। চেখভের 'ডার্লিং' গল্পটি পড়ে লেভস্তোয় এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর আলোড়িত মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখা ওই গল্পটির একটি সমালোচনায়। বিস্ময়ের কথা যে লেভস্তোয়ের আলোচনাটি হয়েছিল গল্পটির চেয়ে আয়তনে বড়। পৃথিবীর আর কোনও লেখকের জীবনে প্রশংসালাভের এমন বিরল সৌভাগ্য হয়নি। অথচ আশ্চর্যের, চেখভের নাটক লেখা তিনি একদম সমর্থন করতেন না। ছোটগল্পের খ্যাতির শিখরে আরোহণকারী সেই চেখভ যখন তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের শেষ ন'বছরে চারটি নাটক লিখলেন আর সেগুলি সদ্যপ্রতিষ্ঠিত মস্কো আর্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল—যুগান্তকারী নাট্যপরিচালক—অভিনেতা স্তানিস্লাভস্কির নির্দেশনায়—তারপর থেকে, চেখভের নাম বাদ দিয়ে আর বিশ্বের থিয়েটারকে ভাবা যায় না। নাটক, নাটাকলা, অভিনয়, রঙ্গমঞ্চ তথা থিয়েটারের পরম অর্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে এই কটিমাত্র নাটক লেখার সুবাদে চেখভের নাম। আজ বিশ্বে বোধহয় এমন কোনও দেশ বা জাতি নেই যাদের রঙ্গমঞ্চে চেখভের নাটক অভিনীত হয়নি। যথার্থ বলতে গেলে, চুয়াল্লিশ বছর আয়ুষ্কালে মাত্র চারটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার দৌলতেই তিনি শেক্সপিয়র, ইবসেন, ব্রেশটের তুল্য গুরুত্ব অর্জন করেছেন। নাট্যকলার ওপর তাঁর প্রভাব পড়েছে অসীম।

বাংলার নাট্যচর্চা চেখভকে আপন করে নিয়েছে। বাঙালির থিয়েটারের ঐতিহ্যের সঙ্গে চেখভ যুক্ত হয়েছেন। ১৯৬৪-তে পবিত্র সরকারের রূপান্তরে আর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়-অভিনয়ে বঙ্গীয় বাতাবরণে 'চেরি অর্চার্ডে'র নাট্যরূপ 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক অবিস্মরণীয় প্রযোজনা। চেখভের হাত ধরে নান্দীকারের এই অভিনয় নাটকলার নানা দিকে পরীক্ষানিরীক্ষার গুণে নতুন অনুভূতি সঞ্চার করেছিল। চেখভ-নাটকের স্বাদ-সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙালির জীবনে। নান্দীকার এ-নাটক অভিনয় করে আলোড়ন সৃষ্টির পর এতকাল বাদে মনে প্রশ্ন জাগে, অজিতেশের আগে আর কেউ চেখভকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আনার কথা কি ভাবেননি? শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্ত? শিশিরকুমারের কি মনে হয়নি? তিনি তো আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের/নাট্যসাহিত্যের মগ্ন পাঠক ছিলেন।

নান্দীকারের পর আরও কয়েকটি নাট্যদল সাড়া জাগানো চেখভ প্রযোজনা করেছে। যেমন অসিত মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় গান্ধারের 'ভস্মা (আঙ্কল ভানিয়া), রমাপ্রসাদ বণিকের নির্দেশনায় পাখি (দ্য সীগাল) আর কৌশিক সেনের নির্দেশনায় স্বপ্নসন্ধানীর 'তারা তিন বোন'। অজিতেশের অভিনয়ে চেখভের বিখ্যাত একাঙ্ক নাটকগুলি তো আজ বাঙালির ঘরের জিনিস। এইসব নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে চেখভের প্রতি বাঙালির যে-টান তৈরি হল তারই প্রসারণ দেখতে পেলাম সত্য ভাদুড়ির সম্পাদনায় 'আন্তন চেখভ : বিষয় নাটক' সংকলনটিতে। চেখভের নাটকের প্রতি ভালবাসার কিংবা নাট্যকার চেখভের দিকে বাঙালির ক্রমবর্ধমান আগ্রহের এক নিদর্শন এই বইটি। ইংরেজি অনুবাদের দৌলতে চেখভের বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের জানাচেনা-পড়াশুনো কম নয় ঠিকই কিন্তু চেখভের নাটক আর থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিয়ে বাংলাভাষায় পুরো একটা সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করার মধ্যে বাংলাভাষার থিয়েটার আর সাধারণ বাঙালি পাঠকের প্রতি একটা দরদের প্রকাশ দেখতে পাই। বাংলাভাষার প্রতি একটি দায়িত্ববোধও। এখন তো বইটা হাতে নিয়ে আর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করছি, আরে, বাংলাভাষায় তবে এতদিন পর্যন্ত চেখভের নাটক নিয়ে

কোনও সংকলন/আলোচনা-গ্রন্থ ছিল না? কী আশ্চর্য! তবে এতকাল আমাদের চলছিল কিসে? ইংরেজি পড়ে? যাঁরা তেমন ইংরেজি পড়তে দড় নন, ইংরেজি বইপত্র জোগাড়যন্ত্র করা যাঁদের পক্ষে সহজ ছিল না, অথচ যে অসংখ্য নাট্যকর্মী বা বাংলা থিয়েটারের সাধারণ দর্শক চেখভের নাটক নিয়ে জানতে চান—তাঁদের হাতের নাগালে বাংলা প্রকাশনা কোনও বই দিতে পারেনি?

এতদিনে (প্রকাশ বৈশাখ ১৪১২), তবে আমাদের হাতে এল এমন একটি প্রয়োজনীয় বই। এরকম একটি সংকলন পাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। কী আছে এতে? একটি সুলিখিত ভূমিকাসহ পাঁচটি বিভাগ। পরিচয়, ছোট নাটক, পূর্ণাঙ্গ নাটক, চিঠিপত্র আর পরিচিতি। নাট্যকার আর মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাট্যোদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া চেখভের অপূর্ব আলেখ্য পাওয়া স্তানিশ্লাভস্কি আর ওলগা নিপারের খুঁটিনাটিসমৃদ্ধ বিশদ স্মৃতিচরণ দুটি থেকে। লেখক-শিল্পী হিসাবে তাঁর মহত্ত্বকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে গিয়ে চেখভের এই দুই অতি আপনজন আসলে লিখে গিয়েছেন এক রূপা সরল সাদাসিধে মহৎ মানুষের কথা। মানুষ হিসাবে তাঁর গভীরতার সূক্ষ্মতার সন্ধান পাই আমরা। নাট্যকলা অভিনয় রঙ্গমঞ্চ অভিনেতা-অভিনেত্রী আর নাট্যকর্মীদের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ আর ভালবাসার স্পন্দন এই লেখা দুটি থেকে বিকীর্ণ হতে থাকে। কী জীবন্ত স্তানিশ্লাভস্কি আর ওলগা নিপারের প্রকাশভঙ্গি! কত তুচ্ছ কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন—চেখভ সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গকেই তাঁরা খাটো চোখে দেখেননি; না-বললেও চলে, এমন কিছু নয়, বলে মনে করেননি। লেখক-নাট্যকারের চেয়েও মানুষ চেখভকে তাঁরা কত বড় মনে করতেন, কিংবা বলা যায় মানুষ চেখভ তাঁদের কাছে ধীরে ধীরে কেমন বড় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর শিল্পপরিধি ছাড়িয়ে, আর তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্যলাভের জন্য কেমন উদগ্রীব হয়ে থাকতেন তাঁরা নিজেদের পুরনো-মলিন হয়ে আসা জীবনকে নতুন করে নেবার তাগিদে, নিজেদের রক্তস্রোতে নতুন প্রাণবেগ সঞ্চারিত করে নেবার আগ্রহে—তার বিবরণ পড়তে পাওয়াও কম 'সৌভাগ্যের নয়।

চেখভ সম্বন্ধে স্তানিশ্লাভস্কির মুখ থেকে আমরা জানতে পারি—

> অশিক্ষিত গরিবগুর্বোরা যে অন্ধকারের মধ্যে পড়েছিলেন, তাতে সামান্য আলোর ছোঁয়া লাগার সম্ভাবনাই চেখভকে ওরকম আনন্দিত করে তুলেছিল। যা কিছুই মানুষের জীবনকে আরও একটু সুন্দর করে তুলতে পারে, তাতেই তিনি দারুণ খুশি হতেন।

(মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে) তিনি আমাদের প্রথম শরিকদের মধ্যে একজন। প্রস্তুতিপর্বে আমাদের প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল অসীম, চাইতেন আমরা যেন নিয়মিত ও খোলাখুলিভাবে তাঁকে সব জানাই।

চেখভ প্রায় শিশুর মতো খুশিতে মঞ্চের চারধারে আর নোংরা সাজঘরগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। থিয়েটারের উজ্জ্বল দিকটা তাঁর যতটা পছন্দসই ছিল, কষ্টকর দিকটাও ততটাই প্রিয় ছিল।

তিনি থিয়েটারকে ভালবাসতেন কিন্তু অশোভনতা পছন্দ করতেন না মোটেই। কোনও ধরনের অশালীনতা দেখলেই তিনি হয় একেবারে সিঁটিয়ে থাকতেন, নয় সেখান থেকে পালিয়ে যেতেন।

অবশ্য চেখভের মন্তব্য বা অভিমতের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য—আলঙ্কারিক এবং অতি সংক্ষিপ্ত। সবসময়ই সেগুলো বিস্মিত করত, আর সেই কারণেই মনে থেকে যেত। তিনি যেন একটা ধাঁধা বলে চলে যেতেন, যেটার অর্থ না বুঝতে পারা অবধি তা মনে গেঁথে থাকতে বাধ্য।

চেখভ আমাদের মহলায় আসতে খুবই পছন্দ করতেন।

চেখভের চিরকালীন স্বভাব ছিল, যখন যা তাঁর মনে ধরে তখন তাই নিয়েই বারবার কথা বলে যাওয়া। আমাদের কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়েই তাঁর আগ্রহ ছিল, তবে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল—কী ধরনের নাটক আমাদের প্রযোজনার তালিকায় থাকছে, সেই দিকে।

যে কেনও সাংস্কৃতিক কাজ বা উন্নতির লক্ষ্যে যে কোনও পদক্ষেপ চেখভকে খুবই আনন্দ দিত।

সে সময় আমাদের কথাবার্তা হত মূলত আমাদের নতুন থিয়েটার নিয়ে।

নাট্যকার চেখভের সঙ্গে সম্ভাবনাময়ী তরুণী অভিনেত্রী ওলগা নিপারের পরিচয়, গভীর প্রণয় আর স্বপ্নের মতো অতি সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যজীবনের কাহিনি নিপারের কাছ থেকে বিশ্ববাসী শুনতে পেয়েছে। এক রোমাঞ্চকর অথচ করুণ অধ্যায়। বিয়ের আগে নিপারকে লেখা চেখভের অসামান্য চিঠিগুলি তাঁর কোনও শ্রেষ্ঠ গল্পের চেয়ে ন্যূন নয়। অসুস্থতার জন্য চেখভকে বছরের বেশিটা সময় কাটাতে হত রাশিয়ার উষ্ণপ্রদেশ ইয়ালটায় অথচ তাঁর মন পড়ে থাকত শীতের মস্কোতে—যেখানে রয়েছে থিয়েটার, তাঁর MAT-এর অনুরাগী বন্ধুরা যেখানে মঞ্চ কাঁপাচ্ছে, যে মস্কোর মঞ্চে

অভিনয় করছে ওলগা নিপার; যেখানে নতুন নাটকের প্রস্তুতি চলছে, মহলা হচ্ছে—সেখানেই তো জীবন, বেঁচে থাকার তাৎপর্য। ওলগা নিপার তাঁর অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণের এক জায়গায় অকপটে তাঁদের বিবাহিত জীবনের এক চরম জটিলতার আর তার ফলে উদ্ভূত সংকটময় পর্বের কথা বলেছেন। স্ত্রী অভিনয়ের জন্য মস্কোতে আর তাঁর অসুস্থ রুগ্ন-যক্ষ্মাগ্রস্ত-মরণাপন্ন স্বামী গরম আবহাওয়ায় সুদূর ইয়ালটায়—তাহলে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের অর্থ কী? অন্যদিক দিয়ে নিপারকে ইয়ালটায় গিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাস করতে হলে, তাঁর দেখাশুনো করতে হলে পর স্ত্রীর অভিনয়-জীবনের কি হবে? অভিনেত্রীর জীবন, MAT-এর সঙ্গে যুক্ত স্পন্দমান প্রাণচঞ্চল জীবন—তারই বা কী হাল হবে? দু'জনে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই চরম সংকটে—নিপার আমাদের তা খুলে বলেছেন।

স্তানিশ্লাভস্কির পরবর্তী প্রজন্মের নির্দেশক তোভস্তোনোগভ MAT-এর উজ্জ্বল চেখভ-প্রযোজনার ঐতিহাসিক বিপুল সাফল্যের পরও কেন আবার চেখভের নাটক করতে চান আর কেনই বা তিনি তাঁর দুঃসাহসী আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য 'তিন বোন' বেছে নিয়েছেন—তার একটি চমৎকার কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন। এক মহান শিল্পীর নিজের কাছে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানোর দলিল এই প্রবন্ধটির অনুবাদ রয়েছে এই সংকলনে। তাঁর কাছে চেখভ সাহিত্য ছিল আধুনিক হয়েও ধ্রুপদী। নতুন মানসিকতা দিয়ে চেখভের নাটকগুলিকে তিনি বিচার করেছেন। তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন আবার চেখভ করার তাৎপর্য কোথায়; আজকের দিনে চেখভের প্রয়োজনীয়তা আর প্রাসঙ্গিকতা কেন। তিনি নতুন প্রজন্মের অভিনয়শিল্পী আর নির্দেশকদের কাছে চেখভের হয়ে দাবি করেছেন 'উপযুক্ত অভিনিবেশ, অকৃত্রিম ভালবাসা ও সুগভীর খনন।' তাঁর মতে 'সবসময়ই চেখভ আমার কাছে যৌবনের অগ্রদূত, জীবনের প্রেরণাদাতা, যোগ্য শিক্ষক, বিচক্ষণ বিচারক ও প্রাজ্ঞ বন্ধু'; 'জীবনের বীভৎস এবং সুন্দর, মানুষের পরস্পর বিপ্রতীপ দুই মনোবৃত্তিকে তাঁর নাটকে একসূত্রে বেঁধে অতি সূক্ষ্ম কাব্যিক লাবণ্যে তা প্রকাশ করে গেছেন'। 'আমাদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে কিছু না করতে পারার যন্ত্রণা, আমাদের চরিত্রে জন্ম নিচ্ছে এক ধরনের কূপমণ্ডুকতা। এরকম মানসিক অবস্থার অতিসূক্ষ্ম প্রকাশ আমরা তাঁর এই নাটকে বড় সুন্দর করে পেয়েছি।' সবশেষে তোভস্তোনোগভের সিদ্ধান্ত যে 'জীবনে যাদের অশুভ কর্তৃত্বের ফলে চেখভের নায়কদা জীবনকে, ইচ্ছে থাকলেও, কাব্যিক সুষমায় প্রকাশ করতে পারল না—তাদের চরিত্রগুলোকে আমরা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে তুলতে চাই।'

স্তানিশ্লাভস্কি আর নেমিরোভিচ-দানচেঙ্কোর MAT-এর উজ্জ্বল ঐতিহ্য আত্মসাৎ করে আজকের থিয়েটার চিন্তায়-ভাবনায় পরিকল্পনায় প্রয়োগে কোথায় এসে পৌঁছেছে—তিনি তার দিশা দিতে চেয়েছেন। চেখভকে নাট্যপ্রয়োগে সমকালীন করে তোলা শ্রেশটের চেয়ে কঠিন বলে তিনি মেনেছেন। বর্তমান নির্দেশকদের কাছে এ এক দিগদর্শী ভাষ্য।

এরকম আরেকটি প্রখর বিশ্লেষণী প্রবন্ধ রয়েছে এই সংকলনে। নান্দীকার কেন চেরি অর্চার্ডের রূপান্তর মঞ্জরী আমের মঞ্জরী অভিনয় করতে মনস্থ করেছে তার কারণ জানিয়ে ডিসেম্বর ১৯৬৪-তে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন পবিত্র সরকার। শুধু চেখভকে বুঝতেই নয়, আধুনিক বাংলার থিয়েটারের ইতিহাসকে বুঝতেও ৪০ বছর আগে লেখা এই প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে 'চেখভের মতো আর কোনও নাট্যকার catastrophe-কে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে পারেননি।' 'আমাদের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। স্তানিবাদ কোন উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছুতে পারে এবং কোথায় পৌঁছুতে পারে না তার অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করতে চাই।'

অন্য তিনটি প্রসিদ্ধ নাটকের রূপান্তরের সঙ্গে এই সংকলনে 'সিদ্ধুসারস'-এর অনুবাদ বা রূপান্তর থাকা অপরিহার্য ছিল। (ভূমিকায় দেখছি সম্পাদক এ বিষয়ে সচেতন।) সেরকম চেখভকে নিয়ে গোর্কির অসামান্য স্মৃতিচারণটিও সত্যবাবু এই সংকলনভুক্ত করলে পাঠকের প্রাপ্তির মাত্রা আরও বেড়ে যেত।

আরও কিছু চিঠির অনুবাদ আশা করেছিলাম। আশা করি যে এ সংকলনটি বাংলাভাষী থিয়েটারপ্রেমী পাঠকের সমাদর পাবে আর পরবর্তী সংস্করণে সম্পাদক এই কয়েকটি ঘাটতি পূরণ করবেন।

এরকম সুচারু রূপে প্রকাশিত আর্ট প্লেট সম্বলিত একটি গ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্টিকটু। বানানরীতি গ্রহণে সামঞ্জস্য নেই। পেপারব্যাক হিসাবে দাম একটু চড়া লাগে বইকি। কয়েকটি ছোটখাটো দিকও সম্পাদকের মনোযোগ পেলে ভাল লাগত। যেমন স্তানিশ্লাভস্কির স্মৃতিচারণে সব জায়গায় আছে 'ইয়াল্টা' অথচ পরেই নিপারের স্মৃতিচারণে সর্বত্র দেখতে পাই 'ইয়ালতা'। দু'টো লেখাতেই কোনও একটি বানান অনুসরণ করলে ভাল হত না কি? এছাড়া প্রচ্ছদে আর নামপত্রে যথাক্রমে 'সম্পাদনা ও ভূমিকা' আর 'ভূমিকা ও সম্পাদনা' লেখাও চোখে লাগে। এই শব্দক্রম বদলের অর্থ কি? শুধু সম্পাদনা লেখাই কি যথেষ্ট হত না?

আন্তন চেখভ : বিষয় নাটক—সম্পা : সত্য ভাদুড়ি/মৌহারি, কলকাতা-৮৬, পরিবেশক—প্যাপিরাস, কলকাতা-৪/ ২০০.০০

ছোট্ট পড়ুয়াদের জন্য তালিবান ও আলকায়দা

বুলবুল আহমেদ

আমেরিকার টুইন-টাওয়ার ধ্বংস হবার পর থেকে পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এবং এই নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি। আজকের তথ্য প্রযুক্তির মহাবিস্ফোরণের যুগে বাংলাভাষায় লেখা একটা নিরীহ বই কতটা সম্ভব হবে মানুষের ধারণা বদল করতে? আজ প্রায় সারা পৃথিবীতেই মানুষের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস কমতে বসেছে। অন্যান্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দাপট প্রতিদিনই বাড়ছে। আর হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের 'তালিবান ও আলকায়দার স্বর্গরাজ্যে' নামকরণের জন্য একটা আলাদা মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেও এই বই আদতে কিশোর-বয়সিদের উদ্দেশে লেখা। হিরণ্ময়ের নতুন ও পুরাতন কিছু ভ্রমণকথা আছে এ বইতে। তিনি ভারতের নানা জায়গা সাইকেলে ভ্রমণ করেছেন প্রথমযৌবনে, বন্ধু কৃষ্ণব্রত গুহকে সঙ্গে করে। ভারতের বাইরে খাইবার গিরি অঞ্চলে আফ্রিদি উপজাতির বসতি এলাকাতেও হাজির হয়েছেন তাঁরা। সেখানকার মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, আতিথ্য লাভ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এবং বলা প্রয়োজন তাঁরা এইসব করেছেন কেবল আনন্দ থেকে, সেখানে একাডেমিক দায় কাজ করেনি।

ধুলোজমা পাতা থেকে হিরণ্ময় ভট্টাচার্য উদ্ধার করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা—'আর কোনও বাঙালি খাইবার গিরিপথ অঞ্চলে এমনভাবে ঘুরেছে কি না জানি না। সেটা ইংরেজ রাজত্বের শেষ বছর। তারপর অন্তত পশ্চিমবাংলার বাঙালির পক্ষে সে মুখে পা বাড়ানো সাপের মাথায় পা দেবার সামিল। সাইকেলে কলকাতা থেকে পেশোয়ার যাবার শেষ পর্যায়ে শুনি কলকাতার ঐতিহাসিক দাঙ্গার কথা। অগাস্ট ১৯৪৬ কলকাতায় যখন তুমুল তাণ্ডব চলেছে আমরা ছিলাম লাহোরের কালীবাড়িতে। সেটা আবার মুসলিম পল্লীর মাঝখানে। কদিন সেখানেও টেনশন ছিল। সারা শহর পুলিশ টহল দিয়েছে। ...ব্রিজের কাছাকছি গ্রামের সর্দার নুর সাহেবের আতিথ্যে রাতটা নিশ্চিন্তে কেটেছে, রাস্তা থেকে বহু নিচে সিন্ধু নদীর তীরে, উন্মুক্ত আকাশের তারা গুনতে গুনতে। ...সেই রাতে আর এক হিন্দু পরিবার তাদের যুবতী মেয়ে নিয়ে নির্ভয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামের নাম মালাইটোলা, মাঝিদের গ্রাম। বাদশা আকবর তাঁর নৌবাহিনীর স্বার্থে আর মাঝিদের সুবিধার জন্য গ্রামটা তাদের দান করে যান।' পরেশনাথ মন্দির, হাজারিবাগের জঙ্গল, দিল্লির কথা থাকলেও এই বইয়ের মূল বিষয় আফগানিস্তান ও তার মানুষ আর তার অতীত ও বর্তমান।

তালিবান জমানা শুরু হবার চার দশক আগের সময়টায় মহিলারা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ পড়ুয়া ছাত্রী। সে সুখের সময় আর থাকল না। ফতোয়া—ছাত্রী হও কি, অধ্যাপিকা হও, কি মজুর, পথে বেরতে হলে সবাইকে বোরখা মুড়ি দিয়ে বেরোতে হবে। না মানলে শাস্তিভোগ। পিটুনি অবধারিত। সত্যি কয়েকজনকে রাজপথে প্রহারেণ ধনঞ্জয় করা হয়েছে। যে মহিলারা তাদের পরোয়া না করে পথে বেরিয়েছিল, তালিবান বাহিনী অ্যান্টেনা ওড়ানো গাড়ি থেকে নেমে তাদের লাঠিপেটা করছে, এ ছবি দেখেছে সারা পৃথিবীর লোক। আমরা জানি সে আঘাত দেহে যত না লেগেছে, তার চাইতেও বেশি তাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তবে এর পিছনেও একটি ইতিহাস আছে এবং লেখক তাঁর সংযত ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা ব্যক্ত করেছেন।

১৯৭৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর রাশিয়ার বাহিনী কাবুলে প্রেসিডেন্ট হাফিজুল্লার প্রাসাদ দখল করে। তাঁকে হত্যা করা হয়। সিংহাসনে বসেন সোভিয়েত মদতপুষ্ট নেতা বারবাক কারমাল। তার পরের ঘটনাক্রমকে লেখক তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রাশিয়ার প্রতাপ। সে সময়ে যারা দেশটাকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করেছে তাদের কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থন দিয়েছে আমেরিকা, আফগান বাস্তুহারাদের জন্য গড়া মাদ্রাসার ছাত্ররা হয়েছে তালিবান। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮৮-৯২, এই সময় দেশের শাসনভার ধরে রেখেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি নাজিবুল্লা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর নাজিবুল্লা আর বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। আর শেষ পর্যায়ে ১৯৯২ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঘটনার ঘনঘটা। আর সকলেই তা জানে।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য তাঁর এই বইয়ে তালিবানদের উৎপত্তি সম্পর্কে একটা সঠিক এবং নিরপেক্ষ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। ইসলামের মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে এর পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এই বই আলকায়দা ও ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে কিশোর বয়সি পড়ুয়াদের একটা স্বচ্ছ ধারণা দেবে। আর কিছু প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান ঘটাবে।

তাছাড়া আফগানদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথা, অতিথি-পরায়ণতার কথা বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। ইংরেজদের ভুবনবিজয়ী কূটকৌশলও হার মেনেছে তাদের কাছে এসে।

বাঙালি পাঠক মুজতবা আলীর কল্যাণে অন্য আফগানিস্তানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে অনেক আগে। তিনি যখন অধ্যাপনার কাজ নিয়ে কাবুলে যান তখন আমির আমান উল্লার সময়। বাদশা ইউরোপ ঘুরে এসেছেন, তাঁর ইচ্ছে দেশটাকে আধুনিক করা। সংস্কারের গোঁড়ামি থেকে দেশকে মুক্ত করা। তিনি আধুনিক তুরস্কের জন্মদাতা কামাল আতাতুর্কের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ কিন্তু মোল্লারা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকেনি আমানউল্লার প্রগতির হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়ে। লেখক মন্তব্য করেছেন, আমানউল্লা সুপারসনিক বেগে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময় তাঁকেও হার মানতে হয়। একটু ধীরে সুস্থে এগোলে হয়ত বাধাটা এতটা মারাত্মক হত না। আর এ প্রসঙ্গে বলা দরকার মুজতবার মতো না হলেও এ বইয়ে হিরণ্ময় ভট্টাচার্য রসিকতা করতে কসুর করেননি। বোঝা যায় নানা জনের রসিকতা কেন তার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়!

তালিবান ও আলকায়দার স্বর্গরাজ্যে—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য/সাগর পারে, লন্ডন/৪৫.০০

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ চারটি কাব্যগ্রন্থ

[চতুরঙ্গ দপ্তরে নিয়মিত প্রচুর কবিতার বই সমালোচনার জন্য জমা পড়ে। ইচ্ছে থাকলেও স্থানাভাবে আমরা সে-বইগুলির প্রতি সুবিচার করতে পারি না। এখানে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

—স. চ.]

ভাষায় যেটুকু বলা যায়—বিজয়া মুখোপাধ্যায়, আনন্দ, কলকাতা-৯, ৬০.০০

বিজয়া আমাদের সময়ের এক প্রধান কবি। এই বইটিতে অনেকগুলি বার বার ফিরে পড়ার যোগ্য কবিতা রয়েছে। তাঁর কবিনৈপুণ্য আর জীবনবোধের পরিচয়ে সেগুলি উজ্জ্বল। নারী হিসাবে তাঁর নিজস্ব বোধ আর জগৎ-কে দেখার ভঙ্গিতে ঝলমল করছে কিছু কবিতা, যেমন যমযমী সংবাদ, শাড়ির পোশাকে আইনি পকেট, পরিসংখ্যান-২০০২, টুকাই, ওরা। কবিতায় গল্পের ছোঁয়া থাকা উচিত কি না, তাতে কি কবিতার কিঞ্চিত হানি ঘটে এমন প্রশ্ন জাগাতে পারে তাঁর এই কবিতাগুলি—সুহাসের বাড়ি-ফেরা, অপুর কথা। কাহিনির ইশারা দিয়ে গড়া অসাধারণ একটি কবিতা 'দুঃখী কালো মেয়ে'। বাংলায় কালীকে নিয়ে গান রচনার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। এ কবিতাটি তাতে এক অসামান্য আধুনিক সংযোজন। যিনি এই কবিতাটিসহ 'পাখি', 'দেখি সেই বাজ', 'পাঁচালি'-র মতো অনেক গভীর কবিতা লিখেছেন তিনি কেন কবিতার নামে সুনীলকে নিয়ে 'কবির বয়স নেই'-জাতীয় প্রতিবেদন লিখতে গেলেন? তাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা কবিতা কাউকেই বড় করা গেল কি?

কল্পনা এবং একাকীর কিংবদন্তী—অমিতাভ গুপ্ত, ডি. এন. পাবলিকেশনস্, কলকাতা-৯, ৩০.০০

ষাট-সত্তরে লিখতে শুরু করে বর্তমানে বাংলার অন্যতম প্রধান কবি অমিতাভ গুপ্ত। তাঁর 'প্রণীত কবিতাপুঁথি ২৩' উৎসর্গ করা হয়েছে কল্পনা চাওলা এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে। কল্পনা চাওলাকে নিয়েই এ পুঁথির প্রথম কবিতাটি মনে দাগ কেটে বসে। শব্দ-চিত্রকল্প দিয়ে কবিতার রূপ নির্মাণে দুরূহতার দিকে যাত্রার একটি সচেতন ইচ্ছে থাকলেও অমিতাভ গুপ্ত আসলে লিরিক কবি। তাঁর কবিমন আধুনিক পৃথিবীর জটিলতাগুলিকে আয়ত্ত করে নিয়েও আদ্যন্ত লিরিক্যাল। এই পুঁথিটির এইসব নিবিড় গীতিকবিতায় যে-কেউ আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারেন—না দেওয়ার উদ্দেশে, অসি, স্তোত্র, পটুয়াপল্লী, পাহারা দেওয়া। শ্রদ্ধা কিংবা বোন—গভীর

বেদনাসঞ্চারী। কিন্তু এমন সব কবিতার পাশে একেবারে মানায় না কবিতা-লেখা নিয়ে কৈশোরক উচ্ছ্বাসভরা 'তীর্থযাত্রা'। জীবনবোধে, ভাষাব্যবহারে আর ছন্দ-প্রয়োগের দক্ষতায় তিনি নিজের স্থানটি দৃঢ় করলেন এই কাব্যপুঁথিতে।

বেদ পয়স্বিনী—সৌমনা দাশগুপ্ত, কৃত্তিবাস প্রকাশনা, কলকাতা-১৯, ৪০.০০

নতুন শতকের তরুণ কবিদের মধ্যে কবিতা লিখে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন সৌমনা দাশগুপ্ত। এটি তাঁর প্রথম কবিতার বই। সহজ করে বলতে চেয়েও ধীরে ধীরে তাঁর কবিতা কখন যেন দুরূহতার দ্বার ছুঁয়ে যায়। বলা পঙ্‌ক্তিগুলির চেয়ে না-বলা অনুভবের ইশারা টের পাওয়া যায় বেশি। অনেকটা না-বলা কথা কবিতাকে ঘনবদ্ধ করে তোলে। তা যেমন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, তেমনই কখনও বা রসগ্রহণে বাধাও দেয় বই কি। উপমার ধরনেও নিজস্বতা। ভাল লেগে যায় এই কবিতাগুলি—রূপান্তর, শীত, দহন, নদীর ডায়েরি থেকে, গ্রীষ্মস্নান, পতনের দিনরাত, অনামী বারোমাস্যা। এগুলি তাঁর কবিত্বশক্তি আর জীবনবোধকে চেনায়। তিনটি দীর্ঘ কবিতা এ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। কবিতা দিয়ে তিনি জীবনের গভীরতল স্পর্শ করতে চান এরকম উচ্চারণেঃ 'এই বৃষ্টিতে প্রথম তোমাকে ছুঁয়েছি/ সেওন! ইস এত খসখসে, জ্বলে যাবো যে।/আমার তীর্থে আগুন। নেমে আসছে শিখা/ খসখসে সুখে। আমি তোমার প্রথম ফুলে/ঢেলে দিচ্ছি, নামিয়ে রাখছি গ্রীষ্মস্নান।'

ব্যবহারিক রূপবিজ্ঞান তত্ত্ব—তাপস রায়, কৃত্তিবাস প্রকাশনা, কলকাতা-১৯, ৪০.০০

কাব্যগ্রন্থের নামে চমক দিতে চেয়েছেন তাপস রায়। দরকার ছিল কি? কারণ এ বইটিতে তিনি কয়েকটি মনে রাখার মতো কবিতা গেঁথে দিতে পেরেছেন। যেমন প্রথম কবিতাটিই। প্রথম স্তবকের উচ্চারণের গাঢ়তা মন টেনে নেয়ঃ 'অন্তর্গত ধ্বনিটিকে বলি ডেকে/আরও রং দাও বাঁচার ছলনাটিকে/ পরিণাম ভেবে দশদিক কৃশ, একা লক্ষ্মীও ফিকে'। ঠিক এরই বিপরীত ঘরানার কবিতা লিখতে চেয়েছেন গ্রন্থনাম কবিতাটিতে। কবিতাটি অন্য ধরনের স্বাদ দিলেও পুরো বই পড়ে মনে হল এ তাঁর স্বধর্ম নয়। 'টেলিফোনের অজানা তারের ভেতর কথারা কেঁপে কেঁপে ডানা মেলে', 'জল থেকে যে রং টপটপ ঝরে যাচ্ছিল তা তোমার আহ্বান/তুমি শাণিত হওয়ার আগেই প্রকাশ্যে নিসর্গ জ্বালিয়ে দিয়েছ', 'মাটি ফুঁড়ে উঠে পড়েছে গাছপালা, পিঁপড়ে/মাল্টিস্টোরিড শূন্যতা/যেখানে যাবার কথা ছিল, যাওনি', 'সেইসব পুরনো ইশারা আবার উঠে এসে বসেছে বারান্দায়'—এই রকমই তাঁর নিজস্ব উচ্চারণ। যদিও 'মেঘ কালো হয়ে এলো বলে আকাশ বিরহী দেখাচ্ছে' গোছের পঙ্‌ক্তি লেখা তাঁকে মানায় না।

স্মরণে

আলোর কারবারি নয়, তাপস সেন আলোর মহাজন

কুমার রায়

আলো আর অন্ধকার নিয়ে যাঁর কারবার কয়েক যুগ ধরে সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাপস সেন চলে গেলেন গত ২৮শে জুন বুধবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে। বিগত শতাব্দী ও বর্তমান শতাব্দীর সেতুবন্ধনের কাজে নাট্যের জগতে যিনি সবচেয়ে চলমান ব্যক্তি ছিলেন তাঁকে আর আমরা দেখতে পাব না। শরীর নানাভাবে তাঁকে উৎপীড়িত করে এসেছে বিগত কয়েক বছরে কিন্তু মনের অসাধারণ জোর তাকে থামতে দেয়নি। এই সৃজনশীল মানুষটি, এই অভিনব উদ্ভাবনী শক্তির আঁধারটি এবং এই প্রতিবাদী জীবনটি শেষ হয়ে গেল।

তার মৃত্যুর পর অনেকে অনেকভাবে তাকে এবং তার শিল্পজীবন এবং ব্যক্তিজীবনকে অন্তরের আবেগ মিশিয়ে বুঝতে চেয়েছে এবং নানা পত্র-পত্রিকার পাতায় তা প্রকাশও পেয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি আমাদের নাট্যঅঙ্গনকে আলোয় আলোকময় করা হীরকদ্যুতি। আমাদের আলোর কবি। কেউ তার মৃত্যুকে, আলো থেকে অন্ধকারে পাড়ি দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর বহুকালের অন্তরঙ্গ এক বন্ধু চিত্রপরিচালক মৃণাল সেন—রবীন্দ্রসদনে শায়িত তাপসের ফুলে ফুলে ঢাকা মৃতদেহের সামনে সেদিন বললেন যে তাপস ছিল অন্ধকারের প্রহরী। এই সবটা নিয়েই আমার বন্ধু তাপস সেন।

'বহুরূপী'-র প্রতিষ্ঠালগ্নের পরের বছরে সেই ১৯৪৯ সালে 'পথিক' নাটকের প্রযোজনা-কাল থেকেই পরিচয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শম্ভু মিত্র-র পরিকল্পনায় তখন সবে সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। তিনি সংগঠন এবং নির্মাণের স্থপতি। নাট্যনির্দেশকও। পর পর 'উলুখাগড়া', 'চার অধ্যায়'। তাপস সেনের আলোকপরিকল্পনায় আর আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে তাপস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকল। আমরা ভাল বন্ধু হয়ে গেলাম। হাল আমল পর্যন্ত সেটা অটুট ছিল। সে-ই বলত আজকাল, -'সম্বোধনে 'তুই' বলার লোক তো কমে গেল রে—এখন তুই আর আমি আর মৃণাল। আর তো কেউ নেই।' হ্যাঁ, সেই তাপস চলে গেল।

'রক্তকরবী' নাটকের সফল প্রযোজনার পর তার নির্দেশক শম্ভু মিত্র বলেছিলেন—'তাপস সেন হচ্ছেন আলোর ব্যাপারে একজন বিখ্যাত ব্যাপারি'। তার পরে পরেই সে তো তার কাজ দিয়ে সত্যিই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। বহুরূপী ছাড়াও তখন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, উত্তর সারথি, অনুশীলন সম্প্রদায়, গন্ধর্ব, নান্দীকার প্রভৃতি নাট্যদলের প্রয়োজনায় তার অসামান্য কাজ মানুষকে মুগ্ধ করেছে। কলকাতার হিন্দি থিয়েটারে ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত 'অনামিকা'-র একাধিক নাটকে আর ১৯৬৪ সাল থেকে, মহীশূর, কর্নাটক, অসম, বম্বে, ন্যাশানাল স্কুল, দিল্লিতে একাধিক নাটকে বিশেষকরে দিল্লি এবং বোম্বাই নাট্যজগতে তার কাজ এবং স্বীকৃতি তো এখন ইতিহাস। আর নৃত্যনাট্যে তার আলোকপরিকল্পনায় সমৃদ্ধ হয়েছে কেলুচরণ মহাপাত্র, অনাদিপ্রসাদ, বৈজয়ন্তী মালা, মৃণালিনী সারাভাই, হেমা মালিনী, অমলাশঙ্কর, সাধনা বসু প্রভৃতি প্রতিতযশা শিল্পীদের কাজও। আর সি এল টির গৌরবের কালে প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে কলকাতায় এবং বিদেশে আলো নিয়ে সহযোগ দানে তাপস ছিল একনিষ্ঠ। সুরেশ দত্তর সি-পি-টি-র 'রামায়ণ', 'আলাদীন, 'সীতা', —আশ্চর্য কাজের সব নিদর্শন পুতুলনাটকে।

এই তালিকা অসম্পূর্ণ হল হয়ত, —কিন্তু দিতে হল একটি অফুরান প্রাণসম্পদে ভরপুর ঋজু, অক্লান্ত পরিশ্রমী মানুষের কাজ এবং পরিকল্পক মানুষটির পরিচয় পাওয়া যাবে এই আশায়।

একথা তো ঠিক যে তাপস সেন তাঁর কার্যকালে বাংলা থিয়েটারে আলোকে (এ ব্যাপারে বাংলা থিয়েটারের প্রথম পথিকৃৎ' শিল্পী সতু সেনকে স্মরণে রেখেই বলছি) প্রথম সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মকে অঙ্গীভূত করেই পৃথক এক শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর নিজস্ব মৌলিক নান্দনিক বোধ তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে সারা ভারতে। অথচ গভীর পরিতাপের বিষয়—তাঁর প্রয়াস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংবাদ

পত্রে বা অন্য কোনও সংবাদমাধ্যমে স্থান পায়নি। অথচ কোনও প্রাক্তন সাংসদের বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কোনও ব্যক্তির অখ্যাত কোনও ছেলে-মেয়ের অনৈতিক কাজের কেচ্ছা দিনের পর দিন প্রকাশ পায়! মগ্ন আলোর কবি তাপস সেন সেখানে অপাঙক্তেয় হয়ে রইলেন।

আমাদের নাট্য আন্দোলনের অনেক সুখ দুঃখের অংশীদার, অনেক অভিজ্ঞতার শরিক ছিল সে। থিয়েটারের নানা দিক-পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত সে সব অভিজ্ঞতা। এই স্মরণ আলেখ্যতে সে সব বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। কেননা তাপস তো শুধু আলোর কারবারি ছিল না—সে যে নাট্য আন্দোলন তথা নাট্যশিল্পের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিল এ কাজ আরম্ভের ছিন্ন দিনের মধ্যেই। তার চিন্তা-ভাবনায় সমাজ মানুষ ও রাজনীতি সম্পৃক্ত হয়ে এক সচেতন শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চৈতন্যবান মানুষ হিসাবে।

মানুষের আদিম ভয়ের উৎস বোধকরি অন্ধকার। আমরা সেই ভয়টা বহন করে আসছি অনাদ্যন্ত কাল ধরে। আর সেই সঙ্গে আলোর আকাঙ্ক্ষাও করেছি। আলোর সঙ্গে আনন্দের, অন্ধকারের সঙ্গে বেদনার যোগসূত্রও আদিকালের। সাহিত্যে, ধর্মে, লোককথায় আলো আর অন্ধকারের কত না মৈত্রী, কত না বিরোধের দ্যোতনা! মানুষের মনের ওপর এর কী প্রচণ্ড প্রভাব! আধুনিক আলোকশিল্পী তাপস সেন—মনের ওপর এই আলো-অন্ধকারের প্রভাবের কথাটা বুঝেছিলেন; ধরতে পেরেছিলেন এর প্রতিক্রিয়া। আমাদের আবেগের প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট সুরে বেঁধে দেবার ক্ষমতা ছিল আলোকশিল্পী তাপস সেনের হাতে। যবনিকা উঠে যেতে যে আলো বা অন্ধকার বা ছায়া আমরা দেখতে পাই তা আমাদের মনের ঠিক সুরটি ধরিয়ে দিত। তাপস ছিল সেই আলো-ছায়ার শিল্পী। নিরন্তর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সামান্য আলোর সরঞ্জাম নিয়ে—কখনও বিস্কুটের টিন, বার্লির বা দালদার কৌটো, কখনও ফেলে দেওয়া প্রেক্ষাগৃহের Exit লেখা আলোর খাপ, কখনও রাংতার দোমড়ান-কোঁচকান ফয়েল ব্যবহার করে তার উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া চালিয়ে মঞ্চে অসাধরণ সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। তাই আমার কাছে তাপস কেবলমাত্র আলোর 'যাদুকর' নয়। এই বিশেষণে যখন তাকে চিহ্নিত করা হয় তখন আমার ভাল লাগে না। কারণ—'যাদু' কথাটার সঙ্গে কেবল কৌশল শব্দটি মানায়, খানিকটা চালাকিও বা। একটা ফাঁকি, মানুষকে বোকা বানিয়ে মোহমুগ্ধ করে তোলার কারসাজির কথা মনে আসে ওই যাদু শব্দটির মধ্যে। তাপসের কাজে কোনও ফাঁকি নেই, মানুষকে বোকা বানাবার চেষ্টা নেই। আধুনিক থিয়েটারে আলোর ভূমিকা অনেক জটিল। অনেক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে; যে-বিশ্লেষণ, যে-জটিলতা নাটকের সঙ্গে—নাট্য উপস্থাপনায় নির্দেশকের মূল পরিকল্পনার সঙ্গে—তার সঙ্গে যুক্ত রেখেই তাকে কাজ করতে হয়েছে। বিচ্ছিন্ন নয়, তাই 'যাদু'ও নয়, অনেক প্রত্যক্ষ। প্রতিভাবান আলোকশিল্পী হিসাবেই, সৃজনশীল থেকেই এই সম্পাদ্য শিল্পে আপন কর্মকুশলতা ও কল্পনার ছাপ প্রায় প্রতি প্রযোজনাতেই তাপস সেন রেখে গেছেন। তার স্মৃতি, কাজের সৌকর্যের কথা তাই আরও বহুকাল মানুষের মনে থাকবে। সে ছিল এক কল্পনায় সমৃদ্ধ আলোক শিল্পী।

পূর্ববঙ্গে তার পৈত্রিক বাসভূমি। বড় হয়েছে, লেখা পড়া শিখেছে দিল্লিতে। পলিটেকনিক পড়াশুনো চালিয়েছিল বিদ্যুৎশিল্পের কারিগর হবে বলে। কিন্তু তার স্কুলের ড্রয়িং-এর শিক্ষক প্রতাপ সেন তার জীবনে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠল। আর এ কথা জীবনের শেষ পর্যন্ত তাপস ভোলেনি। বলবার কথা বলতে গেলেই সে সেই দিল্লির রাইসিনা স্কুলের শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছে। নতুবা আমরা জানবই বা কীভাবে সে নাম! সব ঋণ স্বীকার করার ঔদার্য ছিল বলেই তাপস বড় হতে পেরেছে। 'ওরা চারজন' শীর্ষক একটি নিবন্ধে যে চারজন মানুষ তার মনের ওপর প্রভাব ফেলেছিল তাদের কথা জানাতে গিয়ে লিখেছে, —'আমাদের বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারকে এক উজ্জ্বল রূপ দেবার পিছনে যে চারজন ব্যক্তিত্বের অবদান সব চেয়ে বেশি তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এই চারজন হলেন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চারজনই নাটক লিখেছেন, প্রযোজনা করেছেন এবং অভিনয় করেছেন। বাংলা থিয়েটারের গৌরবময় পথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরও অনেকেই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, কিন্তু এঁদের মতো নাটকের সামগ্রিক অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত নয় অন্য কেউ। এঁদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি প্রত্যেকেই নিজস্বভাবে থিয়েটারকে নিয়ে ভেবেছেন, প্রয়োগ করেছেন, পদ্ধতিগতভাবে একজনের সঙ্গে অন্যজনের যথেষ্ট অমিল রয়েছে কিন্তু চারজনই এক জায়গায় স্থির ছিলেন। সেটা ছিল ভারতবর্ষের তথা বাংলাদেশের সামগ্রিক উত্থানপতনকে, তার সমস্যাকে থিয়েটারের আলোয় প্রতিবিম্বিত করা।'

এই লেখাটা, তাপস সেনের মৃত্যুর পর, স্মরণ-আলেখ্য হিসাবে বিবেচিত হবে হয়ত। কিন্তু সচেতন থাকতে চাইছি, প্রচলিত অর্থে তা যেন না হয়ে ওঠে। তার কর্মময় জীবনের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র তুলে ধরার প্রয়াসের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাই। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে আজ তাপস দীর্ঘকালের কাজ, তার ব্যাপকতা, শুধু তো নাট্যের

ক্ষেত্রে নয়, তার সৃজনী ও উদ্ভাবনী আলোর বিন্যাস মঞ্চনাটক ছাড়াও নৃত্যে, দর্শনীয় নানা জায়গায়, মাঠে, ময়দানে, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সৌধে। এটা তো সম্ভব হয়েছিল কল্পনা ও দক্ষতার নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষার চর্চায়।

যে কোনও শিল্পচর্চায় কেউ যদি তাঁর কাজের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে থাকেন, —যেমন তাপস সেন আলোর ক্ষেত্রে ঘটিয়েছিলেন, তাহলে ধরে নিতেই হবে যে সেই সক্ষমতার পিছনে বহুদিনের মনোযোগ এবং হাতে কলমে কাজের প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু এই কাজে যেটা দেখেছি সেটাও বলে নিতে হয় এই ফাঁকে, অনেক কিছু বারবার তাকে গড়তে হয়েছে আবার ফেলেও দিতে হয়েছে। বারবার বদল ঘটিয়ে তবেই সৃষ্টি হয়—যা আমরা দেখি। নাটকে তো এটা হয়-ই। তিনি তৃতীয় বিশ্বের অর্থাৎ অনুন্নত দেশের শিল্পী। যে সমস্ত যান্ত্রিক উন্নত কলাকৌশল, উন্নত দেশে সহজলভ্য, যার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও ভাবনাচিন্তা করবার আর প্রয়োজন নেই। বোতাম টিপতেই যে যন্ত্র ইপ্সিত ফল দেখিয়ে দিতে পারে, তা তো অনায়াসলভ্য ছিল না আমাদের দেশে। তাপসকে তো সেই আমাদের দেশেই কাজ করতে হয়েছে।

বহুরূপীর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ততদিনে 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়াতার', 'চার অধ্যায়', হয়ে 'রক্তকরবী'ও হয়ে গেছে ১৯৫৪ সালে। আমরা আন্তর্জাতিক এক মহানাট্য সম্মেলনে 'রক্তকরবী' নিয়ে বোম্বাই-এ গেছি। সেটা ১৯৫৬ সাল। আন্তর্জাতিক নাট্যপ্রতিনিধি এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের সামনে শম্ভু মিত্র নির্দেশিত 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হল। বিদেশের থিয়েটারে রাজসূয় ব্যাপার। সেই রাজসূয় যজ্ঞের হোতারা অবাক 'রক্তকরবী' প্রযোজনায় আলোর প্রয়োগ দেখে। এর নির্দেশক এবং আলোকশিল্পী ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁদের সবাই খুঁজছেন। তাপসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মঞ্চের ওপর, সে সঙ্কুচিত। পীড়াদায়ক তাঁদের আত্মাভিমান। প্রশংসায় অবশ্য তারা সরব। খুশির কারণ এবং গৌরবের যে যান্ত্রিক কলাকুশলতায় পারদর্শী দেশের লোক ভারতের নাট্যপ্রযোজনায় মুগ্ধ। অথচ আমাদের কটাই বা আলো ছিল তখন। তাপস তার 'ওভালটিন', 'দুধের বালতি', 'ইঁদুর কল', 'ইক্‌রিমিক্‌রি'—ইত্যাদি দিয়ে বাজিমাৎ করে দিল। এ নামকরণগুলি সবই তাপসের এবং সবই তার সহকর্মীদের বোঝার জন্য এবং সময়মতো জ্বালানো-নেভানোর জন্য। এবং সর্বোপরি সবগুলিই ওই কৌটো, টিনের বাক্স ইত্যাদি দিয়ে বানানো। আজও যারা সে আমলের তাপসের কাজের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন এসব। আর একটি উদাহরণ দিই। সেটি অনেক পরবর্তী কালের যখন বিদেশ থেকে অনেক যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে এসে গেছে। —অভিজ্ঞতাটা শুনেছিলাম তাপসের মুখেই। কিন্তু উদ্ধৃত করছি এই নিবন্ধে, বহুরূপীর সে আমলের সভ্য তাপস সেনের অনুগত সহকারী শীতাংশু মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। সে-ও চলে গেছে বেশ কয়েকবছর আগে। বহুরূপীর পর স্থায়ীভাবে দিল্লিতে থেকে গিয়েছিল এবং তাপসের সেখানকার যাবতীয় কাজের সঙ্গী ও সহকারী ছিল। প্রথমে 'আইফ্যাক্স' হলের আলোর দায়িত্ব নিয়ে কর্মজীবন দিল্লিতে শুরু করে। পরে সে নিজেই দায়িত্বশীল আলোর কারবারী হয়ে ওঠে। তাপস বড় নির্ভর করত শীতাংশুর ওপর। তা সেই শীতাংশুর এক স্মৃতিচারণমূলক লেখা বহুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল—সেখান থেকেই উদ্ধৃত করি। শীতাংশু লিখেছে, —'সে সময় ভারতে ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল যন্ত্র তৈরি হ'ত না। ফলে অনেকভাবেই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরে সে যন্ত্রও করেছিলেন কিছু নবীন ইলেকট্রনিক যন্ত্রবিদের সহায়তায়। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কথায় মনে পড়ছে তিনমূর্তি ভবনে নেহরুর জীবন নিয়ে 'শব্দ-আলোর' কথা। ফিলিপস একটি পাঞ্চটেপ গাইডেড্ কমপিউটারাইজড কন্ট্রোল ব্যবস্থা আমদানি করেছিল, সঙ্গে ছিল ইলেকট্রনিক ডিমার। ঐ শব্দ-আলো (সে-এং-লুমিয়ের)-র পরিচালক ছিলেন ইব্রাহিম আলকাজী। সে একি এলাহী কর্মযজ্ঞ! তাপস সেন যেমন আলো চান, যে রঙ চান, হল্যান্ডীয় বিশেষজ্ঞরা মাথা নাড়েন। রঙ মিশ্রণ করতে চাইলেও ঐ নঞর্থক মাথা নাড়া। সাম্প্রদায়িক আগুনের দৃশ্য, তাদের ফ্লপিডিস্ক কিছুই করতে পারে না। আলকাজী সাহেব গেলেন খেপে, আর সাহেবরা 'ইমপসিবিল' বলে কেটে পড়লেন। স্থানীয় ফিলিপসের মাথায় হাত। আলকাজী সাহেবের ঐ আলোই চাই—তাপস যা চায়। শেষে ফিলিপস্-এরই নবীন কর্মী শ্রী গুপ্তার সঙ্গে বসলেন তাপস সেন, বুঝেছিলেন, কেমন করে 'লাইটস্ক্রিপ্ট' বানালে পাঞ্চটেপে ট্রানস্লেট করা যাবে। ব্যস, ঘড়ি ধরে সেকেন্ড মেপে বানিয়ে ফেললেন ঐ স্ক্রিপ্ট। বার পাঁচেক টেপ কারেকশন করে যা চাইছিলেন, ঠিক তেমনি আলো হ'ল। আর আগুনের জন্য পিচবোর্ড, কাঠের আর হাতে ঘোরান চরকি তৈরি হ'ল, মোটর মেটাল শিট্ ইত্যাদি দিয়ে দিল্লীরই এক গলিতে। হল্যান্ডীরা আবার এলেন, আর অবাক হলেন। যে মেশিন থেকে তারা যা হবে না বলেছিলেন সেগুলিই যখন হচ্ছে দেখলেন, তাদের গুমর চুপসে গেল।' উদ্ধৃতিটা দীর্ঘ হল—কিন্তু কোনও উপায় নেই। থার্ড ওয়ার্ল্ডের শিল্পীর জয় হল যে! অভাব থেকে জন্ম নিয়েই তাপস সেনের নতুন আলোর ভূমিকা।

আমাদের সঙ্গে তার কাজ এবং বন্ধুত্ব দুই-ই সমান গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। সে নিজেকে সরঞ্চম করতে জানত।

নানা নথিপত্র চিঠি কাজের খসড়া পরিকল্পনা তার জমা থাকত। 'রক্তকরবী', 'পুতুলখেলা' 'ডাকঘর' এসব নিয়ে অনেক অনুপুঙ্খ লেখা হয়েছে, যেমন উৎপল দত্ত-র সঙ্গে তার কাজ 'অঙ্গার' 'কল্লোল', 'ফেরারী ফৌজ' 'মানুষের অধিকার নিয়েও আলোচনা আছে। আর তাকে অভিযুক্ত করে, আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি করে নাটকে অবহেলা করার সে অভিযোগ ধোঁপে টেকেনি পরবর্তীকালে—যেমন ধরা যাক সাধারণ রঙ্গালয়ে তার করা 'সেতু' নাটকের কালে কিংবা মিনার্ভা মঞ্চে এল টি জি প্রযোজিত 'অঙ্গার' নাটক-এ এইরকম বিরূপ সমালোচনা—অর্থাৎ আলোর ম্যাজিক দেখানোর অভিযোগ—তা গ্রাহ্য হয়নি। দুটি নাটকেই ওই দুটি চমৎকারী আলোর বিন্যাস নাটক দুটির দাবি ও প্রয়োজনেই করা হয়েছে এবং তা অন্যান্য দৃশ্যের আলোক-পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত। হয়ত দর্শকের নজর একটু বেশি কেড়ে নেয় ওইসব দৃশ্য—এই মাত্র। যাঁরা মঞ্চে যান্ত্রিকতা ও আলোর ব্যবহারে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি বলেছেন, তাঁরা হয়ত তখন ভুলে গিয়েছিলেন সবাই পরিবেশ সৃষ্টির কাজে আলো ও যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন ও নেওয়া হয়। কোথাও বেশি, কোথাও কম। কোথাও ভালভাবে কোথাও মন্দভাবে, কোথাও অভিনব ভাবে। কোথাও সমসাময়িক প্রচলিত রীতিতে। তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে 'সেতু' বা 'অঙ্গার'-এ এমন কী নতুন ব্যাপার ঘটল যাতে সে সময় আনকোরে শঙ্কিত হয়েছিলেন! পরিবেশ ও দৃশ্যসজ্জাকে তাপস তার আলো দিয়ে আরও অর্থবহ করে তুলতে সক্ষম ছিল। সর্বোপরি তার কাজের লক্ষ্য, দৃশ্যের ভাব প্রকাশ এবং দর্শকের আবেগের প্রতিক্রিয়াকে তুঙ্গে সংস্থাপনাতেই নিবদ্ধ ছিল। আমাদের আবেগের ওপর আলোর প্রভাব সংগীতের মতোই সরাসরি। বোধকরি আকার, রঙ এবং শব্দ অপেক্ষা থিয়েটারে আমাদের অনুভূতির দুয়ারে আলো এসে ধাক্কা দেয় আগে এবং প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

কলকাতার নাট্যআন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকেই তাপস সেন যুক্ত হয়ে যায়। সিনেমার প্রতি টান এবং অল্পদিন হলেও সেখানে কাজ শেষ করে, বোম্বাই-এর ফিল্ম জগতের পাট চুকিয়ে দিয়ে স্থায়ী ভাবে কলকাতাকেই কর্মক্ষেত্র করে তোলে। কিন্তু তার খ্যাতি অচিরেই এখানকার কাজের সুবাদে ছড়িয়ে যায় সর্বভারতের নাট্যক্ষেত্রে। শুধু নাট্য এবং নৃত্যনাট্যের বা একক নাচের ক্ষেত্রে নয় (সেখানে মৃণালিনী সারাভাই, বৈজয়ন্তীমালা, হেমা মালিনী, অনাদি প্রসাদ, মঞ্জুশ্রী চাকী, প্রভৃতি শিল্পীর সঙ্গে তার কাজ অবশ্যই স্মরণযোগ্য।) সঁ-এং-লুমিয়ের-এর পরিচালনায় সবরমতী আশ্রম, ঢুনার দুর্গ, গোয়ালিয়র দুর্গ প্রভৃতি জায়গায় তার কাজও স্মরণীয়। আর বিদেশে ভারত-উৎসবে প্যারিসে এবং মস্কোতে, সেই সমস্ত উন্নত দেশেও তার কাজ অবাক করেছে আন্তর্জাতিক দর্শকদের। একটা জীবনে এত কাজ সে করেছে যে ভাবলে অবাক হতে হয়।

আমরা জানতাম এবং অনেকেই বাইরে থেকে তাকে দেখলে মনে করত ঢিলে-ঢালা এক মানুষ। কিন্তু কাজের ব্যাপারে মোটেই তা ছিল না। অনেক সময়েই তাকে অপছন্দের নাটক করতে হয়েছে। কিন্তু যে নাটক তার ভাল লেগেছে তখন তাকে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে এবং প্রভূত মেহনত করতে দেখা গেছে। সে নিজেকে সংরক্ষণ করতে জানত। কোনও কাজ নিয়ে লেগে থাকার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। আর ছিল স্পষ্টবাদিতা এবং একটা লড়াকু মনোভাব। ক্ষমতার অধিষ্ঠানে থাকা মানুষদের খুব স্পষ্ট করে, স্পষ্টভাবে তাদের গাফিলতির কথা বলতে পারত।

তার আর একটিকের কাজের কথাটাও উল্লেখযোগ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নাট্যগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে সে ছিল অন্যতম উপদেষ্টা। তার অভিজ্ঞতার দাম যে ছিল অনেক। নিজেকে দিনে দিনে তিলে তিলে সে তৈরি করেছে। বড় হওয়ার সাধনায় ফাঁকি দেয়নি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জানবার অত্যুগ্র আগ্রহ দেখেছি। চিত্রশিল্পে, বিখ্যাত সব আঁকিয়েদের ছবিতে আলো এবং ছায়ার খেলা তাকে মুগ্ধ করত। কখনও তো কেউ দেখে থাকতেই পারেন যে তার ভাবনাচিন্তার অবিন্যস্ত দ্রুতগতি। আশ্চর্য সব ভাবনা তার মনে দানা বাঁধতে না বাঁধতেই সে অন্য বিষয়ে মগ্ন হয়ে গেল। একটা ছটফটানি তো ছিলই।

আজ তার মৃত্যুর পর, তাকে স্মরণ করতে গিয়ে অনেক কথাই তো মনে পড়বে। অনেকেই তাকে নিয়ে লিখবেন, বলবেন—দুঃখী মানুষটার কথা, সফল মানুষটির কথা, তার ছটফটানির কথা, তার স্পষ্টবাদী উচ্চারণের কথা, কিন্তু সর্বশেষে যেটা বলতে হবে আধুনিক থিয়েটারে আলোর ব্যাপারে সে ছিল মহাজন। নাটকের আলো নিভে যায় নাটক শেষে। তাপসের জীবনে যবনিকা নেমে এলেও মহাজনের আলো থেকে যাবে শুধু স্মৃতিতে নয়—যুগের পরম্পরার মধ্যে।

স্মরণে

অনন্য শামসুর রাহমান

(জন্ম : ২৩.১০.১৯২৯—মৃত্যু : ১৭.০৮.২০০৬)

আবদুর রাউফ

প্রায় তিন দশক আগে শম্ভু মিত্র শামসুর রাহমানের কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন, '.....প্রশ্ন হতে পারে, শামসুরের সামনে বাংলাদেশের স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রাম ও ভাষা আন্দোলনের পটভূমি না থাকলে শামসুর কি এত ভাল লিখতে পারতেন? উত্তরে বলা চলে, সার্থক কবিতা তো প্রত্যক্ষ বেদনাসঞ্জাত অভিজ্ঞতারই ফসল।' (উত্তরসূরী : ২২ বর্ষ ১ সংখ্যা ১৩৮১) শম্ভু মিত্র অবশ্য কবির 'জাদু প্রতিভা'কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েই কথাকটি উচ্চারণ করেছিলেন। এই উচ্চারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে শামসুর রাহমানের কবিকৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যটি। যে বৈশিষ্ট্যের কারণেই এপার বাংলার তাঁর সমসাময়িক কবিদের তুলনায় তিনি অনেকখানি আলাদা।

দেশভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে শামসুর রাহমান তাঁর কবিসত্তার স্ফুরণের সময় থেকেই ছিলেন পাকিস্তানের কবি। পাকিস্তানি আমলের ঢাকা শহর তথা পূর্ববাংলার পারিপার্শ্বিক, বিশেষ করে তাঁর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আবহ এড়িয়ে গিয়ে তাঁর পক্ষে বড় মাপের কবি হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। প্রকৃত কবির তীব্র সংবেদনশীলতার অধিকারী হওয়ার কারণে এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে সময়টায় শামসুর রাহমানের কাব্যচর্চার শুরু সেটা ছিল বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দ্বিধাবিভক্ত দেশে ওপার বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে এপার বাংলার মিল ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। মিল না থাকার মূলে ধর্মের একটা ভূমিকা ছিলই। ইসলাম ধর্মের প্রাধান্যজনিত কারণে উদ্ভূত সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এপার বাংলার হিন্দুধর্মের অনুসারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত বাতাবরণের মিল ছিল না। এখানে নাস্তিক্যসুলভ আচার-আচরণকে যত সহজে মেনে নেওয়া হত ওখানে সেটা হত না। কলকাতাকেন্দ্রিক এলিটরা অন্তত তাঁদের বাহ্যিক জীবনে ধর্মকে যেভাবে উপেক্ষা করতে পারতেন, পূর্ব পাকিস্তানের এলিটদের পক্ষে বাহ্যত ততটা সম্ভব ছিল না। তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস যেমনই হোক বাহ্যিক জীবনে ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে কিছুটা আপস তাঁদের করতে হতই। কারণ ইসলাম ধর্মে কিছু কিছু রিচুয়াল কঠোরভাবে সমষ্টিগত। সে তুলনায় হিন্দুধর্মে ধর্মীয় রিচুয়ালগুলি মূলত ব্যক্তিগত। তাই পূর্ব পাকিস্তানের এলিটদের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এলিটদের সামাজিক অবস্থানের ফারাক ঘটে গিয়েছিল বিস্তর। খেয়াল রাখতে হবে মানসিকতার নয়, আমি বলছি সামাজিক অবস্থানের ফারাকের কথা।

আর একটা ব্যাপারেও ফারাক লক্ষ না করে উপায় নেই। কলকাতাকেন্দ্রিক এলিটরা গ্রামজীবনের সঙ্গে কয়েক পুরুষের বিচ্ছিন্নতার সূত্রে যতখানি নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ঢাকাকেন্দ্রিক এলিটদের পক্ষে সেটা হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কারণ বিগত শতকের চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশের দশকের ঢাকায় গ্রামজীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন পুরোপুরি নাগরিক জীবনযাত্রা গড়ে ওঠেনি। ঢাকার অধিবাসীরা তখনও গ্রামজীবনযাত্রারই শহুরে সংস্করণে অভ্যস্ত ছিল। ফলে নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ব্যক্তির খেয়াল খুশিমাফিক জীবনযাত্রা ঢাকা শহরে সম্ভব ছিল না। ফলে বাউন্ডুলে মদ্যপ কবিরা 'মধ্যরাত্রির কলকাতাকে' তখন যেভাবে 'শাসন' করতে পারত ঢাকায় সেটা সম্ভব ছিল না। কলকাতার কবিরা ইউরোপ থেকে আমদানি নতুন নতুন মতাদর্শ বা অভিনব ভাবনা কবলিত হয়ে যেভাবে নিজেদের জীবনযাত্রাকে বেপরোয়া করে তুলতে পারতেন ঢাকায় সেটা করা যেত না। এক্ষেত্রে 'বেপরোয়া' বলতে বুঝতে হবে প্রচলিত নীতি-মূল্যবোধগুলির তোয়াক্কা না করা। ঢাকায় প্রকাশ্যে সেরকম কিছু করতে চাইলে তাৎক্ষণিক সামাজিক শাস্তির সমূহ সম্ভাবনা ছিল।

ঢাকা ও কলকাতার এইরকম বাস্তব পরিস্থিতিগত ফারাকের কারণেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শামসুর রাহমানের মানসিক সাযুজ্য যতই থাকুক কবি হিসাবে তাঁদের ভূমিকার ফারাক ঘটে গিয়েছিল বিস্তর। তাছাড়া কলকাতার কবিতাপাঠকদের

সঙ্গে ঢাকার কবিতাপাঠকদের চরিত্রগত পার্থক্যও অনুধাবন না করে উপায় নেই। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের কবিতা পাঠকদের সামনে পঞ্চাশের দশকে যেসব ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যা ছিল সেগুলি ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তানের কবিতাপাঠকদের সমস্যাবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য কলকাতায় সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনদশার সঙ্গে সংগ্রামের তেমন কোনও প্রয়োজন ছিল না। সমাজের চোখ রাঙানির ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা কীভাবে খর্ব হয় কলকাতায় তরুণরা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার তাগিদ অনুভব করত না। কিন্তু ঢাকার তরুণদের পক্ষে সমাজের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করা তখনও সম্ভব ছিল না। ফলে কলকাতায় বিশেষ করে কবিতা-অনুরাগী তরুণদের ক্ষেত্রে (কমিউনিস্টদের কথা অবশ্য এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র) ব্যক্তিস্বাধীনতা যখন ব্যক্তিস্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত হচ্ছিল ঢাকায় তখনও চলছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম। এরকম পরিস্থিতিতে ঢাকা এবং কলকাতার কবিতা পাঠকদের চাহিদা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হবে—সেটাই ছিল স্বাভাবিক।

ঢাকার কবিতা-পাঠকদের এই ভিন্ন প্রকৃতির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছিল 'জাদু প্রতিভার' অধিকারী শামসুর রাহমানের কবিতা। যে কারণে তিনি যখন ঢাকায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন তখন কলকাতায় তাঁর কবিতাপাঠকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। তিনি এখানে বহুলপঠিত হয়েছিলেন বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রাক্কালে। সেটাও বিদেশি কবিদের যেসব কবিতার সর্বজনীন আবেদন সর্বত্র প্রশংসিত হয় শামসুর রাহমানের বেলাতেও অন্তত এই কলকাতায় সেইরকমই ঘটেছিল। তিনি বাংলা ভাষার কবি ছিলেন বটে কিন্তু ভারতের বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে তাঁর কবিতার কন্টেন্টের কারণেই তাঁর পক্ষে খুব বেশি আপনজন হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

আপনজন হয়ে ওঠার পথে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত মুসলিম অনুষঙ্গও কিছুটা বাধা হিসাবে কাজ করেছে। মুসলিম অনুষঙ্গ নজরুল ইসলামের কবিতাতেও ছিল প্রভূত পরিমাণে। তবুও প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পাঠকদের কাছে আপনজন হয়ে ওঠায় সেটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ তখন পরাধীনতার জোয়াল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য ছিল। যে আকাঙ্ক্ষার প্রবল প্রতিফলন ছিল নজরুলের কবিতায়। তাই তাঁর কবিতার মুসলিম অনুষঙ্গগুলি অন্তত সেই সময়টায় অপরিচয়ের ব্যবধান রচনায় কোনও ফ্যাক্টর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে সেই আকাঙ্ক্ষা-পূরণের পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান এবং ভারতের কবিতাপাঠকদের মানসিকতায় ফারাক গড়ে ওঠে বিস্তর। ফলে শামসুর রাহমানের কবিতার মুসলিম অনুষঙ্গ ভারতের বাংলাভাষীদের মনে ভিন্ন পরিবেশের বার্তা বহন করে আনে।

যদিও এখানকার মুসলিম বাংলাভাষীদের মধ্যে সেটা ভিন্ন পরিবেশের বার্তা ছিল না কিন্তু আজও তাদের মধ্যে শামসুর রাহমানের কবিতার রসগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা নগণ্য। তেমন পাঠক যেহেতু মূলত হিন্দু বাংলাভাষীরাই তাই মুসলিম এবং পূর্ব পাকিস্তানি অনুষঙ্গের কারণে তাঁর কবিতার আবেদন এখনকার পাঠকদের স্পর্শ করেছে খুব সামান্যই। অবশ্য জন্মসূত্রে যেসব বয়স্ক এবং মনস্কপাঠক পূর্ব বাংলারই মানুষ, শামসুর রাহমানের কবিতা তাঁদের স্পর্শ করেছে অপেক্ষাকৃত একটু গভীরভাবেই। তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই সর্বজনীন আবেদনের অনেক কবিতা শামসুর রাহমানের হাত দিয়ে বেরলেও তাঁর বেশিরভাগ কবিতার কন্টেন্ট তাঁকে মূলত পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের কবি হিসাবেই চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশে তাঁর জনপ্রিয়তার রহস্য নিহিত রয়েছে এইখানটাতেই। তিনি বাংলা ভাষার প্রধান কবি নিঃসন্দেহে, কিন্তু চেষ্টা করলেও ভারতের বাংলাভাষীদের মধ্যে তাঁকে বাংলাদেশের মতো জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব নয়।

কিন্তু জনপ্রিয় না করা গেলেও ভারতীয় বাংলাভাষীদের মধ্যে যাঁরা সংবেদনশীল মনস্কপাঠক তাঁরা অনায়াসেই শামসুর রাহমানের সুদীর্ঘ সময়ের কাব্যচর্চার অনুসরণে পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নতুন দিনের স্বপ্নদেখা মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের হতাশাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। অবশ্য সেজন্য তাঁদের খেয়াল রাখতে হবে এই নতুন দিনের স্বপ্নদেখা মানুষদের একটা বড় অংশই সুশিক্ষিত, পরিশীলিত তাঁদের সাহিত্যরুচি, অনুসন্ধিৎসা তাঁদের বিশ্বজোড়া। জ্ঞানরাজ্যের এই অনুসন্ধিৎসু পাঠকদেরও কাব্যপিপাসাকে শামসুর রাহমান তৃপ্ত করতে পেরেছিলেন। শুধু কবির 'জাদু প্রতিভা' বলে সেটা সম্ভব হয়নি। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের বৈদগ্ধ্যেরও উত্তরাধিকারী ছিলেন শামসুর রাহমান। যদিও তাঁর কবিতা বৈদগ্ধ্যের ভারে কখনও ভারাক্রান্ত হয়নি। কারণ, সহজাত 'জাদু প্রতিভা' বলে আহরিত জ্ঞানভাণ্ডারকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এবং আপন সৃজনীপ্রতিভার জারকরসে সেসব জারিত করে যেভাবে কবিতার অবয়ব নির্মাণ করেছেন তা নিঃসংশয়ে বাংলাভাষার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠতে পেরেছে। তাই বিশ শতকে পঞ্চাশের দশকে বাংলাভাষার মেজর কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমানের ভূমিকা অনন্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

(আগামী সংখ্যায় থাকবে শামসুর রাহমান সম্পর্কে তরুণ সান্যালের প্রবন্ধ।)

স্মরণে

মীজানভাই

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকের নামে পত্রিকা! এমন বিচিত্র ব্যাপার তো খুব একটা দেখা যায় না। 'মীজানুর রহমানের পত্রিকা' হাতে পেয়ে সর্বাগ্রে সেই কথাটাই মনে পড়েছিল। গত খ্রিস্টাব্দ শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষ দিকের কথা। বঙ্গসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে আমার গুরু পরলোকগত অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উৎসাহে এবং তাঁর কাছে নাড়া বেঁধে তাঁরই অভিভাবকত্বে 'কথা সাহিত্য' পত্রিকার এক অত্যন্ত আকর্ষক ফিচার 'সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা'-য় নানা পত্রিকার সমালোচনা লিখছি। অবশ্যই গুরু-নির্ধারিত এক ছদ্মনামে। এই সুবাদে কথা সাহিত্য-এর দপ্তরে আরও অনেক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ভানুবাবুর কাছ থেকে ওই পত্রিকাটিও পেয়েছিলাম।

কৌতূহলী মনে পত্রিকাটি পড়ে ফেললাম। দেখি যেমন তার প্রবন্ধসম্ভার, তেমনই তার সম্পাদকীয়। সজনীকান্ত দাসের মানসপুত্র (অথবা জ্যেষ্ঠাপুত্র) গোপালদার জবানিতে সম্পাদকীয়তে নরমে-গরমে সরসতার স্বাদ বহু দিন ধরেই আস্বাদন করে আসছি। কিন্তু মীজানুর রহমানের সম্পাদকীয়ের মাধুর্যের স্বাদ ভিন্ন জাতের। সে যেন একেবারে স্পঞ্জ রসগোল্লা। মিষ্টি, গরম এবং গোদুগ্ধের খাঁটি ছানার হওয়ায়, পুষ্টিকরও বটে। গোপালদার জবানির সরসতা যেস্থলে গুরুগম্ভীর—দেশের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি ও ভবিষ্যৎ-ভাবনায় ওতপ্রোত, মীজানুর রহমান সেখানে পরিচিত মানুষজন, পরিবেশের থেকেই তাঁর সরসতার উপাদান খুঁজে নেন। সম্পাদকীয়ের প্রতিটি রচনাই মানুকম্পা মানবীয়, সংবেদনশীলতায় ভরা, গীতায় যে 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্' বলা হয়েছে, তার অনুসরণে সম্পাদক ও তাঁর সম্পাদকীয় পরিচিত-অপরিচিত সবার প্রতিই প্রেম ও প্রীতিরসে ওতপ্রোত। আর সেই সদানন্দ বৃত্তিই ফুটে বেরচ্ছে সম্পাদকের কড়চায়। আবার বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধগুলির সঙ্গে প্রকাশিত একই সম্পাদক রচিত দুই একটি সম্পাদকীয় টিপ্পনী যখন পড়ি, দেখি তাতে প্রজ্ঞা ও ভূয়োদর্শনের হীরকদ্যুতি, তা সে ভাষা-বিজ্ঞান বা শব্দতত্ত্বই হোক, অথবা রাজনীতি, সাহিত্য-সমাজ-বিজ্ঞান-ইতিহাস, সাহিত্য-সমালোচনা, বাংলা-ইংরাজি-আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ বা তার অভিধান সংক্রান্ত কোনও প্রসঙ্গ। সম্পাদকীয় ক্ষুদ্রায়তন টিপ্পনীসহ প্রবন্ধকারের উপস্থাপিত মূল বিষয়কে পাঠকের কাছে এত শিক্ষামূলক ও প্রাঞ্জল করে তুলতে পারে—এর নমুনা আগে কখনও দেখিনি। সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা-য় পত্রিকাটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম, বলাই বাহুল্য, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি পত্রিকা ও তার অদেখা সম্পাদকের প্রেমে পড়ে গেলাম। 'মিত্র ও ঘোষ'-এ গেলেই ভানুবাবুকে তাগাদা দিই, 'মীজানুর রহমানের পত্রিকা' এসেছে কি না? কখনও পাই। অধিকাংশ সময়ই পাই না। কারণ, পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, আত্মার আত্মীয়দের সঙ্গে সহজ-সাবলীল যোগাযোগ সম্পর্ক বোধহয় কোনও দেশের সরকারি কর্তৃপক্ষই চান না।

আর কর্মসূত্রে আমাকে সাতের দশকের প্রথম দিকে দীর্ঘকালের জন্য কলকাতা ছাড়তে হল। নিয়মিতভাবে 'সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা' রচনা আর সম্ভব নয়। সুতরাং 'মীজানুর রহমানের পত্রিকা'-র রসাস্বাদানের ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রয়ে গেল। তবু পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে তার সহৃদয়বুদ্ধি সম্পাদকের নামটা মনে স্থায়ী দাগ কেটে রয়েই গেল। থেকে থেকে মীজানুর রহমান নামটি মনে পড়ত।

অবশেষে আকস্মিকভাবে খোদ সম্পাদকপ্রবরের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। সালটা ১৯৯৪। বছরের গোড়ায় দিল্লির এক প্রমুখ সর্বভারতীয় গান্ধীজির নামাঙ্কিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে গেছি। সৌভাগ্যক্রমে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনারের নামে একটি পরিচয়পত্র থাকায় তাঁর সৌজন্যে হাইকমিশনের সংস্কৃতি-বিষয়ক সুযোগ্য অফিসার ড. খেয়া ভট্টাচার্যের হাতে আমাকে সঁপে দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজে যতটা পারেন, আমাকে ওখানকার সাহিত্যিক-শিল্পী ও অন্যান্য সংস্কৃতিক্ষেত্রের নায়কদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আর অতিরিক্ত হিসাবে সঙ্গী করে দিলেন হাইকমিশনের

বাংলা পত্রিকা 'ভারত-বিচিত্রা'-র সম্পাদক প্রখ্যাত কবি বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি আমাকে এক দিন বিকেলে নিয়ে হাজির হলেন ওঁদের প্রখ্যাত শিল্পী পরলোকগত কামরুল হাসানের স্মৃতিসভায়। সভা শুরু হবার পূর্বেই আমরা পৌঁছেছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে শিল্পীর গুণগ্রাহী বেশকিছু অন্তরঙ্গজন উপস্থিত হয়েছিলেন। একে একে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করাতে করাতে হঠাৎ শ্রোতাদের প্রথম সারিতেই মীজানুর রহমানের দেখা পেলাম। খপ করে আমার হাত ধরে 'শৈলেশদা!' সম্বোধনে মীজানভাই আমাকে তাঁর পাশেই বসালেন। আর সেই যে হাত ধরে হৃদয়ের বন্ধন বাঁধা হল, তা অনতিবিলম্বে পারিবারিক বন্ধনে পরিণত হল।

এইখানে বলে রাখা ভাল যে মীজানভাইদের বন্ধু-মিত্র সবাই আদর্শগত ভাবে মুক্তিযুদ্ধপন্থী। অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রপ্রেমী। ওঁদের দেশের সংখ্যালঘুদের প্রাণ দিয়ে নিরাপত্তাবিধানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনায় বিশ্বাসী ও উদ্যোগী। আমিও তাই তাঁর মধ্যে মনের মানুষ খুঁজে পেলাম। সেবারে তাঁর সৌজন্যে ওদেশের একই ভাবনায় ভাবিত বিশিষ্টজনদের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছ থেকে তাঁর পত্রিকার কয়েকটি খণ্ড উপহার পেলাম। আর তাতেই দেখলাম মীজানভাই সব্যসাচী। কলমের প্রবন্ধ ও ছড়া কবিতার মতো তাঁর তুলিও চলে সমান তালে।

দিল্লি থাকতে থাকতেই তাঁর পত্রিকার কয়েকটি বিশেষ সংখ্যাও উপহার পেলাম। পাখি, নদী, গণিত, বিদ্যাসাগর ও ওঁদের সমভাবে ভাবিত বিখ্যাত কবি শামসুর রাহমান প্রমুখের ঢাউস আকারের বিশেষ সংখ্যাগুলি নেড়ে-চেড়ে স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে ভদ্রলোক বদ্ধ পাগল। নচেৎ এত খরচ করে পত্রিকার এমন সুমুদ্রিত, অলঙ্কৃত সংখ্যা কি কেউ প্রকাশ করে? কয়জন এত দামি বিশেষ সংখ্যা কিনবে? কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হতে জানলাম যে আমার অনুমান ভ্রান্ত। তাঁর বিশেষ সংখ্যার অধিকাংশই বিক্রি হয়েছে। গ্রাহকদের চাহিদায় দুই একটির পুনর্মুদ্রণও করতে হয়েছে। বুঝলাম—পাঠকের চাহিদাই কেবল পত্রিকার মান নির্ণয় করে না। পত্রিকার উচ্চমানও পাঠকদের রুচি ও চাহিদার মানোন্নয়ন করে।

মীজানভাই গৃহ বা স্বস্থান বন্দি হয়ে সম্পাদকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির অখণ্ডতায় আস্থাবান ছিলেন বলে কেবল কলকাতায়, যেখানে বাল্যকাল ও কৈশোরের সতেরোটি বছর একটানা কাটিয়েছিলেন—থেকে থেকে আসতেন না, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলও ঘুরে দেখতে চাইতেন। আর এ বিষয়ে আমাদের বউমা নূরজাহান বেগম ছিলেন তাঁর যথার্থ সহধর্মিণী। সত্যি কথা বলতে কি ক্ষীণস্বাস্থ্য মীজানভাই এত সফর করতেই পারতেন না যদি না বৌমা তাঁর অমনভাবে হেফাজত না করতেন। আর দিল্লিতেই নয়, লখনউ, জয়পুর, আজমীঢ়, বাঙ্গালোর প্রভৃতি বহু জায়গায় আমার পরিচিতজনদের সঙ্গে তাঁরও বন্ধুত্ব করিয়ে দিতে পেরেছিলাম বলে তাঁদের এই সব সাময়িক ভ্রমণে সহায়তা হত। সব ঠাঁই যে তাঁদের ঘর আছে—এইসব ভ্রমণ শেষে তাঁর সম্পাদকীয় কড়চাতে তার সরস ও সচিত্র (বউমা ভাল রাঁধুনির সঙ্গে সঙ্গে ভাল ফোটোগ্রাফারও বটে) বিবরণ বেরত।

এর মধ্যে (তেসরা আগস্ট, ১৯৯৪) তাঁর মুক্তার মতো হাতের লেখায় তাঁর মতে 'সামান্য' কিন্তু আমার মতে অসামান্য গ্রন্থ 'কমলালয়া কলকাতা' উপহার পেলাম। কলকাতা-বিশেষজ্ঞ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের (মীজানভাই-এর শাঁটুলদা)। 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ' প্রভৃতি পড়ে তাঁর বাল্যকালের গড়পাড়, মির্জাপুর ও বউবাজার অঞ্চলের বাল্যস্মৃতি জেগে উঠল। কেবল ফিরিওয়ালা বা রাস্তার আওয়াজই নয়, রাস্তার রূপ রস গন্ধ, তার বিচিত্র অধিবাসী, তাদের সখ আহ্লাদ ও আশাভঙ্গের অপূর্ব আখ্যানমালা বাল্যস্মৃতির মণি-কুঞ্চিকা থেকে বার করে তিনি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করলেন তাঁর পাকা হাতের স্কেচ সহ। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সেইসব রসাল রচনা এমন সাড়া জাগাল যে কলকাতার ৩০০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে (আইনত কলকাতার জন্মদিন থাক বা নাই থাকত) প্রকাশিত হল এক আদ্যন্ত কলকাতাপ্রেমীর ওই সচিত্র কাহিনি—'কমলালয়া কলকাতা'। প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র তাঁকে 'মুজতবা আলীর সুযোগ্য শিষ্য' আখ্যা দিলেন। আরও অনেক বিশিষ্টজন তাঁর ওই অমূল্য কৃতিকে নানাভাবে অভিনন্দন জানালেন। এ এমন এক সরস ও তথ্যঋদ্ধ রচনা যা বার বার পড়লেও পুরাতন হয় না।

এমনইভাবে একদিন চমকে উঠলাম পত্রিকায় তাঁর ১৯৪৬ খ্রি. ১৬ই আগস্টের দাঙ্গার স্মৃতিচারণের একটি কিস্তি পাঠ করে। আমি স্বয়ং ভারত-বিভাজনের সূচনাকারী ওই দাঙ্গার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তার এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তাবৎ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পাঠকের প্রশ্রয়ধন্য ইতিহাস রচনা করেছি। কিন্তু দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শীর (এবং তাঁর জবানবন্দি অনুসারে 'অংশগ্রহণকারী') এমন নিবিড় স্মৃতিচারণ এর পূর্বে পড়িনি। অবিলম্বে তাঁকে জানালাম যে যথাসম্ভব শীঘ্র তিনি সবটা লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করুন। মীজানভাই লেখার ব্যাপারে কেবল perfectionist নন, আড্ডাসহ আরও নানা কাজে সদাব্যস্ত থাকলেও অবশেষে সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গত বছর 'বিশ্বকোষ পরিষদে'র সম্পাদক পার্থ সেনগুপ্তের উদ্যোগে তার একটি

কলকাতা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। এতেও সেই তথ্য, গভীর সামাজিক বীক্ষণ ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে মুজতবা চালে পদে পদে রসিকতা। 'জাহান্নমের আগুনে বসিয়া' এমন 'পুষ্পের হাসি' হাসার বিরল মুনসিয়ানা কদাচিৎ দেখা যায়।

কলকাতায় ফিরে আসার পর গত তিন বছরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠতর হয়। কারণ ১৯৪৭ খ্রি. ১৫ই আগস্টের পর অবস্থাগতিকে মীজানভাইকে সপরিবারে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হলেও কলকাতার প্রতি তাঁর টান পূর্বেরই মতো প্রবল। এ শহরকে তিনি তাঁর 'দ্বিতীয় জন্মভূমি' আখ্যা দিতেন। কোনও সময়ে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ, গল্পগুজব ছাড়াও একত্র খাওয়া দাওয়া (হয় তাঁদের সাময়িক বাসস্থানে আর নচেৎ আমাদের বাড়িতে) চলত। নিত্য নতুন বন্ধু জোটাতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সম্বন্ধে খবর না দিয়েই তাঁদের দু'চারজনকে নিয়ে চলে আসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—সবাই যখন সুজন, তখন তেঁতুল পাতায় নয়জন কেন, নিরানব্বই জনেরও চলে যাবে। মনে-প্রাণে বসুধৈব কুটুম্বকম্‌ মানুষটি না বউমা নূরজাহান বেগম, না তিনি সদলবলে যাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছেন, তাঁদের অপ্রস্তুত অবস্থার কথা চিন্তা করতেন। আর কলকাতায় এলেই পুরাতন—নতুন বন্ধুদের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে রওনা হতেন। তবে সদানন্দ ভুলো-মন মানুষটি উপহার নিয়ে রওনা হলেই যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির হাতে সে উপহার পৌঁছাবে, তার অবশ্য নিশ্চয়তা ছিল না। এই তো বছর দুই পূর্বে বৌমাসহ আমাদের বাড়ি এসে জানালেন, দাদা আপনার জন্য যে পার্কার কলমটি নিয়ে আসছিলাম আমার দরকারি কাগজপত্রসহ একটি ব্যাগে ঢাকা বিমানবন্দরে সেটা ফেলে রেখেই বিমানে উঠে পড়েছি। কলকাতা থেকে ঢাকা বিমানবন্দরে খবর পাঠিয়েছি। ব্যাগটি পাওয়া গেলেই আপনার জন্য শখ করে কেনা পার্কার কলমটিও পাওয়া যাবে। পার্কার কলমে লেখার স্বপ্নও আমি কখনও দেখিনি। আর রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যঙ্গচ্ছলে উল্লেখিত আমি সেই গোত্রের লেখকও নই যাঁরা মনে করেন যে ভাল ফাউন্টেন পেন পেলেই তাঁরা মহাকাব্য রচনা করে ফেলবেন। নচেৎ সেই পার্কার কলমটি যার হস্তগত হয়েছিল, এতদিনে তার রচিত মহাকাব্যের খবর পাওয়া যেত।

এবারেও চোখ দেখানোর জন্য এলেন বউমাসহ জুনের প্রথমদিকে। পনেরোই জুন ফোনে বউমার খুশিভরা কণ্ঠস্বর, তাঁরা কমলালয়া কলকাতায়। সাম্প্রতিক পত্রিকাসহ আমাদের দাম্পত্যজীবনের স্বর্ণজয়ন্তী পালন করার জন্য (আমরা নির্দিষ্ট দিনে গা ঢাকা দেবার সংকল্প ঘোষণা করেছিলাম বলে) তাঁরা যখন নিজেদের সময়মতো এক বিশাল কেক আমাদের বাড়িতে এনে আমাদের খাইয়ে ও খেয়ে যে আনন্দোৎসব করে গিয়েছিলেন বউমার নেওয়া সেই ফোটোর নকলও এনেছেন আমাদের জন্য। সুতরাং দেখা হওয়ার সম্ভাবনায় উভয় পক্ষই খুশি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও দেখা দিল। আমাদের বাড়ি বউমা একাধিকবার এলেও একা চলা-ফেরায় অক্ষম মীজানভাইকে নিয়ে সেই সল্টলেক থেকে চিনে আসতে পারবেন কীভাবে? ওদিকে সাম্প্রতিক অসুস্থতায় আমার পক্ষেও একা এবং সাধারণ পরিবহনব্যবস্থার সহায়তায় একেবারে দক্ষিণদিক থেকে সোজা উত্তর-পূর্বে অতটা যাওয়াও সম্ভব নয়। ভরসা ওঁদের সাম্প্রতিক কালের মুশকিল আসান বিশ্বকোষ পরিষদের পার্থ সেনগুপ্ত। তিনি মুর্শিদাবাদে ভাষা-শহিদ সালাম-বরকতদের স্মরণসভা সেরে ফেরার পরও পূর্বনির্ধারিত কাজে ব্যস্ত দিন দু'য়েক। অগত্যা 'কোরক' সম্পাদক তাপস ভৌমিক মহাশয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা হল ২০শে জুন তিনিই নিয়ে আসবেন মীজানভাই-বউমাকে আমাদের বাড়ি। তাঁরও আসার কথা ছিল আমাদের এখানে এবং তিনি তাঁর পত্রিকাতে লেখার জন্য মীজানভাই-এর সঙ্গে ঢাকাতেই যোগাযোগ করেছিলেন। কবে হঠাৎ ওঁদের ঢাকা চলে যেতে হয় তাই ২০শে জুন দেখা হবে ভেবে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু ২০শে ভোরেই বউমার উচ্চকণ্ঠের ক্রন্দনজড়িত ফোন। গত রাত্রে মীজানভাই তাঁর বহুদিনের কষ্টকর ব্যাধি হাঁপানিতে প্রচণ্ড আক্রান্ত হয়ে সল্টলেকেরই এক নামী-দামি নার্সিংহোমে। সান্ত্বনা দিলাম, পুরাতন ব্যাধি ঠিক হয়ে যাবে দু'চার দিনে। ইতিমধ্যে পার্থবাবু (সেনগুপ্ত) হাতের কাজ সেরেই পূর্ণশক্তিতে ময়দানে নেমে পড়েছেন। নার্সিংহোমে চিকিৎসার বদলে কেবল জলের মতো ওঁদের অর্থব্যয় করাচ্ছে বলে সেখান থেকে নিয়ে এসে দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজ্ঞ ও দরদি ডাক্তার জয়ন্ত সেন মশাহয়ের চিকিৎসাধীন করেছেন মীজানভাইকে। অবস্থা উদ্বেগজনক হলেও স্থিতিশীল। আর সল্টলেকের নার্সিংহোম যদি আজীবন কলকাতাপ্রেমী মীজানভাইকে সর্বার্থে ধনে-প্রাণে মারার ব্যবস্থা করে থাকে তো তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন ডাক্তার জয়ন্ত সেন। শুধু চিকিৎসক হিসাবে কলকাতাকে তীর্থ-জ্ঞানকারী মানুষটির দিবারাত্র সদা-সতর্ক চিকিৎসা করেই নয়, বউমার সল্টলেক থেকে এসে মীজানভাই-এর পাশে থাকার অসুবিধা দেখে তাঁর 'কাকীমা'কে তিনি নিজের বাড়িতেই সসম্মানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কলকাতাপ্রেমী ও আদ্যন্ত অসাম্প্রদায়িক মীজানভাইকে তাঁর শহর ভোলেনি।

পার্থবাবু ও তাঁর গুটিকয় সহমর্মীদের মীজানভাইকে সুস্থ করে দেশে ফেরত পাঠাবার চেষ্টায় দিনের বিশ্রাম ও রাতের

ঘুম এ কয় দিন ছিল না। নিজে শারীরিকভাবে অক্ষম বলে টেলিফোনেই তাঁদের কাজে যতটুক সম্ভব সাহায্য করেছি। কিন্তু রবিবার তাদের বাড়িতে ফোনেও পাওয়া সম্ভব হল না। দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করাই সার হল। অবশেষে সোমবার ২৬শে জুন ভোরে ফোন তুলতেই বউমার আর্ত ক্রন্দন, দাদা আপনার ভাই আর নেই। তাঁকে নিয়ে আর দেশে ফিরে যেতে পারব না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে সময়োচিত সান্ত্বনা দিলাম। মনে মনে ভাবলাম মীজানভাই তাঁর প্রাণের শহর 'কমলালয়া কলকাতা'-য় শেষ নিঃশ্বাস ফেলতেই এসেছিলেন এবারে। যে-শহরের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, শেষ সময়ে তাকে ভুলে থাকেন কী করে?

কিছু বাদে শোক ও সমবেদনায় গম্ভীর কণ্ঠে 'কোরক' সম্পাদক তাপসবাবুর ফোন। মীজানভাই এরই মধ্যে বউমাকে দিয়ে আমার জন্য তাঁর শেষ সওগাত প্রতিশ্রুত ফোটোর নকল ও পত্রিকা তাঁর কাছে রেখে গেছেন। শেষ দেখা না হলেও শেষের দিনেও আমরা তাঁর মনে ছিলাম।

পার্থবাবুর ক্ষোভ পুলিস সদ্য-পিতৃহারা মীজানভাইয়ের ছেলে স্নেহাস্পদ তারেককে দেড় ঘণ্টার মতো থানায় বসিয়ে, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কারণ 'বিদেশি নাগরিক'-এর অসুস্থতার জন্য কেবল ভিসার মেয়াদই শেষ হয়নি, বাসে এসে বিমানে মরদেহ নিয়ে মাতা-পুত্র যেতে চান, তার আইনি ফ্যাকড়াও অনেক। অবশেষে পার্থবাবুকে রাজ্য সরকারের এক মন্ত্রীর সহায়তায় তাড়াতাড়ি মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হয় মাতা-পুত্রকে। বোঝালাম, আইন অন্ধ। তাই মীজানভাই যে কলকাতারও ছিলেন—এটা তার চোখে না পড়ারই কথা! কিন্তু কলকাতাবাসী তো তাঁদের প্রিয় কলকাতাপ্রেমীর জন্য ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি রাখেননি। মনে মনে দুই দেশের নাগরিক এরকম বিরল খাঁটি বাঙালিকে মাঝে মাঝে স্মরণ করে এই প্রজাতির দেশ-জাতি-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে আদ্যন্ত বাঙালিদের সম্মানিত করে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা বাংলা আকাদেমি বা কলকাতার আরও সারস্বত-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াসে যদি সম্ভব হয়, তবে মীজানভাইয়ের ফুলের মতো ফুটে উঠে সমগ্র জীবন বাঙালি হবার সাধনা সফল হবে।

বয়োজ্যেষ্ঠের পক্ষে প্রিয় কনিষ্ঠের শোকে স্মৃতিচারণ করা কেবল গভীর দুঃখেরই নয়, বড় দুরূহও বটে। কিন্তু তবু আরও একটু সংযোজন না করলেই নয়। মীজানভাইদের শেষ সওগাতের মধ্যে তাঁর পত্রিকার সর্বাধুনিক (এবং হয়ত বা সর্বশেষও) দুটি ৭৯ ও ৮০ তম (তেইশ বৎসরের অন্তিম ও চতুর্বিংশ বর্ষ-প্রবেশ) সংখ্যা দুটির সম্পাদকের কড়চা পড়ে ধারণা হল মীজানভাই কলকাতায় এটা তাঁর শেষ যাত্রা বুঝেই হয়ত বা এসেছিলেন। পঁচাত্তর বছর হতে না হতেই চোখের দৃষ্টি চলে গেছে। মধ্যবিত্তের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কেবল জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও অনুজস্থানীয় গুণগ্রাহীদের অর্থানুকূল্যে কলকাতায় চোখের অস্ত্রোপচার করালেও কোনও উন্নতি হয়নি—এমন সময়ও নিজেকে নিয়ে রসিকতা করেছেন কড়চায় : 'কান বলে পার তো হিয়ারিং-এইড লও, নতুবা আড়ি পাত। এদিকে ফুসফুসকে বাগে আনা যাইতেছে না—কেবলই ফোঁস করিয়া ওঠা উহার স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই পর্যন্ত সহা গিয়াছিল, কিন্তু মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো চক্ষুযুগল সাঁট করিয়া লাগাতার ধর্মঘটে পরিয়াছে, জগতের আলো হইতে বঞ্চিত—প্রায় অধমের নিকট 'এ আঁধার আলোর অধিক' কবির এই চরণ উপহাসের মতো শোনায়। পড়িতে গেলে হরফগুলি ব্যালে নৃত্যের নর্তকীদের মতো সারা পৃষ্ঠা জুড়িয়া নাচিয়া কুঁদিয়া লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বসে।' (৮০তম খণ্ড, ২০০৬)

সাহিত্যিক, সম্পাদক, কবি, চিত্রকরের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুই-ই যদি চলে যায়, তাহলে তাঁর বাঁচার সার্থকতা কোথায়? স্রষ্টা যদি সৃষ্টি করতেই অক্ষম হন, তবে কীসের জন্য তাঁর প্রাণধারণ? মিল্টনের মতো বিরল সৌভাগ্যশালী আর কয়জন? যিনি অন্ধত্বের পরও On His Blindness অমর কাব্য এবং Paradise Lost ও Paradise Regained এর মতো মহাকাব্যের সৃষ্টি করতে পারেন? মীজানভাই তাই হয়ত বা এই দুনিয়াকে আল্ বিদা বলার জন্য তাঁর প্রাণের নগরী কলকাতাকেই বেছে নিয়েছিলেন। বিশ্বজ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সঞ্চারী মীজানভাইয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য দশখণ্ডের 'বিশ্বজ্ঞানকোষ'-এর স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল। মানুষের সব স্বপ্ন কি আর সফল হয়!

With
Best Compliments From

J. BOSECK & Co. (P) Ltd.

15/7 JAWAHARLAL NEHRU ROAD
KOLKATA-700 013